গদ্য-পদ্য অনুবাদে অনবদ্য

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কে সস্নেহে

ভোর পাঁচটায় বাজল কোতোয়ালিতে ঘুম-ভাঙানোর ঘণ্টা। রোজ যেমন বাজে। টানা লোহার গায় ঢং ঢং করে হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ। জানলায় কাঁচ, কাঁচের গায় দু-আঙুল পুরু ববফ—তার ভেতর দিয়ে চি চি করে এসে হঠাৎ ঝট করে শব্দটা থেমে গেল। সকালটা ছিল কনকনে ঠাণ্ডা। পাহারাঅলা সেপাইয়ের তাই ধরে ধরে ঘণ্টা বাজাবার মত মেজাজ ছিল না।

জানলাব বাইবে তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝবাতে উঠে টুকরিতে বসতে গিয়ে শুখভ যেমনটি দেখেছিল ঠিক তেমনি। বাইবের হাতায় দুটো হলুদবর্ণ আলো, একটা আলো ক্যাম্পের ভেতরে—চারদিকেব মিশকালো অন্ধকারে জানলাটাই যা একটু চিকচিক করছে। অন্যদিন এতক্ষণে লক-আপ খুলে যায়। যাবা হাঁড়ির কাজ করে, তারা এসে পড়ে। বাঁকে করে পেচ্ছাপের টিন ওঠানোব ঘটাংঘট ঘটাংঘট শব্দ হয়। আজ এখনও শুখভ তাদের কারো কোনো সাড়া পেল না।

ভোবের ঘণ্টা বেজে গেছে অথচ শুখভ শুয়ে আছে, এমন কখনও হয়নি। ঘণ্টা শোনামাত্র শুখভ রোজ উঠে পড়ে। ফাইলে দাঁড়াবার আগে সকালে হাতে ঘণ্টা দেড়েক সময় মেলে। এই সময়টা সরকারের নয—যাব যার নিজের। ক্যাম্পেব যারা ঝানু লোক, তারা জানে—সকালবেলায় এই সময়টা এটা-ওটা কবে রোজই টুকটাক কিছু না কিছু কামানো যায়। ছেঁড়াফাড়া আস্তর কেটে হাতমোজাব ওয়াড বানাও। দলের যাবা শাঁসালো লোক, জুতোব গাদা থেকে তাদেব ভালেঙ্কিগুলো (হাঁটু অবধি টানা ফেল্টের বুট) যদি হাতের গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পাবো তো তাদের আব বাঙ্ক থেকে নেমে খালি পায়ে লেংচে লেংচে জুতো খুঁজে বেড়াতে হয় না। ভাঁড়ারে গিয়ে ফাইফরমাশ খাটতে পারো, ঘর ঝাঁট দিতে পাবো, ঘাড়ে করে এটা-ওটা বয়ে দিয়ে আসতে পারো। নইলে যেতে পারো খাওয়া-দাওয়ার জায়গায়; টেবিল থেকে এঁটো বাটির ডাঁই তুলে বাসন-মাজার জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারো। পেটে কিছু খেতে পাবে। তেমনি আবার অনেকেই দেখবে ঐ তক্কে রয়েছে; যত না কাজ, তার চেয়ে লোক বেশী। এ কাজে সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হল এই যে, কোনো বাটিতে যদি এতটুকুও কিছু লেগে থাকে তো, ব্যাস্ তুমি গেলে! বাটিটা চেটেপুটে সাফ না করে তুমি আব ছাড়বে না। কুজিওমিন একবার একটা কথা বলেছিল শুখভের মনে আছে। কুজিওমিন শুখভদের ব্রিগেডের প্রথম ফোরম্যান। অনেক দিনের পাকা লোক। ১৯৪৩ সালে তাব বারো বছরের মেয়াদ খাটা হয়ে গেছে। ফ্রন্ট থেকে তখন দলে দলে নতুন লোক আসছিল। জঙ্গলেব মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় গোল হয়ে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে কুজিওমিন তাদের বলেছিল,—এ হল জঙ্গলের রাজত্ব। এ সত্ত্বেও মানুষ এখানে বেঁচে থাকে। সাবাড়

হয তাবাই যাবা পরেব এঁটোপাত চাটে, যাবা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় আর যারা সঙ্গীসাথীদেব নামে চুকলি করে ।

চুকলিখোরদেব সম্বন্ধে যা সে বলেছিল তা ঠিক নয় । চুকলিখোরদের জাতটা দিব্যি বহালতবিযতে থেকে গেছে—তাব জন্যে খুন ঢালতে হযেছে অবশ্য অন্যদের । ভোরের ঘণ্টা বাজতে না বাজতে শুখভ বোজ উঠে পড়ে । আজকের দিনটাতেই শুধু তার ব্যতিক্রম ঘটল । কাল সন্ধে থেকেই শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে । কখনও জ্বর-জ্বর ভাব, কখনও সারা গাযে ব্যথা । হাজাব মুড়ি দিয়েও শীত-শীত ভাবটা কিছুতে কাটছে না রাত্তিরে ঘুমেব ঘোরেও শুখভ মনে করেছে তার যেন শক্ত কোনো ব্যামো হয়েছে । আবার খানিক পবেই সে একটু ভাল বোধ করেছে । সাবা রাত মনে মনে সে প্রার্থনা কবেছে, সকাল যেন আব না আসে ।

কিন্তু সকাল এল ঠিক ঘড়ি ধবে ।

আব শীতেরই বা দোষ কী ? জানলাব গাযে দু'আঙুল পুরু বরফ, মাথার ওপর চালের নীচে মাকডসাব জালের মত চিকচিক কবছে পাতলা ঝুরি ঝুরি বরফ । ব্যাবাকেব যেমন ছিরি ।

শুখভ উঠল না । কোটকম্বলে মাথা মুড়ি দিয়ে বাঙ্কের ওপর মটকা মেবে পড়ে রইল । বালাপোশের জামাব একটা হাতা মুড়ে পা'দুটো তাব ভেতর চালান করে দিল । মাথা মুড়ি দিযে থাকায চোখে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না । কিন্তু ব্যারাকের ভেতব কোথায় কী ঘটছে, ঘবেব যে কোণটাতে তাব দলেব লোকজনেবা থাকে তাবা কে কী কবছে, সবই সে আওয়াজ শুনে ধরতে পারছিল । যারা হাঁড়িব কাজ কবে তারা এবার আটটুকবিওয়ালা পাযখানাব পিপেগুলো পড়ি-মবি করে সশব্দে নিয়ে চলেছে । ওটা নাকি হাল্কা কাজ । অশক্ত অথর্বদেব জন্যে । বয়ে নিয়ে যাও তো চাঁদ, না চলকিযে —দেখি কার কত মুরোদ । ৭৫নং ব্রিগেড যেদিকটাতে থাকে, সেখানে একগোছা শুখা ভালেঙ্কি ধপাস করে মেঝের ওপর পড়ল । শব্দটা এবার আমাদেব এদিকেও শোনা গেল । আমাদেরও আজ ভালেঙ্কি শুকোবাব দিন । ব্রিগেডের ফোবম্যান আর সহকারী ফোরম্যান চুপচাপ বসে পাযে বুট আঁটছে । কিন্তু তাদের বাঙ্কগুলোতে ক্যাঁচব ক্যাঁচর শব্দ হচ্ছে । সহকারী ফোরম্যান এখন রুটি আনতে যাবে রেশন-আপিসে ; আর ফোবম্যান যাবে উ. প. ডি (উৎপাদন-পবিকল্পনা-ডিপার্টমেন্ট) দপ্তরে ।

হুঁ, ফোবম্যান যাচ্ছে বটে, তবে রোজকাব যাওয়া আব আজকের যাওয়ার মধ্যে একটা তফাত আছে । বোজ তাকে হুজুরে হাজির হতে হয় কাজের ভার বুঝে নেবাব জন্যে । আজ অন্য ব্যাপাব । আজ তার দলের ভাগ্য নির্ধারিত হবে । 'সমাজতান্ত্রিক জীবনাযন'—এই নামে নতুন একটা শহর পত্তন হবে । ১০৪নং ব্রিগেডকে কারুশালা তৈরির কাজ থেকে সরিয়ে সেই শহর গড়ার কাজে ঠেলে পাঠাবার একটা চেষ্টা চলেছে । সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন বলতে এখন সেখানে খাঁ খাঁ করছে মাঠ ; চারিদিকে শুধু মাথা তুলে আছে বরফের শৈলশিবা । কিছু খাড়া কবতে গেলেই আগে সেখানে গর্ত খুঁড়তে

হবে, খুঁটি গাড়তে হবে, কাঁটাতাব দিয়ে ঘিরতে হবে । নিজেদেব এমনভাবে বেড়া দিয়ে বাখতে হবে যাতে কেউ পালাতে না পাবে । এসব হয়ে-টয়ে গেলে তখনই উঠবে শহর গড়বার কাজে হাত দেবার কথা । শরীর গরম রাখার জন্যে একটু যে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পাবে, মাসখানেকের মধ্যে তাব কোনো আশা নেই । আগুন যে পোহাবে তারও উপায় নেই—আগুন জ্বালতে কুটোটাও মিলবে না । বাঁচার একমাত্র উপায়, খেটে খেটে যদি কালঘাম ছোটাতে পারো ।

এমন একটা ব্যাপার যে, ফোরম্যানের উতলা হওয়ারই কথা । তাই সে গেছে কলকাঠি নাড়তে—যাতে তার দলটাকে বেহাই দিয়ে সে জায়গায় অন্য কোনো দলকে পাঠানো হয় । এ কাজটা অবিশ্যি খালি হাতে গিয়ে দাঁড়ালে হবার নয় । কর্মবণ্টন বিভাগের যিনি হর্তা-কর্তা, তাঁকে আধকিলোটাক নধব শুযোবের মাংস না দিলে চলবে না । ফোরম্যান হয়ত কিলোখানেকও নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে । তা যেভাবেই হোক, চেষ্টা কবে দেখতে দোষ নেই । শুখভও একবার হাসপাতালে গিয়ে চেষ্টা করে দেখবে আজকের দিনটা যদি সে ছুটি করাতে পারে । সত্যি সত্যি, তাব সারা শবীর যেন ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ছে । একবার সে মনে করবার চেষ্টা করল ব্যাবাকে আজ কার ডিউটি । তাই বলো। দেডা ইভান । দেডা ইভানেবই তো আজ ডিউটির দিন । সেই যে ঢ্যাঙা, তালপাতার সেপাই । কালো কালো চোখ । প্রথমবাব দেখলে মনে হবে অতি সাঙ্ঘাতিক লোক । যে-কজন পাহাবাওয়ালা আছে, তার মধ্যে আসলে কিন্তু ইভানই সবচেয়ে নরম । লোকজনদের সে কথায় কথায় সেলে আটক করে না, শাস্তি দেওয়ানোর জন্যে টেনে হিঁচড়ে অফিসাবদের কাছেও নিয়ে যায় না । কাজেই শুখভ আরও খানিকক্ষণ অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারে—ন' নম্বর ব্যাবাকের লোকেবা যতক্ষণ না খেতে যায় ততক্ষণ তো বটেই । শুখভের বাঙ্কটা একটা ঝাঁকানি খেয়ে কেঁপে উঠল । দুটো লোক একসঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে এই কাণ্ড । দুজনেব একজন হল শুখভের ওপরের বাঙ্কের পাদ্রী আলিওশা ; আর একজন হল নীচের বাঙ্কের বুইনভস্কি—নৌবহরের সেকেণ্ড র‍্যাঙ্কের ক্যাপ্টেন, অর্থাৎ এককালে ছিল । পেচ্ছাপের টিন খালাস কবে এসে দুই ফালতুতে খিটিমিটি জুড়ে দিল কে আগে গবম জল আনতে যাবে এই নিয়ে । ঠিক যেন দুই বুড়িতে কোঁদল কবছে । ২০নং ব্রিগেডেব ঝালাইমিস্ত্রি সেই শুনে খেঁকিয়ে উঠল,—এইও, অলবড্যে । দাঁড়া, তোদের চেঁচানো বার করছি । বলেই একপাটি জুতো ছুঁড়ে মারল ।

জুতোটা ঠকাস করে খুঁটিটার গায়ে গিয়ে লাগল । অমনি সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ । পাশের ব্রিগেডের সহকারী ফোরম্যানকে ঠিক সেই সময় খাটো গলায় এই বলে গজ গজ করতে শোনা গেল,—বুঝলে ভাসিল ফেদোরিচ, শুয়োরের বাচ্চাবা আবার ঠকিয়েছে। রেশনে আগে দিত চাবটে করে দু'পাউণ্ডের রুটি—এখন দিচ্ছে তিনটে । কাকে ফেলে কাকে দিই ? আস্তে বললেও তামাম ব্যারাক রুদ্ধনিশ্বাসে কথাটা গিলছিল । ওবেলা রুটি তাহলে ওদের কারো কারো ভাগে কম পড়বে ।

কাঠের গুঁড়োয় আঁট করে ঠাসা তোশকে গা এলিয়ে দিয়ে শুখভ ঠায় শুয়ে রইল ।

সে চাইছিল হয় তেড়ে জ্বর আসুক, নয় গায়ের ব্যথাটা মরুক । এই না-অসুস্থ, না-ভালো অবস্থায় ঝুলে থাকতে তার আর কিছুতেই মন চাইছিল না । পাদ্রী আলিওশা বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়াচ্ছিল । সেই সময় বুইনভস্কি পায়খানা থেকে ফিরে এসে মজা মারার ভাব করে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল,—সাহসে বুক বাঁধো, লাল নৌসেনা ! মাইনাস বিশ না হয়ে যায় না ।

শুখভ ঠিক করে ফেলল হাসপাতালেই সে একবার ঢুঁ মারবে । আর হবি তো হ' ঠিক তৎক্ষণাৎ একটা জাঁদরেলগোছের হাত এক হেঁচকা টানে তার গা থেকে কম্বল আর বালাপোশের জামাটা খসিয়ে দিল । মুখের ওপর থেকে কোটটা সরিয়ে শুখভ ঘাড় তুলল । ঘাড় তুলেই দেখে হ্যাংলা তাতার সেপাই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে । বাঙ্কের উঁচু কাঁধ বরাবর তার মাথা ।

ও হরি, ডিউটিতে এসেছে তাহলে তাতার, যদিও আজ ওর দিন নয়—পা টিপে টিপে এসে গ্যাঁক করে শুখভকে পাকড়েছে ।

শুখভের কালো কোটের পিঠের ওপর নম্বরদাগা লেবেলটা বিড় বিড় করে আগে পড়ল,—শ—আট চুয়ান্ন । তাতার সেপাই তারপর হেঁকে বলল —সেলহাজত তিন রোজ — বাইরে কাজ ।

ঘরের সব আলো না জ্বলায় দুশো লোকের ছারপোকাগ্রস্ত পঞ্চাশ সারি বাঙ্কওয়ালা ব্যারাকের যে অংশটা আবছায়ায় ঢাকা ছিল, তাতারের ফ্যাঁসফেঁসে গলাব আওয়াজ পাওয়ামাত্র হঠাৎ সেখানে খুব ব্যস্ততার ধুম পড়ে গেল । যারা তখনও শুয়ে ছিল তারা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে চটপট যে যার পোশাক পরতে শুরু করে দিল ।

—কোন কসুর, হুজুর ? কাঁদো কাঁদো গলায কথাটা বললেও শুখভ কিন্তু আসলে আদৌ ততটা মুষড়ে পড়েনি । কেননা বাইরে কাজে যেতে পারলে একা একা সেলে থাকার কষ্ট অনেকখানি কমে যাবে । খাবারটা পাওয়া যাবে গরম । আর খামাখা ভেবে মন খারাপ করবার ফুরসতই মিলবে না । ষোল-আনা সেলের সাজা তখনই হয়, যখন কাজে না পাঠিয়ে বেকার ঘরে বসিয়ে রাখে ।

—ঘণ্টা শুনে ওঠনি কেন ? চল, বিচার হবে । তাতার কথাগুলো তোতাপাখির মত নিছক আওড়ে যাচ্ছিল । কেননা সে নিজে, শুখভ এবং ভূভারতে সবাই জানে শাস্তিটা কিসের জন্যে ।

তাতারের চিমসেপড়া মাকুন্দ মুখে কোনো ভাবান্তর নেই । একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখবার চেষ্টা করল আর কাউকে পাকড়ানো যায় কিনা । কিন্তু আবছায়ায়, আলোর তলায়, ওপরনীচের বাঙ্কে প্রত্যেকেই দস্তুরমত ব্যস্ত । কেউ বালাপোশের ট্রাউজারে পা ঢোকাচ্ছে, কেউ বা ফিটফাট হয়ে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধেছেঁদে নিয়ে হন হন করে বেরিয়ে যাচ্ছে—যাতে তাতার বিদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারে ।

সাজাটা যদি অন্য কোনো কারণে হত, এমন কারণ যাতে যথার্থই সেল সাজা হতে পারে—তাহলে শুখভের অতটা মন ভার হত না । তার রাগ হচ্ছে আরও এইজন্যে

যে, বরাবর সকলের আগে সে ঘুম থেকে উঠে এসেছে । এও ঠিক যে, কাঁদাকাটা করলেও ছাড়া সে পাবে না । অন্তত তাতারের হাত থেকে তো নয়ই । কাজেই লোকদেখানোর মত করে মুখে মাপ চাইতে থাকলেও শুখভ সমানে তার বালাপোশের ট্রাউজার পরে যেতে লাগল (বাঁ হাঁটুর ওপব একটা নোংরা ছেঁড়া তাপ্পির গাযে কালো কালিতে লেখা একটা অস্পষ্ট ছেঁড়া নম্বর—শ ৮৫৪), গায়ে চড়াল বালাপোশের কোট (তাব গায় আর পিঠে দু' জায়গায় নম্বর মারা), তারপর উঠে গিয়ে মেঝের ওপর জুতোর গাদা থেকে নিয়ে এল ভালেঙ্কি, মাথায় দিল টুপি (সুমুখের দিকে একই রকমের সেই নম্বরেব তাপ্পি) । সব প'রে ট'রে শুখভ তাতারের পেছন পেছন চলল ।

১০৪নং ব্রিগেডের সবাই দেখল শুখভকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ একটি কথাও বলল না । বলে কোনো লাভ নেই । আর তাছাড়া কীই বা বলবে ? ফোরম্যান থাকলে সে শুখভের পক্ষ নিতে পারত । কিন্তু ফোরম্যান ব্যাবাকে নেই । শুখভও তাব বাঙ্কের সঙ্গীসাথীদের কিছু বলে গেল না । তার বাঙ্কের বন্ধুদের বলবার কোনো দরকার নেই, এমনিতেই তারা সকালেব খাবারটা রেখে দেবে ।

শুখভ সেপাইয়ের পিছু পিছু বাইরে এল ।

একে কনকনে ঠাণ্ডা, তায় কুয়াসা । নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে । দু কোণের দুই টং থেকে দুটো বড় বড় সার্চলাইট গোটা তল্লাটের ওপর আড়াআড়িভাবে আলো ফেলছে । ক্যাম্পের হাতায় আব ক্যাম্পেব ভেতরেও বাতিগুলো জ্বলছে । চারদিকেব এই চোখধাঁধানো আলোয় আকাশের তারা দেখাবও জো নেই ।

কয়েদীর দল নানান ধান্ধায় এদিক ওদিক হানফানিয়ে বেড়াচ্ছে । তাদের জুতোর তলায় মুচ মুচ করে বরফ ভাঙার শব্দ । কেউ চলেছে শৌচাগারে, কেউ মালখানায় ; বাড়ি থেকে একজনের পার্সেলে জিনিস এসেছে, সে চলেছে গুদামঘব থেকে সেটা আনতে । নিজের যুগ্যি চাল নিয়ে চলেছে একজন পথ্য-রান্নার ঘবে । সকলেই ওভারকোটের বোতাম এঁটে ঘাড় হেঁট করে, কোলকুঁজো হয়ে হাঁটছে । হাতপা তাদের হিম হয়ে বযেছে এই ভেবে যে, সারাটা দিন তাদের এই নিদারুণ শীতের মধ্যে বাইরে বাইরে কাটাতে হবে—যতটা না ঠাণ্ডায়, তার চেয়ে বেশী আতঙ্কে । তাতার কিন্তু তার তেলচিটে নীল ফিতে লাগানো ফৌজী কোটটা গায় দিয়ে দিব্যি গট্ গট করে বুক চিতিয়ে হেঁটে চলেছিল—ঠাণ্ডা যেন আদৌ তার গায়েই লাগছে না ।

যেতে যেতে পথে পড়ল উঁচু উঁচু কাঠের তক্তাঘেরা জায়গা—তার ভেতর ক্যাম্পের কয়েদীদের সাজা দেবার হাজত । সেটা ছাড়িয়ে ক্যাম্পের রুটি-কারখানা । জায়গাটা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে যাতে কয়েদীরা হামলা করতে না পারে । রুটি-কারখানা ছাড়িয়ে কোতোয়ালির একটা প্রান্ত । সেখানে একটা খুঁটির গায়ে ঝুলছে মোটা তারে বাঁধা বরফে-মোড়া একখণ্ড রেলেব পাত । একটু এগিয়ে গেলে কাঠের আরেকটা খুঁটি ; তাতে বরফে ঢাকা একটা তাপমানযন্ত্র । তাপমাত্রা খুব বেশী নেমে গেলে লোকে যাতে দেখতে না পায়, তার জন্যে অন্ধকার ঘুপচিমত জায়গায় সেটা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে ।

মাইনাস বিয়াল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা যদি কেউ দেখতে পায়, তাহলে আর কাউকে কাজে ঠেলে পাঠানো যাবে না । আজ অবশ্য তাপমাত্রা মাইনাস চল্লিশের ধারেকাছেও নয় ।

কোতোয়ালি ব্যারাকে এসে দুজনে সটান ঢুকে গেল পাহারাওয়ালাদের কামরায় । তাকে যে সেল-হাজতে পাঠানো হবে না, তাকে করতে হবে শুধু সেপাইদের ঘরের মেঝে থেকে ঘষে ঘষে ময়লা সাফ করার কাজ—ঘরে পা দিয়েই শুখভ চট করে সেটা বুঝতে পেরেছিল (রাস্তা দিয়ে আসবার সময়ই কথাটা একবার শুখভের মনে হয়েছিল) । এতক্ষণ তাতাব খোলাখুলি জানিয়ে দিল যে, শুখভেব কসুর সে মাপ করেছে এবং শুখভকে এইবার সে ঘরের মেঝেটা ধুযেমুছে সাফ করবার হুকুম দিল ।

পাহারাওয়ালাদের ঘর মোছাব জন্যে আলাদা কয়েদী আছে । বাইবের কাজে তাকে যেতে হয না । সে হল কোতোয়ালিব খিদমতগার ; তাকে রাখাই হয়েছে ঐ করতে । কিন্তু কোতোয়ালিতে নিজেকে সে দিব্যি সড়গড় করে নিয়েছিল ; মেজর সাহেব শান্তিব্যবস্থাব কর্তা আব নিরপত্তা-বিভাগের ওপরওয়ালা ওরফে 'ধর্মবাপ'—এঁদের প্রত্যেকের খাসকামরাতেই তাব ছিল অবাধ গতি । হুজুরে হাজির থাকার দরুন হামেশা এমন সব জিনিস সে শুনে ফেলত, যা সেপাইরাও ঘুণাক্ষরে টেব পেত না । ফলে তার মনে হল, সাধারণ সেপাইদের ঘর মুছলে তাব ইজ্জত চলে যাবে । সেপাইবা তাকে একবার দুবার ডাকাডাকি করে শেষটায বুঝে ফেলল কী ব্যাপাব । তারপর থেকেই শুরু হয়ে গেল ক্যাম্প থেকে লোক ধবে ধবে এনে ঘরদোর মোছানোর দস্তুর ।

সেপাইদের ঘবটাতে গন গন করছে চুল্লীর আগুনের তাত । জাব্বাজোব্বা খুলে রেখে শুধু একটা ময়লাচিটে জামা গায়ে দিয়ে দুজন সেপাই বসে বসে চেকাব খেলছে । আরেকজন বেল্ট-আঁটা ভেড়াব চামড়ার কোট পরে, হাঁটু-অবধি-ঢাকা ফেল্টের বুট পায়ে দিয়ে সরু একটা বেঞ্চিব ওপর শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে । ঘরের এক কোণে একটা খালি বালতি আর একটা ঘব-মোছার ন্যাতা ।

সেল-হাজতে যাওয়ার হাত থেকে বেহাই পেযে শুখভের খুব ভাল লাগল । বলল, —বহুৎ মেহেববানি, সেপাইজী ! আব যদি কক্ষণো উঠতে দেরি হয তো কী বলেছি ।

এখানে হল সিধে বাৎ ; কাজ চুকলেই কেটে পড় । ঘাড়ে কাজ এসে পড়তেই শুখভের গায়ের ব্যথাটা মরে গেল! বালতিটা হাতে নিল শুখভ । হাতটা হি হি করছে খালি । তাড়াতাড়িতে বালিশের তলা থেকে হাতমোজাটা আনতে মনে নেই । বালতিটা নিয়ে শুখভ ইঁদারা থেকে জল আনতে চলে গেল।

বিভিন্ন ব্রিগেডের একদল ফোরম্যান যাচ্ছিল পরিকল্পনা আর উৎপাদন আপিসের দিকে । যেতে যেতে যে খুঁটিটাব গায়ে তাপমানযন্ত্রটি ঝোলানো ছিল, তার নীচে এসে তারা ভিড় করছিল । তাদেব মধ্যে বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠে সে তাপমাত্রা পড়বাব চেষ্টা করছিল। বন্দীনিবাসে আসার আগে তার খেতাব ছিল 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' । নীচে থেকে তাকে নানারকম উপদেশ দেওয়া হচ্ছিল, —দেখো, নিশ্বাস যেন ওর ওপরে পড়ে না.—তাহলে পারা ওপবে উঠে যাবে ।

—বৈকি ! এ তোমার ধন কিনা ! উঠলেই হল !

শুখভদের ব্রিগেডের ফোরম্যান তিউরিনকে ওদের দলে দেখা গেল না। বালতিটা নামিয়ে রেখে শুখভ তার হাতদুটো কোটের হাতার মধ্যে চালিয়ে দিয়ে সোৎসাহে ব্যাপারটা দেখতে লাগল।

খুঁটিব ওপর থেকে লোকটা ফ্যাঁসফেঁসে গলায বলল,—মাইনাস সতেরো !... সতেবোর নিকুচি করেছে !

আর একবাব ভাল করে পরখ কবে নিয়ে লোকটা ঝুপ করে নেমে পড়ল।

একজন বলে উঠল,—সমস্ত সময়ই বিগড়ে আছে, কক্ষণো ঠিক থাকে না। এখানে ওরা বদলে ভাল জিনিস লাগাবে? তবেই হয়েছে। ফোবম্যানেব দল যে যাব ধান্ধায় এদিক সেদিক চলে গেল। শুখভ ছুট দিল ইঁদাবাব দিকে। টুপির দুটো পাশ খোলা থাকায় ঠাণ্ডায তার কানদুটো জমে গিয়েছিল। ইঁদারার ওপর কাঠের গুঁড়িগুলো পুরু বরফে ঢাকা। সরু ফাঁকেব ভেতর দিয়ে বালতিটা ঠেলেঠুলে কোনোরকমে ঢোকানো গেল। দড়িটা কাঠিব মত শক্ত আড়ষ্ট। শুখভ যখন জল নিয়ে পাহাবাওয়ালাদের ঘরে ফিরে এল, তখন তাব বালতি থেকে গলগলিয়ে ঠাণ্ডা ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঠাণ্ডায তার হাতদুটো জমে গিযেছিল। দুটো হাতই সে জলের ভেতর চালিয়ে দিল। বরং জলে হাত ডুবিয়ে তার একটু গরম বোধ হল। শুখভ ফিরে এসে আর তাতাবের টিকি দেখতে পেল না। তবে ঘরে তখন চাবজন সেপাই। চেকার খেলা আর ঘুমোনো ছেড়ে তখন তুমুল বাদবিতণ্ডা চলেছে এই নিযে যে, জানুয়ারি মাসে তারা কতটা করে জোয়ার পাবে। এদিককার এলাকায় খাদ্যের ঘাটতি আছে ; রেশনিং ব্যবস্থা অনেক আগে উঠে গেলেও স্থানীয় লোকজনদের জন্যে সাধারণভাবে যা বরাদ্দ তার বাইরেও সেপাইরা কিছু কিছু খাবারদাবাব শস্তা দবে পেয়ে থাকে। শুখভ ঘরে পা দিতে না দিতেই একজন গাঁক গাঁক কবে চেঁচিয়ে উঠল,—দরজাটা বন্ধ কর, ঘাটেব মড়া ! ঠাণ্ডা হাওযা ঢুকছে যে !

সকালবেলাতেই ফেল্টের জুতো ভিজে যাওয়া—তার চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার আর নেই। শুখভ যদি ব্যারাকে একবাব ছুটে যেতে পাবত। তাতেই বা কী লাভ হত ! কারণ, একজোড়াব বেশী তো তার জুতো নেই। বন্দীনিবাসে আট বছর বসে বসে জুতো নিয়ে কত কাণ্ডকারখানাই না সে হতে দেখল। একবার তো সারা শীত তাকে শুধু গাছেব ছালের চটি 'লপটি' আর টায়ারের তৈরি চে-তে-জে (চেলিয়াবিন্সক ট্র্যাক্টর ফ্যাক্টরির রুশ নামেব আদ্যক্ষর) পরে কাটাতে হয়েছিল। না পেয়েছিল ভালেঙ্কি, না পেযেছিল চামড়ার জুতো। আজকাল অবস্থা ভাল হয়েছে : অক্টোবরে সহকারী ফোরম্যানের পেছনে ফেউ হয়ে লেগে থেকে মালখানায় গিয়ে শুখভ একজোড়া মজবুত চামড়ার বুট আদায় করে এনেছিল। বেশ শক্ত গোছের সামনেটা ; পায়ে দো-ফেরতা কবে গরম পট্টি পরলেও জুতো আঁট হত না। গোড়ালিতে গোডালি ঠুকে একটা সপ্তাহ মহা ফুর্তিতে সে ঘুরে বেড়াল ; যেন তার জন্মদিনের উৎসব চলেছে। আর ঠিক তারপরই ডিসেম্বরে এসে গেল ফেল্টের তৈরি ভালেঙ্কি। কী চমৎকার জীবন ! এমন জীবন পেলে কে

আর মরতে চায় ? কিন্তু ঠিক সেই সময় হিসেবপত্র বিভাগের এক হারামী এই বলে কর্তার কান ভারী করল যে, ভালেঙ্কি ওরা রাখে রাখুক কিন্তু চামড়ার জুতো যেন ফেরত দেয় । অর্থাৎ, একজন কয়েদীর একসঙ্গে দু'জোড়া জুতো রাখার নিয়ম নেই । কাজেই শুখভকে মনস্থির করতে হল : হয় সারা শীত বাইরে চামড়ার জুতো পায় দিয়ে কাটাতে হবে, নয় বরফ গলার সময়ও জলকাদায় ভিজে ঢোল হলেও ভালেঙ্কি পরে থাকতে হবে । শুখভ অগত্যা চামড়ার জুতো জোড়াটাই ফিরিয়ে দিয়ে এল । কত তেল মাখিয়ে মাখিয়ে নরম করা, হায় রে ! শুখভের কত যত্নের, কত আদরের নতুন জুতো ! এ আট বছরে বুকে এত বড় দাগা আর কিছুতেই সে পায়নি । পর্বতপ্রমাণ জুতোর ডাঁইয়ের মধ্যে শুখভের জুতো জোড়া সপাটে গিয়ে পড়ল । বসন্তকালে আবার সে জুতো যে সেখান থেকে শুখভ খুঁজে পাবে তার কোনো আশা নেই ।

শুখভ এবার সড়াৎ করে ভালেঙ্কিদুটো পা থেকে খসিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে দিল, তারপর পট্টিদুটো খুলে তাক করে তার ওপর ছুঁড়ে দিল । ভালেঙ্কি ছাড়তে গিয়ে তার চামচেটা মেঝের ওপর পড়ে যাওয়ায় ঠং করে একটা আওয়াজ হয়েছিল । সেল-হাজতে যাবার জন্যে তৈরি হতে গিয়ে শুখভ যত কম সময়ই পেয়ে থাক, চামচেটা সঙ্গে নিতে ভোলেনি । শুখভ তাড়াতাড়ি চামচেটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল । তারপর খালি পায়ে ন্যাতায় করে দেদার জল মেঝের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে সেপাইগুলোর একেবারে পায়ের তলা থেকে ঘর মুছতে লেগে গেল ।

—এইও, ছুঁচো ! সামলে ! জল চোখে পড়তেই তড়াক করে চেয়ারে পা তুলে দিয়ে একজন সেপাই বলে উঠল ।

অন্য একজন সেপাই বলে চলল, —চাল ? চাল হল আলাদা জিনিস । চালের সঙ্গে জোয়ারের কেন তুলনা করছ ?

—এই উল্লুক, জল ঢেলে যে রাখলি নে । এ আবার তোর কোন দেশী ঘর মোছা ?

—তোর বুড়ী মাগীকে জম্মেও ঘর মুছতে দেখিস নি, শুয়োব ?

শুনে শুখভ সোজা হয়ে উঠে বসল ; তার হাতের ন্যাতা থেকে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে । মুখে তার সাদা সরল হাসি । হাসতেই ফোকলা দাঁত দেখা গেল ; ১৯৪৩ সালে উত্তরে বহু দূরদেশে, উসৎ-ইঝমায় থাকার সময় কাউর হয়ে তার দাঁতগুলো পড়ে যায় । তখন সে প্রায় মরবার দাখিল হয়েছিল । রক্ত পায়খানা করতে করতে পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল, পেটে কিছুই সে রাখতে পারত না । সেদিনকার জের হিসেবে আজ থেকে গেছে শুধু তার ফোকলা দাঁত আর জড়ানো কথা ।

১৯৪১ সালে বুড়ীর কাছ থেকে জবাব দিয়েই তো, হুজুর, ওরা আমাকে এখানে আনলে । সে কেমন ছিল না ছিল, আজ আর মনেও করতে পারি না ।

—ঐ ওদের ঘর মোছার ছিরি । এসব ঘাটের মড়া জানবেও না কিছু, শিখবেও না কিছু । ওদের রুটি গেলানো মানে রুটিগুলো নষ্ট করা । উচিত হল গু খাইয়ে রাখা ।

—আর, শালার এই রোজ রোজ ঘর মোছানোরই বা কী দরকার। অষ্টপ্রহর ঘরে একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব। বলি ওহে, আট চুয়ান্ন ! তুমি বাপু, যাদুর গায়ে হাত বুলানোর মত করে ন্যাতাটা ওপর ওপর বুলিয়ে দিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ো। তা হলেই হবে।

—চাল ! কোথায় জোয়ার আর কোথায় চাল ! কোনো তুলনাই হয় না।

শুখভ ওদের কথামত হাত চালিয়ে কাজ চুকিয়ে ফেলল।

কাজ। কাজ জিনিসটা লাঠির মত। তার দুটো দিক। যখন মানুষদের জন্যে করবে তাতে থাকবে হাতের গুণ ; আর যখন গাডোলদের জন্যে করবে, তখন করবে লোক-দেখাবার মত।

নয়ত এতদিন কবে লোকগুলো ফৌত হয়ে যেত। সবাই সেটা জানে।

শুখভ সারা ঘরে এমনভাবে ন্যাতা বুলিয়ে গেল যাতে মেঝের কোথাও কোনো শুকনো জায়গা না থাকে। তারপর না নিংড়েই ভিজে ন্যাতাটা চুল্লীর পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দরজার ঝনকাঠে দাঁড়িয়ে ভালেঙ্কিটা পায়ে গলিয়ে নিল। বালতির জলটা বড়কর্তাদের যাতায়াতের রাস্তার ওপর ছলাৎ করে ঢেলে দিল। তারপর স্নানাগার পেরিয়ে, ঠাণ্ডা এঁদো ক্লাববাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা সংক্ষেপ করে এসে পড়ল খাওয়াদাওয়ার জায়গায়।

একবার তার ডাক্তারখানায় না গেলেই নয়। আবার সারা শরীরটা ব্যথায় টন টন করছে। একটু দেখেশুনে চলতে হবে যেন খাওয়ার জায়গার সামনে কোনো সেপাইদের চোখে না পড়ে। বন্দীনিবাসের বড়কর্তার কড়া হুকুম : দলছাড়া হয়ে কোনো কয়েদীকে ঘুরতে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে সেল-হাজতে পুরবে।

খাওয়ার জায়গাটার সামনে — কী তাজ্জব ব্যাপার আজ—ভিড়ের গুঁতোগুঁতি নেই, লোকের লাইন নেই। শুখভ দিব্যি সাঁ করে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরটা স্নান করবার হামামের মত ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। একদিকে দরজা দিয়ে ঢুকছে হিম, অন্যদিকে বন্দীনিবাসের জলের মত পাতলা সুপ থেকে উঠছে তাপ। ব্রিগেডের লোকজনেরা হয় টেবিল জুড়ে বসে আছে, নয় যাতায়াতের রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে--জায়গা খালি হলেই বসে পড়বে। একেক ব্রিগেড থেকে দু'তিনজন করে লোক কাঠের ট্রে-তে পাতলা সুপ আর লপসির বাটি নিয়ে ভিড়ের ভেতর পরস্পরকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করতে করতে ঘুরছে। টেবিলে কোথায় খালি জায়গা আছে খুঁজছে।

আধদুমড়ো এক মিনসে রাস্তার মধ্যিখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ! বললে কথা কানে যায় না, ইস্টুপিড কোথাকার ! দিল, দিল তো উল্টে ! ছুড়ুৎ...ছড়াৎ ! খালি হাতটা দিয়ে মারো বেটার ঘাড়ে এক রদ্দা ! বহুৎ আচ্ছা, সাবাস ! সর রাস্তা থেকে, দূর হ ! এঁটো চাটবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, বেরো !

কাছেই এক টেবিলে অল্পবয়সী এক ছোকরা খাবার আগে বুকের ওপর ক্রুসচিহ্ন

করল। তার মানে, পশ্চিম য়ুক্রেনে ওর বাড়ি—এখানে আনকোরা এসেছে। রুশরা তো ভুলেই গেছে কোন হাত দিয়ে ক্রসচিহ্ন করতে হয়।

খাবারঘরটা রীতিমত ঠাণ্ডা। বেশির ভাগ লোকই মাথায় টুপি পরে খাচ্ছিল। তবে হ্যাঁ, খাচ্ছিল বেশ গদাইলস্করী চালে। কালো কালো কপিপাতার তলা থেকে ঘেঁটে-যাওয়া সেদ্ধ মাছের টুকবোগুলো ধরে ধরে মাছের কাঁটাগুলো টেবিলের ওপব থু থু করে ফেলছিল। টেবিলের ওপর একরাশ কাঁটা জমে যাওয়াব পর কেউ হয়ত হাত দিয়ে কাঁটাগুলো ঝেটিযে মেঝেব ওপর ফেলে দিচ্ছিল। তারপর লোকের জুতোর তলায় পড়ে মুড় মুড় কবে ভেঙে যাচ্ছিল। তাই বলে সরাসরি মেঝের ওপর থু থু করে কাঁটা ফেললে কিন্তু সকলেই অভদ্রতা বলে মনে কবত।

ঘরটার ঠিক মাঝখানে খুঁটি নয় অথচ খুঁটির মত দেখতে দু-সার জিনিস ছিল। সেই রকম একটা খুঁটিগোছের জিনিসের ধারে শুখভের সকালের খাবার আগলে বসেছিল তার ব্রিগেডেরই একজন লোক—ফেতিউকভ। ব্রিগেডে ফেতিউকভের স্থান নীচুতে—শুখভেব চেয়েও নীচে। সবাইকার এক ধবনেব কালো খাটো কোট, এক ধবনেব নম্বর দেখে বাইরে থেকে মনে হবে ব্রিগেডেব সবাই বুঝি সমান ; আসলে কিন্তু তলে তলে অনেক তফাৎ—উঁচু থেকে নীচু নানান ধাপ। বুইনভস্কিকে খাবাবের বাটি আগলাতে বলা যাবে না, এমন কি শুখভকে দিয়েও যে-সে কাজ করানো যাবে না। তাব নীচেও কয়েকটা ধাপ আছে।

শুখভকে আসতে দেখে ফেতিউকভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

—সব জুড়িয়ে জল হযে গেছে। আবেকটু হলেই তোমার ভাগটা খেযে ফেলছিলাম। আমি তো ভাবলাম নির্ঘাৎ তোমাকে সেলে আটকেছে।

ফেতিউকভ আর সেখানে দাঁড়াল না। কারণ ফেতিউকভ জানত শুখভেব পাতে আজ আর কিছুই পড়ে থাকবে না—দুটো বাটিই সে চেটেপুটে শেষ করবে।

শুখভ তাব এক পায়ের ভালেঙ্কি থেকে চামচেটা বার করল। চামচেটা তার খুব শখের। গোটা উত্তবদেশ ওটা তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। বালিতে অ্যালুমিনিয়ামের তাব ফেলে শুখভ নিজে হাতে ওটা গড়িযে নিয়েছে। চামচের গায়ে ফুটকি ফুটকি অক্ষরে খোদাই করে লেখা : 'উস্ত-ইঝমা, ১৯৪৪'।

শুখভের কামানো মাথাটা টুপিব নীচে এতক্ষণ ঢাকা ছিল। শুখভ মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে নিল। যত ঠাণ্ডাই পড়ুক—টুপি মাথায় দিয়ে খেতে সে অভ্যস্ত নয়। জুড়িয়ে-যাওয়া সুপটা ঘুঁটে একবার সে খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা কবল বাটিতে কী আছে না আছে। তার ভাগটা সে পেযেছে মাঝখানটা থেকে। হাঁড়ির ওপরের দিক থেকেও নয়, তলা থেকেও নয়। ফেতিউকভকে শুখভ ভাল করেই চেনে : বাটি আগলাতে আগলাতে দু-এক টুকরো আলু মুখে ফেলা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

সুপ যত পাতলাই হোক, গরম থাকে বলে তবু একটু খেয়ে সুখ পাওয়া যায়। শুখভের সুপটা কখন জুড়িয়ে জল হযে গেছে। তা সত্ত্বেও সে রোজকার মত মনপ্রাণ

ঢেলে দিয়ে রয়ে-বসে খেতে লাগল । এ সময় ঘরে আগুন লাগলেও সে কোনোরকম ব্যস্ততা দেখাত না । ঘুমের ব্যাপারটা বাদ দিলে, বন্দীনিবাসের লোকেরা খেতে বসে সকালে মোটে দশ মিনিট, দুপুরে পাঁচ মিনিট আর সন্ধেয় পাঁচ মিনিট—এইটুকুই যা নিজেদের জীবনগুলোকে নিজের করে পায় ।

বন্দীনিবাসের সুপ রোজকে রোজ বদলায় না । শীতের মাসগুলোর জন্যে কোন তরকারি মজুত করা হয়েছে, তার ওপরই সেটা নির্ভর করে । গেল বছর গুদামে থাকার মধ্যে ছিল শুধু নোনা গাজর । তাই সেপ্টেম্বর থেকে জুন স্রেফ গাজরেরই সুপ হয়েছিল । এ বছর সে জায়গায় ছিল কালো বাঁধাকপি ! সারা বছরের মধ্যে এক জুন মাসেই বন্দীনিবাসের লোকজনদের একটু যা খেয়ে তাকত হয় । আর সব তরিতরকারি ফুরিয়ে যাবার ফলে এই সময় তারা পায় ভুট্টার ছাতু । সবচেয়ে ওঁছা মাস জুলাই ; এই সময় স্রেফ বুনো শাকপাতা সেদ্ধ ।

কুচো কুচো মাছ, তাও বলতে গেলে শুধু কাঁটাটুকুই তারা পায় । মাছগুলো এমনভাবে ঘেঁটে যায় যে, মুড়ো আর ল্যাজার কাছে সামান্য একটু লেগে থাকে । শুখভ খানিকটা নিছক হাড্ডিসার মাছের কাঁটা কচমচ করে চিবিয়ে, তারপর চুষে নিয়ে টেবিলের ওপর থু করে ফেলল । যে-কোনো মাছের কানকোই হোক আর ল্যাজাই হোক, শুখভ একটু কিছুও ফেলে না । এমন কি মুড়োর গায়ে চোখ লেগে থাকলে চোখও সে খাবে । কিন্তু চোখটা যদি বেরিয়ে বাটির মধ্যে ভাসতে থাকে—তাহলে আর শুখভ মাছের সেই ড্যাবডেবে চোখটা খাবে না ! অন্য কয়েদীরা এই নিয়ে খুব হাসাহাসি করত ।

শুখভ আজ খানিকটা খাবার বাঁচিয়েছে । ব্যারাকে ফিরে না যাওয়ায় তার বরাদ্দ রুটিটা আনা হয়নি । এখন সে রুটি ছাড়াই খাচ্ছে । রুটিটা সে পরে শুধুমুখেই খেতে পারবে । তাতে আরও বেশী আরাম ।

দ্বিতীয় বাটিটাতে ছিল 'মাগারা'র লপসি । জমে একশা হয়ে আছে । শুখভ চামচে দিয়ে ভেঙে টুকরো করে নিল । গরম গরম খেলেও এ জিনিসটাতে কোনো স্বাদ পাওয়া যায় না, খাওয়ার পর খেয়েছি বলে মনেও হয় না । ঘাসের মত দানা, কেবল হলদে এই যা ; দেখতে জোয়ারের মত । এ জিনিসটা নাকি চীনেদের কাছ থেকে পাওয়া। সেদ্ধ করলে একেকটা ভাগের ওজন পাঁচ ছটাকের মত হয় । আসলে এটা লপসি নয়, জিনিসটা চালানো হয় লপসি বলে ।

চামচেটা জিভ দিয়ে চেঁছেপুঁছে নিয়ে শুখভ সেটাকে তার ভালেঙ্কির ভেতর স্বস্থানে পুরে ফেলল । তারপর মাথায় টুপি দিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হল ।

আকাশে তখনও তেমনি অন্ধকার ঘুট ঘুট করছে । বন্দীনিবাসের হাতায় দুটো সার্চলাইট তখনও আড়াআড়িভাবে তেমনি জোরালো আলো ফেলছে । এই বিশেষ বন্দীনিবাসটির যখন প্রথম পত্তন হয়, পাহারাওয়ালাদের হাতে যুদ্ধের সময়কার প্রচুর হাউই ছিল । যখনই বিজলীকল বন্ধ হয়ে যেত, তখনই তারা আকাশে সাদা সবুজ লাল —রংবেরঙের হাউই ছুঁড়ত । চারিদিক আলোয় আলো হয়ে যেত । মনে হত যেন লড়াই

চলছে । তারপর একটা সময় হাউই ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেল । বোধহয় বড্ড খরচ হয়ে যাচ্ছিল বলে ।

ভোব হওয়ার ঘন্টা বাজবার সময় বাইরে যে-রকম অন্ধকার ছিল এখনও তেমনি । কিন্তু দেখে দেখে যারা অভ্যস্ত, তারা নানারকম খুঁটিনাটি জিনিস লক্ষ্য করে বুঝতে পারবে ফাইলে দাঁড়াবার সময় আসন্ন । খাবার ঘরে কাজ করে খ্রময়—তার পুষ্যি সহকারীটি ৬ নম্বর ব্যারাকের লোকজনদের সকালের খাওয়ার জন্যে ডাকতে গেছে ; ৬ নম্বরে থাকে অশক্ত পঙ্গুর দল—বাইরে যাদের খাটাখাটনি করতে যেতে হয় না । অল্প দাড়িওয়ালা একজন প্রবীণ শিল্পী রং আর তুলি আনতে শিক্ষাসংস্কৃতি বিভাগের দিকে গুটি গুটি চলেছে—তার ওপর কয়েদীদের নম্বর প্লেট লেখবার ভার । তারপর সেই তাতার সেপাই হাজিরা দেবার মাঠটার ভেতর দিয়ে কোতোয়ালির দিকে হন হন করে চলে গেল । বাইরে বিশেষ লোকজন নেই—তার মানে, শেষের কয়েকটি মুহূর্ত প্রায় সকলেই গা গবম করবার জন্যে কোনো আশ্রয়ের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ।

শুখভ তাড়াতাড়ি তাতারের নজর এড়াবার জন্যে ব্যাবাকের কোণে লুকিয়ে পড়ল । দেখতে পেলে আবার শুখভকে তার হাতে পড়তে হ্‌ত । সত্যি বলতে কি, হাই তুলতে গেলেও এখানে বিপদ আছে ; একটু অসাবধান হয়েছ কি গেছ ! এমনভাবে চলতে ফিরতে হবে যেন কোনো সেপাই একা দেখতে না পায । কোনো সেপাইকেই ভরসা নেই—হয়ত কোনো কাজ করিয়ে নেবে বলে কাউকে খুঁজে বেডাচ্ছে, কিংবা গায়েব ঝাল ঝাড়বার জন্যে হাতের কাছে কাউকে চাই । এই যেমন সেদিন, ব্যারাকে যে-হুকুমনামাটা পড়ে শোনানো হল, সামনে কোনো সেপাই থাকলে তার পাঁচ পা আগে মাথার টুপিটা নামিয়ে নিতে হবে, তারপব তাকে পেরিয়ে দু পা যাবার পর টুপিটা পরতে হবে । কোনো কোনো সেপাই আছে অতশত ভ্রূক্ষেপও করে না—আবার এতে কারো কাবো হয়েছে পোয়াবারো । ঐ টুপির মামলায় ফেঁসে গিে কত কয়েদীকে যে সেল-হাজতবাস করতে হয়েছে তার ঠিক নেই । যে যাই বলুক, সব সময় উচিত হল কোণাঘুপচিতে লুকিয়ে পড়া ।

তাতার চলে যেতে শুখভ ঠিকই করে ফেলল হাসপাতালে যাবে । কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল হাজিরা দেবার আগে আজ সকালে সাত নম্বব ব্যারাকে তার যাবার কথা—ঢ্যাঙা লাৎভিয়ানের কাছ থেকে তার দেশের তৈরি পুরো দু-গ্লাস তামাক পাওয়া যাবে । কিন্তু এতসব তাড়াহুড়োর মধ্যে কথাটা সে ভুলেই গিয়েছিল । ঢ্যাঙা লাৎভিয়ানের কাছে কাল রাত্রে তামাকের পার্সেল এসেছে । কাল গেলে হয়ত দেখা যাবে তামাকের একটুও আর পড়ে নেই । পরের পার্সেলের জন্যে তারপর হয়ত পুরো এক মাস বসে থাকতে হতে পারে । লাৎভিয়ানের তামাকটা বড় ভাল ; বেশ কড়া, খেয়ে আমেজ হয় ; দেখতেও গরগরে ।

শুখভ মনে মনে বিরক্ত হয়ে মাটিতে পা ছুঁড়ল—তাহলে কি ফিরে যাবে সাত নম্বর ব্যারাকে ? কিন্তু এদিকে হাসপাতালে যখন এসেই পড়েছে তখন যাওয়াই যাক

বলে গট গট করে এগিয়ে গেল। তার পায়ের নীচে বরফ সশব্দে মুচ মুচ কবে ভাঙতে লাগল।

হাসপাতালের দালানঘর যেমন হয়, একেবারে ঝকঝকে তকতকে। মেঝের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে তো শুখভের ভয়-ভয়ই করছিল। দেয়ালগুলো চকচকে সাদা পেন্ট করা। আসবাবপত্রও সব সাদা।

কিন্তু রুগী দেখার ঘরগুলো সব বন্ধ। শুখভের মনে হল, ডাক্তাররা বোধ হয় তখনও কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। ডিউটিতে ছিল অল্পবয়সী এক ছোকরা। মেডিকেল অ্যাসিস্টান্ট। কোলিয়া ভদোভুশকিন। গায়ে তার ধোপ-ভাঙা সাদা কোট। একটা ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার টেবিলে বসে সে লিখছিল।

কাছেপিঠে আর কেউ ছিল না।

শুখভ এমন ভাব করে মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে নিল যেন কোলিয়া বন্দীনিবাসের একজন কর্তৃস্থানীয় লোক। বন্দীনিবাসের অভ্যেস যাবে কোথায়, শুখভ আড়চোখে দেখে নিল কেলিয়া কী যেন লিখছে। প্রত্যেকটা লাইন সোজা টানা-টানা, মাঝখানে আগাগোড়া সমান ফাঁক। মার্জিনে জায়গা ছাড়া। প্রত্যেকটি বাক্যের আরম্ভের অক্ষরটা বড়। শুখভ দেখেই বুঝল কাজটা আপিসের নয়—নেহাৎই তাব নিজের কোনো কাজ। হোক না হোক তাতে শুখভের কী ?

শুখভ আমতা আমতা করে বলল,—আমি বলছিলাম কি, নিকোলাই সেমিনিচ...আমার শরীরটা...কেমন যেন ভাল নেই। এমনভাবে বলল যেন সে কিছু একটু সুবিধে বাগাতে চাইছে।

ভদোভুশ্‌কিন বড় বড় দুটো শান্ত চোখ তুলে তাকাল। গায়ে সাদা কোট, মাথায় সাদা টুপি। নম্বরটা দেখা যাচ্ছিল না।

—আর সময় পেলে না ? কাল রাত্তিরে আসতে কী হয়েছিল ? জানোই তো সকালবেলায় আমরা রুগী ভর্তি করি না। আজকে যাদের কাজ থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে তাদের লিস্ট আপিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে।

শুখভ জানে না তা নয়। সে এও জানে যে, সন্ধের পর এলেও কাজে ছুটি পাওয়া সহজ হত না।

—দেখ, কোলিয়া...সন্ধেবেলায় যখন জিনিসটা হওয়া দরকাব, তখন আর আমার ব্যথাটা থাকে না...

—কী জিনিস ? কিসের ব্যথা ?

—যখন টিপে টিপে দেখবার চেষ্টা করি ঠিক কোন্ জায়গায় ব্যথা, তখন আর ব্যথাটা খুঁজে পাই না। অথচ সর্বাঙ্গে ব্যথা।

একদল লোক আছে যারা প্রায়ই হাসপাতালে এসে ঘ্যান ঘ্যান করে। ভদোভুশ্‌কিন জানে শুখভ মোটেই তাদের দলে পড়ে না। কিন্তু তার মুস্কিল এই যে, সকালে দুজন মাত্র লোকের জন্যে সে ছুটি মঞ্জুর করতে পারে। এর আগেই দুজনের ছুটির ব্যবস্থা

সে করে ফেলেছে, টেবিলের সবুজাভ কাঁচটার নীচে তাদের নামদুটো লেখাও রয়েছে।

—ঢের আগেই কিছু একটা করা উচিত ছিল। ফাইলে দাঁড়াবার ঠিক মুখটাতে একেবারে শেষ বেলায় তোমার খেয়াল হল ? আশ্চর্য ! এই নাও, ধরো ! বলে ভদোভুশকিন কাঁচের পাত্রটা থেকে একটা থার্মোমিটার বার করে গা থেকে ওষুধের জল মুছে শুখভকে টেম্পারেচার নেবার জন্যে দিল। কাঁচের পাত্রটার মুখে গজ-কাপড়ের ঢাকা আর তার গা ফুঁড়ে আরও কয়েকটা থার্মোমিটার ডোবানো।

দেয়ালের ঠিক পাশেই বেঞ্চি। শুখভ এমনভাবে বেঞ্চিটার একেবারে ধার ঘেঁষে বসেছে যে, আরেকটু হলেই বেঞ্চিটা উল্টে গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে—অথচ পড়ছে না। অমনভাবে সে ইচ্ছে করে বসেনি ; তার এই বসবার ধরনটা থেকে আপনিই বোঝা যাচ্ছে, হাসপাতালে আসার ব্যাপারটা তার রপ্ত নয় এবং তেমন গুরুতর অসুখ নিয়ে সে আসেনি।

ভদোভুশকিন ঘস ঘস করে লিখে চলেছে।

বন্দীনিবাসের একেবারে এক প্রান্তে সবচেয়ে নির্জন জায়গায় এই হাসপাতাল। কোথাও কোনো টুঁ শব্দ নেই। দেয়ালঘড়ির টিক টিক আওয়াজ নেই। (বন্দীদের কাছে ঘড়ি রাখার নিয়ম নেই : সময় জানার দায়টা তাদের হয়ে এখানকার কর্তৃপক্ষই ঘাড়ে নিয়েছেন)। এমন কি একটা ইঁদুর পর্যন্ত এখানে নখ আঁচড়ায় না। হাসপাতালের হুলোবেড়াল তাদের সবক'টাকে নিকেশ করেছে। তাকে রাখাই হয়েছে সেইজন্যে।

কী সুন্দর ঝকমকে ঘর। চারিদিক নিশ্চুপ নিস্তব্ধ। মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে জোরালো আলো। পুরো পাঁচটা মিনিট কোনো কাজ না করে শুখভ চুপচাপ বসে আছে। সব মিলিয়ে তার ভারি ভাল লাগছিল। দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল একেবারে ফাঁকা। ভেতরের কোটটা নেড়েচেড়ে দেখল—বুকের কাছে নম্বর লেখাটা ক্ষয়ে এসেছে, ওটা ঠিক করে নিতে হবে ; নইলে ওর জন্যেই হয়ত কোনদিন কপ করে ধরবে। খালি হাতটা দিয়ে শুখভ তার দাড়িটা দেখল। বড্ড বড় হয়ে গেছে। স্নানাগারে শেষবার সে গেছে দিন দশেকেরও আগে। তারপর থেকেই দাড়ি সমানে বেড়ে চলেছে। তাতে অবশ্য কিছুই যায় আসে না। আর দিন তিনেকের মধ্যেই আর একবার সে স্নানাগারে যাবে, দাড়ি তখনই কামানো হবে। শুধু শুধু কি জন্যে সে নাপিতের কাছে গিয়ে দাড়ি কামানোর জন্যে লাইন দেবে ? সুন্দর হয়ে লাভই বা কী—কাকে সে দেখাবে ?

তারপর ভদোভুশকিনের সাদা টুপিটার দিকে চেয়ে শুখভের লোভাত নদীর ধারের ফৌজী হাসপাতালটার কথা মনে পড়ে গেল—জখম-হওয়া চোয়াল নিয়ে কিভাবে সেখানে সে এসেছিল আর তারপর নিজে সেধে সে আবার লড়াই করতে চলে গিয়েছিল—কী বোকা গাধা ছিল তখন সে—অথচ কম করে পাঁচটা দিন দিব্যি সে বিছানায় শুয়েবসে কাটাতে পারত।

আর এখন তো সে রীতিমত স্বপ্ন দেখে যেন দু-এক সপ্তাহ অসুখ হয়ে সে পড়ে

থাকে, অবশ্য মরতে না হয় এবং কাটাকুটি করতে না হয় এমন অসুখ ; অসুখটা এমন হবে যাতে ওরা হাসপাতালে পাঠায়, তাহলে তিনটে সপ্তাহ সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে পারবে । অবশ্য খেতে দেবে ওরা নিছক জলের মত সুরুয়া । তা দিক ।

এই সময় শুখভের মনে পড়ে গেল হাসপাতালেও এখন আর বিছানায় কেবল শুয়ে থাকতে দিচ্ছে না । একদল নতুন বন্দী আসবাব সঙ্গে সঙ্গে নতুন একজন ডাক্তারেরও আমদানি হয়েছে । তার নাম স্তেপান গ্রিগরিচ । ভদ্রলোক বেজায় হৈ-হৈ-বাজ আব কর্মঠ, কাজ ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারেন না আর সেইসঙ্গে রুগীদেরও মোটে জিরোতে দেন না । তিনি এসে এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, হেঁটে-চলে বেড়াবাব ক্ষমতা আছে যেসব রুগীর তাদের সবাইকেই বাধ্যতামূলকভাবে হাসপাতালের চত্বরে কাজ কবতে হয় : বাগানে বেড়া দিতে হয়, ছোটখাটো রাস্তা বানাতে হয়, ফলগাছেব গোড়ায় মাটি ফেলতে হয় আর শীতকালে মাটি ভেজাবার জন্যে বরফ এনে জমা করতে হয় । ভদ্রলোক জোর গলায় বলেছেন, অসুখ সারানোর সবচেয়ে ভাল ওষুধ হল কাজ ।

কিন্তু ঘোড়া যে ঘোড়া, বেশী খাটালে সেও মারা পড়ে : এটা তাঁর জানা উচিত । নিজেকে যদি কালঘাম ছুটিয়ে ইঁটের পর ইঁট গেঁথে যেতে হত, তাহলে হয়ত ওঁর থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যেত ।

ভদোভুশকিন তখনও লিখে চলেছে । এটা ঠিক যে নিজের কাজই সে কবছিল, কিন্তু কী কাজ কী ব্যাপার জানতে পাবলেও শুখভের মাথায় কিছু ঢুকত না । ভদোভুশকিন আগের দিন রাত্রে নতুন একটা দীর্ঘ কবিতা লিখেছে । যাঁর কাছে কাজই হল মহৌষধ, সেই ডাক্তার স্তেপান গ্রিগরিচকে সে কথা দিয়েছে কবিতাটি দেখাবে—সেইজন্যেই সে এতক্ষণ ধরে বসে বসে নকল করছে ।

এ ধরনের জিনিস একমাত্র বন্দীনিবাসেই ঘটে থাকে । স্তেপান গ্রিগরিচ হাসপাতালের সহকারী বলে ভদোভুশকিনকে নিজের পরিচয় দিতে বলেছিলেন এবং তাকে তিনি হাসপাতালের সহকারী পদে নিযুক্ত কবেছেন । ভদোভুশকিনকে তিনি এমন সব অশিক্ষিত কুলিমজুর ধরে ধরে ইণ্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দিতে শেখাচ্ছেন যাদের সাচ্চা সরল মনে কখনও এ সন্দেহ হবে না যে সে মোটেই হাসপাতালের সহকারী নয় । কোলিয়া আসলে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের ছাত্র ; দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময ধরা পড়ে । স্তেপান গ্রিগরিচ চেয়েছিলেন, যে-জিনিস বাইবে মুক্ত থাকা অবস্থায় সে মন খুলে লিখতে পারত না, সে জিনিস যেন সে জেলে বসে লেখবার সুযোগ পায় ।

ডবল জানলার গা ঝকঝকে সাদা বরফে ঢাকা থাকায় খুব আস্তে হাজিবার ঘণ্টা বাজতে শোনা গেল । ঘণ্টা কানে যেতেই শুখভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল । আগের মতই শরীরটা তার ম্যাজ ম্যাজ করছে, কিন্তু ব্যাপার দেখে মনে হল কাজ থেকে ছুটি পাবার আর তার কোনো আশা নেই । ভদোভুশকিন হাত বাড়িযে থার্মোমিটারটা নিযে দেখতে লাগল,—এ দেখছি, না এদিক না ওদিক—টায়-টায় নিরানব্বই । একশো পয়েন্ট চার হলে আর কারো কোনো কথা বলার কিছু থাকত না । এ অবস্থায় তোমাকে আমি

কাজ থেকে ছুটি করাতে পারব না। তুমি যদি চাও, এখানে অপেক্ষা করতে পারো—কিন্তু তাতে তোমার বিপদও আছে। ডাক্তার যদি বিশ্বাস করে তুমি সত্যিই অসুস্থ, তাহলে কাজ থেকে তোমাকে রেহাই দেবে। আর যদি তার মনে হয় সুস্থ দেহে তুমি অসুখের ভান করছ তাহলে সোজা সেলে পাঠাবে। আমার তো মনে হয়, তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়াই ভাল।

শুখভ কোনো উত্তর দিল না। কোনোরকম নমস্কার-টমস্কার না করেই মাথায় টুপিটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

যারা গরমের মধ্যে আছে, তারা ঠাণ্ডায় থাকার দুঃখ বুঝবে কী করে?

ঠাণ্ডা যেন গায়ে হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে। শীত আর একটু-আধটু দজ্জাল কুয়াশায় শুখভ না কেশে পারল না। বাইরে তাপমাত্রা মাইনাস সতেরো; আর শুখভের ভেতরের তাপ নিরানব্বই। এখন দেখা যাক কে যেতে কে হারে!

শুখভ ছুটতে ছুটতে ব্যারাকের দিকে গেল। যে মাঠে হাজিরা হয়, সে মাঠ একেবারে খালি। গোটা ক্যাম্প খাঁ খাঁ করছে। এ হল সেই হাত-পা ছড়ানো অস্থায়ী একটা মুহূর্ত, যখন রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই জেনেও লোকে এমন ভাব করে যেন আর তাদের লাইন বেঁধে কাজে যেতে হবে না। পাহারাওয়ালার যে দলটাকে সঙ্গে যেতে হয়, তারা তাদের ব্যারাকে গরমে আরাম করে বসে রাইফেলে মাথা রেখে ঢুলছে; এই ঠাণ্ডায় টঙে উঠে চৌকি দেওয়া—সেটাও খুব একটা সুখের ব্যাপার নয়। প্রধান ঘাঁটির পাহারারত সেপাইরা বেলচায় করে খানিকটা কয়লা চুল্লীব মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে। পাহারাওয়ালাদের ঘরে সেপাইরা নিজেদের হাতে-পাকানো সিগারেটে সুখটান দিয়ে নিচ্ছে। কয়েদীরা ধোক্‌ড়া পরে যার যার বাঙ্কে পাতা কম্বলের ওপর মনমরা হয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে—কোমরে তারা দড়ি দিয়ে কষি এঁটে নিযেছে, টুকরো টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে চিবুক থেকে চোখ পর্যন্ত ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে ঢাকা। ফোরম্যান 'চলো এবাব' বলে হাঁক দিলেই সবাই অমনি হুড়মুড় করে উঠে রওনা দেবার জন্যে তৈরি।

ন' নম্বর ব্যারাকের বাকি সকলের সঙ্গে ১০৪ নম্বর ব্রিগেডের লোকেরা ঢুলছিল। কেবল সহকারী ফোরম্যান পাভলো নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়তে নাড়তে পেন্সিলে কী যেন যোগ করছিল আর, হ্যাঁ, শুখভের ঠিক পাশের বাঙ্কের পাদ্রী আলিওশা বাইবেলের উত্তরভাগ কপি-করা তার নোটখাতা থেকে বিড়িব বিড়িব করে পড়ছিল।

শুখভ পা টিপে টিপে ছুটে এসে সটান সহকারী ফোরম্যানেব বাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল।

পাভ্‌লো তার দিকে ঘাড় তুলে দেখল।—তোমাকে তাহলে ওবা সেলে পোরেনি, ইভান দেনিসিচ? তাহলে বেঁচে গেছ?

জেলখানার জল পেটে পড়েও এই পশ্চিম য়ুক্রেনীদের কথাবার্তার ধরনগুলো কিন্তু এখনও ভারি মিষ্টি আছে।

টেবিলেব ওপর থেকে পাভ্‌লো শুখভের বরাদ্দ রুটিটা তার হাতে তুলে দিল।

রুটিটার ওপর চিনির একটা সাদা ছোট্ট ডেলা লেগে ছিল ।

শুখভের হাতে একেবারেই সময় ছিল না । তা হলেও শুখভ একটু দাঁড়িয়ে অমায়িকভাবে দুটো কথা বলল । কারণ, সহকারী ফোরম্যান তার মুরুব্বিও বটে এবং সত্যি বলতে কি, ক্যাম্পের কমাণ্ডান্টেব চেয়েও সহকারী ফোবম্যানের গুরুত্ব তাব কাছে বেশী । ব্যস্ততার মধ্যেও শুখভ জিভ দিয়ে পাঁউরুটির ওপর থেকে চিনির দলাটা চেটে নিয়ে একটু উঠে বাঙ্কটা ঠিক কবার জন্যে ব্র্যাকেটের ওপর একটা পা রাখল—আব সেই অবস্থায় রেশনের রুটিটা হাতে করে একটু নেড়েচেড়ে দেখে নিল রুটিটাব ওজন ঠিক আঠারো আউন্সই আছে কিনা । জেলে আর বন্দীনিবাসে অমন হাজার হাজাব রেশন সে পেয়েছে । যদিও দাঁড়িপাল্লায় কখনও মাপবার সুযোগ হয়নি, এবং যদিও মুখচোরা বলে নিজের অধিকার নিয়ে চেঁচামেচি হৈ-হল্লা কখনও সে করেনি—তাহলেও শুখভের কাছে (এবং প্রত্যেকটি বন্দীর কাছেই) অনেকদিন আগেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রুটি কাটার ঘরে যাবা কাজ করে তারা যদি ওজনেব ব্যাপারে কারচুপি না করে তাহলে আর তাদের বেশীদিন ও-কাজে বহাল থাকতে হবে না । বরাদ্দ প্রত্যেক রুটি থেকেই কমবেশি মার যায় । কেবল কথাটা হল কতটা মাবে । খুব বেশী মারে কি ? আর রোজই দেখেশুনে নিজের মনকে সবাই এই বলে চোখ ঠাববে—আজ হয়ত আমাকে ওরা খুব তেমন ঠকায়নি । ওজনটা বোধহয় প্রায় ঠিক আছে ।

আন্দাজ করে শুখভের স্পষ্ট মনে হল, এক আউন্স মেরেছে। পাঁউরুটিটা শুখভ দু' টুকরো করল । কয়েদীদেব ভেতরের জামায় পকেট থাকে না, কিন্তু শুখভ তার ভেতরের জামায় একটা স্পেশাল সাদা পকেট বানিয়ে নিয়েছিল—অর্ধেকটা রুটি সে সেই পকেটে রেখে দিল । বাকি অর্ধেকটা আরেকটু হলেই সে খেয়ে ফেলছিল—কিন্তু তাড়াহুড়ো করে খেলে খাবারটা আর খাবার থাকে না । পেটে যায় কিন্তু ক্ষিধে মেটে না । রুটির অর্ধেকটা শুখভ তার লকারেব মধ্যে রাখতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত রাখল না। তার মনে পড়ে গেল, লকার থেকে চুরি কবার জন্যে দু-দুবার ফালতুরা ঠ্যাঙানি খেয়েছিল। প্রকাণ্ড ব্যারাক এবং যে-কেউ যখন তখন এখানে ঢুকে পড়তে পারে ।

এইসব ভেবে ইভান দেনিসোভিচ ভালেঙ্কি থেকে এমন কায়দা করে পা দুটো বের করে নিল যে, ভালেঙ্কিতেই পট্টি আব চামচে থেকে গেল । এবার সে তার রুটির অর্ধেকটা হাতে নিয়েই খালি পায়ে ওপরে উঠে পড়ল । শোবার তোশকের ওপব একটা ফুটো ছিল, সেই ফুটোটা টেনে বড় করে শুখভ তার ভেতর তার রুটির অর্ধেকটা কাঠের গুঁড়োর মধ্যে লুকিয়ে বেখে দিল । তারপর মাথা থেকে টুপিটা খুলে তার ভেতর থেকে ছুঁচসুতো বার করল । এ দুটো জিনিসও টুপির অনেকটা ভেতরে লুকানো ছিল । তল্লাসির সময় টুপিগুলো খুঁজে-পেতে দেখা হয় । একবার টুপি দেখতে গিয়ে এক সেপাইয়ের আঙুলে ছুঁচ ফুটে গিয়েছিল—রেগে গিয়ে আরেকটু হলে সে শুখভের মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছিল । শুখভ এবার বেশ ভাল করে কয়েক ফোঁড় দিয়ে ফুটোর মুখটা মোক্ষম করে বন্ধ করে দিল । তোশকের ভেতরে থেকে গেল রুটিটা । এইসব করতে করতে শুখভের

মুখের মধ্যে চিনির ডেলাটা কখন মিলিয়ে গেছে। শুখভ উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে। যে-কোনো মুহূর্তে দরজায় পাহারাদার এসে হাঁক দেবে। শুখভের হাত চলছে বিদ্যুৎবেগে আব সেইসঙ্গে সে আগে থেকে ভেবে বাখছে এরপব কী করবে না করবে।

পাদ্রী আলিওশা বাইবেলেব উত্তবভাগ পড়ছে—নিঃশব্দে নয়, আস্তে বিড বিড করে। বোধহয শুখভের যাতে শুনে পুণ্য হয় সেইজন্যে। এই পাদ্রীব দল সবসময় একটু প্রচার কবে নিতে ভালবাসে।

—কিন্তু দেখো. কেউ যেন তোমরা খুনী, চোর, বদমায়েস, অনিষ্টকাবী হয়ে কষ্ট পেয়ো না ; কিন্তু কেউ যদি খ্রীস্টান হযে কষ্ট পাও, তাহলে তাব লজ্জাব কিছু নেই ; ঐ নামে সে ঈশ্ববেব মহিমা প্রচার করুক।

দেযালেব গাযে একটা গুপ্ত জায়গায আলিওশা তার নোটখাতাটা লুকিয়ে বাখবার এমন. চমৎকার একটা ব্যবস্থা কবেছে যে, এ পর্যন্ত কোনো তল্লাসিতেই সেটা ধরা পড়েনি। আলিওশাকে বাহাদুব বলতে হবে।

শুখভ দ্রুত হাত চালিযে একটা হেৎনার গাযে ওভার-কোটটা ঝুলিয়ে বেখে তোশকেব নীচে থেকে হাতমোজা, পাতলা একজোড়া বাড়তি পায়েব পট্টি, একটুকবো দড়ি আর ফিতের পাড দেওয়া একটুকবো কাপড টেনে বার করে নিল।

তোশকেব ভেতব কাঠেব গুঁড়ো জমে শক্ত এবড়ো-খেবড়ো হযে যাওয়ায় শুখভ পিটিযে পিটিয়ে খানিকটা সমান করে নিল। কম্বলেব পাশগুলো মুড়ে দিযে বালিশটা জাযগামত রেখে দিল। তাবপর বাঙ্ক থেকে নেমে এসে আগে ভাল পট্টিটা পবে পাতলা পট্টিটা পাযে পরে নিল।

এই সময ফোবম্যান কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়িযে জোব গলায় হেঁকে উঠল, —উঠে পড়ো ১০৪ নম্বব! চলো বাইবে!

সঙ্গে সঙ্গে গোটা ব্রিগেড—যারা ঢুলছিল, যাবা চোখ চেয়ে ছিল, তারা সবাই হাঁই তুলতে তুলতে উঠে পড়েই দবজাব দিকে ছুট। উনিশটি বছব ফোবম্যানের বন্দীদশায় কেটেছে। লোকজনদেব সে একটি মিনিটও আগে কাজে ঠেলে পাঠাবে বলে মনে হয না। সে 'চলো বাইরে' বললে বুঝে নিতে হবে পত্রপাঠ বাইবে চলো।

ব্রিগেডেব লোকেরা মুখ বুঁজে লাইনবন্দী হয়ে বাইরে গলিতে এসে তাবপর ঢাকা প্রবেশপথ পেরিয়ে উঠোনে এসে পড়তে না পড়তেই তিউবিনের ঢঙে ২০ নম্বর ব্রিগেডের ফোরম্যানেব হাঁক শুনতে পাওয়া গেল, 'চলো বাইরে!' শুখভ এর মধ্যে দু'প্রস্থ পট্টির ওপর পায়ে ভালেঙ্কি গলিয়ে নিযেছে, গাযে ওভারকোট জড়িযে নিয়েছে আর কোমরে কষে দড়ি বেঁধে নিয়েছে। (যার যার চামড়াব বেল্ট ছিল, কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত কবে নিয়েছে—স্পেশাল ক্যাম্পে বেল্ট রাখবার হুকুম নেই)।

কাজেই শুখভ একেবারে ফিটফাট হয়ে ছুটে এসে উঠোনেব আগেই ঢাকা প্রবেশপথের কাছে তার ব্রিগেডের শেষ লোকটাকে ধরে ফেলল। ব্রিগেডেব লোকেবা

একজন একজন করে এগিয়ে-পেছিয়ে হাঁটছে—যার যা-কিছু ছিল সব নিঃশেষে তারা একটার পর একটা গায়ে চড়িয়েছে। পায়ে পায়ে যাতে জড়িয়ে না যায় তার জন্যে মাঝখানে খানিকটা করে জায়গা ছেড়ে রাখা হয়েছে। এইভাবে লাইনবন্দী হয়ে তারা হাজিরা দেবার মাঠে এসে পড়ল। পায়ের নীচে মুচ মুচ করে বরফ ভাঙার শব্দ ছাড়া চলতে চলতে তাদের আর কোনো আওয়াজ নেই।

আকাশের পূবদিকটা সবুজাভ আর ফিকে হলেও অন্ধকার তখনও কাটেনি। তার ওপর পূবদিক থেকে শন শন করে বিশ্রী একটু হাওয়াও বইছিল।

দিনের মধ্যে এটাই সবচেয়ে জঘন্য সময়—সাতসকালে এই অন্ধকারে, এই ঠাণ্ডার মধ্যে ঘরের বাইরে গিয়ে সারাদিনের মত পেটে খিদে নিয়ে এই লাইনে দাঁড়ানো। জিভগুলো যেন কেউ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়েছে। কারো সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি নেই।

হাজিরা দেবার মাঠে একজন নিম্নপদস্থ তদারকী অফিসার ছুটোছুটি করছিল। রেগেমেগে সে বলল,—ওহে তিউরিন, আর আমরা কত দেরি করব? তোমার দেখছি আবার সেই গয়ংগচ্ছ ভাব শুরু হয়েছে।

হেঁজিপেঁজি অফিসারকেও ভয় করে শুখভ। তিউরিন তাকেও গ্রাহ্য করল না। তিউরিনের ভারি দায় পড়েছে এই ঠাণ্ডায় ওর সঙ্গে কথা বলতে। বিনা বাক্যব্যয়ে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগল। আর তার পেছন পেছন গোটা ব্রিগেড খচর-মচর চিড়িকমিড়িক করে এগোতে লাগল।

এক সের শুয়োরের মাংস ঘুষ দিয়ে দেখাই যাচ্ছে বেশ কাজ হয়েছে; কেননা, ১৪০ নম্বর ব্রিগেড তাদের সেই পুরনো জায়গাতেই এখনও বহাল আছে। ওদের চেয়েও যাদের হীন অবস্থা, যারা একটু হাঁদা গঙ্গারাম—তাদেরই সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন নগরে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে। ইস, কিন্তু কী সাংঘাতিক দশা হবে আজ ওদের—মাইনাস সতেরো, কনকনে বাতাস, তার ওপর একটু কোনো আশ্রয় নেই, আগুন নেই।

ব্রিগেডের ফোরম্যানের অনেকটা করে নধর শুয়োরের মাংস লাগে। খানিকটা লাগে পরিকল্পনা আর উৎপাদন বিভাগে নিয়ে যাবার জন্যে আর খানিকটা লাগে তার নিজের ভোগে। নিজের বাড়ি থেকে না এলেও ফোরম্যানের কখনও ও-জিনিসের অভাব হয় না। ব্রিগেডের যারই বাড়ি থেকে পার্সেল আসুক, তক্ষুণি সে ফোরম্যানকে খানিকটা ভেট দিয়ে আসবে।

নইলে তুমি বাঁচতে পারবে না।

উপরওয়ালা অফিসার একটা কার্ডের গায়ে টুকে নিচ্ছিল: তোমার দলে, তাহলে তিউরিন, একজন আজ অসুখ করে ছুটিতে আছে। বাকি তেইশ জন উপস্থিত?

কাকে পাওয়া যাচ্ছে না? পান্তেলেয়েভকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর আবার কখন অসুখ করল? সঙ্গে সঙ্গে ব্রিগেডসুদ্ধ লোক কানে কানে কথা বলতে শুরু করে দিল। পান্তেলেয়েভ—কুত্তাটা আবার ব্যারাকে থেকে গেছে। অসুখ-টসুখ বাজে কথা! নিরাপত্তা বিভাগই ওকে আসতে দেয়নি। ও নিশ্চয় এখন কারো নামে লাগানো ভজানো করছে।

দিনের বেলায় নিরাপত্তা বিভাগ তাকে বিনা বাধায় তলব করতে পারে । দরকার হলে তাকে ঘণ্টা তিনেক বা তারও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে । কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না । কেউ তো শুনতে পাচ্ছে না । চিকিৎসা বিভাগের যোগসাজসেই এ ব্যাপারে তারা লোকের চোখে ধুলো দিতে পারবে ।

হাজিরা দেবার মাঠটা কালো ওভারকোটে ছেয়ে গেছে । প্রত্যেকটা ব্রিগেড গা-তল্লাসির জন্যে আস্তে আস্তে ঠেলেঠুলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে । শুখভের মনে পড়ল তাব ভেতরের জামার গায়ের নম্বরটা ঠিক করে নেওয়া দরকার এবং ঠেলাঠেলি করে মাঠ পেরিয়ে মাঠের ওপারে চলে গেল । আর্টিস্টের সামনে দু-তিন জন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল । শুখভ তাদেব পেছনে দাঁড়িয়ে গেল । কয়েদীদের আবার নম্বর নিয়েও কম ঝকমারি নয় । নম্বর দেখেই সেপাইরা দূর থেকে লোক চিনে ফেলতে পারে আব কনভয় গার্ডরাও খাতায় লিখে নিতে পারে । কিন্তু সেই নম্বর তুমি যদি ক্ষয়ে যেতে দাও, তাহলে তোমার সেল-সাজা অবধারিত—কেন তুমি তোমার নম্বরের যত্ন নাও না ?

বন্দীনিবাসে আর্টিস্ট আছে তিন জন । অফিসারদের তারা বিনা পয়সায় ছবি এঁকে দেয় আর তার ওপর ফাইলে দাঁড়াবার সময় তারা পালা করে নম্বরে রং লাগায় । আজ পালা পড়েছে ছোট সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো আর্টিস্টের । বুড়ো যখন টুপির ওপর তুলি দিয়ে রং বুলোয়, দেখে মনে হয় যেন কোনো পাণ্ডাপুরুত কপালে রসকলি আঁকছে ।

বুড়ো আর্টিস্ট একটার পর একটা রং বুলিয়ে যাচ্ছে আর অনবরত হাতের দস্তানায় নাক মুচছে । হাতে তার বোনা পাতলা দস্তানা । ঠাণ্ডায় হাতটা শক্ত আড়ষ্ট হয়ে গেছে । নম্বরগুলো স্পষ্ট হচ্ছে না । ভেতবের কোটে শ-৮৫৪ নম্বরটা দাগানো হল । শুখভ তার ওভারকোটেব বোতাম না লাগিয়েই হাতে দড়ির কোমরবন্ধটা নিয়ে ছুটে এসে নিজেব ব্রিগেডকে ধরে ফেলল—কারণ, দু-চার মিনিটের মধ্যেই সেপাইরা গা-তল্লাসি শুরু করে দেবে । হঠাৎ একটু দূরে তার নজরে পড়ল তারই দলেব একজন—ৎসেজাব ধোঁয়া ছাড়ছে । ৎসেজার পাইপ টানছিল না, টানছিল সিগারেট । তার মানে পোড়া সিগারেটে একটা সুখটান দেওয়া যেতে পারে । কিন্তু সোজাসুজি চেয়ে বসা তার পক্ষে সম্ভব হল না ; সোজাসুজি না চেয়ে শুখভ সরে এসে ৎসেজারের ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে ঘাড়টা খানিকটা ঘুরিয়ে তার দিকে দৃষ্টি মেলে ধরল ।

শুখভ এমন একটা উদাস ভাব নিযে তার দিকে তাকিযে রইল যেন তাকে সে দেখেও দেখছে না ; কিন্তু তার চোখে পড়তে লাগল প্রত্যেকটা টানের পর—চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকায় ৎসেজার অনেকক্ষণ পরে পরে টানছিল—আগুনের লাল আভাটা সিগারেটের গা বেয়ে ক্রমশ হোল্ডারের দিকে এগোচ্ছে ।

ঠিক সেই সময় ফেতিউকভ—কোত্থেকে বেটা ফেউ এসে—ৎসেজারের ঠিক সামনে উদয় হয়ে তার মুখের দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে রইল ।

শুখভের কাছে একফোঁটা তামাক নেই ; সন্ধের আগে কোথা থেকেও যোগাড়

করতে পারবে, তেমন কোনো আশাও সে দেখতে পাচ্ছে না। এতক্ষণ সে আশায় আশায় মুখিয়ে উঠেছিল এবং, ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, মুক্তির চেয়েও তার কাছে ঢের বেশি কাম্য পোড়া সিগারেটের ঐ টুকরোটা। কিন্তু শত হলেও, ফেতিউকভের মত সোজা ৎসেজারের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে শুখভ কখনই নিজের মাথা হেঁট করবে না।

ৎসেজাবের গায়ে পাঁচমিশেলী জাতেব রক্ত। সে গ্রীক, না ইহুদী, না জিপসী বলা শক্ত। বয়সে এখনও সে তরুণ। ৎসেজার ছিল সিনেমার ক্যামেরাম্যান, কিন্তু নিজের প্রথম ছবি তোলা শেষ হওয়াব আগেই সে গ্রেপ্তার হয়। মুখে তার কালো মোটা ঘন গোঁফ। পুলিশেব খাতায গোঁফসুদ্ধ ফটো তোলা আছে বলেই জেলখানায় তাব গোঁফ কামিয়ে ফেলা হযনি।

—ৎসেজার মার্কোভিচ! ফেতিউকভ আর নিজেকে সম্বরণ কবতে না পেবে লালায়িত হয়ে বলে উঠল,—আমাকে একটা টান! তার মুখটা খিদেয় আব লোভে বিকৃত হয়ে উঠেছে।

ৎসেজারের কালো চোখ এমনিতেই ছিল অর্ধনিমীলিত। চোখের পাতা প্রায না তুলেই সে ফেতিউকভের দিকে তাকাল। ইদানীং ৎসেজার পাইপ খাওয়া ধরেছিল যাতে কয়েদীব দল সিগারেটের ভাগ চেয়ে তাব ধূমপানে ব্যাঘাত ঘটাতে না পাবে। তার আপসোস তামাকেব জন্যে নয়, তাতে চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে যেত বলে। মুখে ধোঁযা ছাড়তে ছাড়তে সে চিন্তার মধ্যে ডুবে যেত: এইভাবে সে অনেক নতুন আইডিয়া পেত। কিন্তু কোনো একটা সিগারেট ধরাতে না ধরাতেই সে দেখত অজস্র চোখে নীবব প্রার্থনা ফুটে উঠেছে, আমাকে দিও কিন্তু সুখটানটা!

ৎসেজার এবার শুখভেব দিকে ফিরে বলল, —নাও, ইভান দেনিসিচ।

বলে তার কাঠের ছোট হোল্ডাবটা থেকে শেষ-হয়ে-আসা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা মুচড়ে বার কবতে লাগল। শুখভ তাড়াতাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে সিগারেটের শেষ-হযে-আসা টুকবোটা গ্রহণ করল আর পাছে সেটা পডে যায তার জন্যে সাবধানে একটা হাত পেতে রাখল। ৎসেজার নিজে থেকে যাতে তাকে দেয় তার জন্যেই শুখভ এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। ৎসেজার যে তাকে হোল্ডারসুদ্ধ সিগারেটটা দিতে কার্পণ্য করল, তার জন্যে শুখভ মোটেই ক্ষুণ্ন হল না। যতই হোক, কিছু লোক আছে যাদের মুখ পরিষ্কাব আব কিছু লোকের নোংরা। একেবাবে জ্বলন্ত জায়গাটা ধরতে হলেও তার অসাড় আঙুলগুলোতে আগুনের ছেঁকা লাগল না। সবচেয়ে বড় কথা হল ফেতিউকভকে —ঐ ফেউ বেটাকে সে টেক্কা দিতে পেরেছে। ঠোঁট পুড়তে আরম্ভ করলেও শুখভ গলায ধোঁয়া টানতে পারছে। উঁ-উঁ-উঁ-আ-আ-আঃ! শুখভের ক্ষুধার্ত শরীরময় ধোঁয়া ছড়িয়ে পডছে। ধোঁযা যাচ্ছে পায়ে, ধোঁয়া যাচ্ছে মাথায়—সব সে অনুভব করতে পারছে।

সারা শরীরে বানডাকা এই সুখ ছড়িয়ে পডতে না পড়তে সে একটা হল্লা শুনতে

পেল,— আমাদের ভেতরের জামাগুলো ওরা নিয়ে নিচ্ছে গো, নিয়ে নিচ্ছে ।

কয়েদীদের জীবনভব অশান্তি লেগেই আছে । শুখভের ওসব গা-সওয়া । শুধু দেখো, ওরা যেন তোমাব টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলতে না পারে ।

ভেতরের জামা ? কেন, ভেতবেব জামা কেন ? ও জামা তো খোদ বড়কর্তারই দেওয়া । উঁহু, এ হতেই পারে না...

শুখভদের সামনে আবও দুটো ব্রিগেড রয়েছে । আগে তাদেব গা-তল্লাসি হবে । ১০৪ নম্বর ব্রিগেড দেখল, বন্দীনিবাসের শাস্তিবিধানেব কর্তা লেফটেন্যান্ট ভলকোভোই কোতোযালি ব্যাবাক থেকে বেরিযে এসে সেপাইদের ধমকাচ্ছে । ভলকোভোই ধারে-কাছে না থাকায় সেপাইরা যো-সো করে আলটপকা গা-তল্লাসি করছিল । ধমক খাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা জানোয়ারের পালেব মত লোকগুলোব ওপর হন্যে হয়ে ঝাঁপিযে পড়ল। যাবা খবরদারি করছিল, তারা কয়েদীদেব ভেতবের জামাব বোতাম খুলতে বলে হেঁকে উঠল,—খোলললললল বোতামমমমমম !

শুধু কয়েদী আব সেপাইবাই নয, লোকে বলে ক্যাম্পেব বড়কর্তাও নাকি ভলকোভোইকে ডবাত । তার নামের মানে হল 'নেকড়ে' । ভগবানও শয়তানটাকে বড় ভাল দাগিয়েছেন—নামটা দিয়েছেন একেবারে লাগসই । ওর জ্বলজ্বলে চাউনিটা পর্যন্ত হুবহু নেকড়েব মত । চাপা রং, লম্বা, ভুরু-কোঁচকানো চেহারা—খব খব করে চলে । ব্যাবাকের পেছন থেকে হঠাৎ সে লাফ দিযে বেরিযে এসে লোকজনদেব বলে, —কী হচ্ছে কী এখানে ? তাব সামনে কারো সাধ্য নেই নিজেকে আড়াল কবে । গোড়ায় গোড়ায তার সঙ্গে থাকত ছোট একটা চামড়ায় বাঁধানো চাবুক । লোকে বলে সেলের বন্দীদেব নাকি ঐ দিযে সে পিটত । মাঝে মাঝে ব্যারাকে সন্ধের হাজিবাব সময যখন কযেদীদেব ভিড় বেড়ে গিযে বিষম হৈচৈ বেধে যেত, হঠাৎ পেছন থেকে গুটি গুটি এসে সপা-ং সপা-ং ! একদম ঘাড়েব ওপর সে চাবুক মারত ।—কেন লাইনে দাঁড়াসনি, ঘাটেব মড়া ? ভিড়টা পিছন দিকে হেলে তার সামনে থেকে সরে দাঁড়াত । যে লোকটা চাবুক খেত, তৎক্ষণাৎ সে নিজের ঘাড়ে হাত দিয়ে রক্ত মুছে ফেলত, মুখে টুঁ শব্দও করত না—পাছে তাকে সেলে আটক কবে ।

আজকাল কী কাবণে জানি না ভলকোভোই আব চাবুক আনে না ।

নিদারুণ শীত পড়লে সকাল বেলায গা-তল্লাসি থেকে বেহাই মেলে, তাই বলে সন্ধেবেলায নয । প্রত্যেকটি কয়েদীই নিজেব নিজেব টেঁটি ওভারকোটেব বোতাম খুলে গা থেকে ওভাবকোট টেনে খুলে ফেলল, তারপব পাঁচজন পাঁচজন কবে সার বেঁধে এগিযে গেল । তাদেব মুখোমুখি পাঁচজন সেপাই দাঁড়িয়ে । সেপাইরা প্রত্যেক কযেদীব বেল্টবাঁধা কোটের এপাশ ওপাশ থাবড়ে থাবড়ে দেখল । কয়েদীদের মোটে একটিই অনুমোদিত পকেট—ডান হাঁটুব ওপব । সেপাইরা হাতের দস্তানা না খুলে বাইরে থেকে পকেটগুলো হাতড়ে দেখাব সময়, তেমন তেমন ঠেকলে তৎক্ষণাৎ ভেতরে হাত চালিয়ে না দিযে গা-ছাড়া ভাবে জিজ্ঞেস করছিল,—কী ওটা ?

কী এমন দরকার পড়ল যে সকালবেলাতেই কয়েদীদের গা-তল্লাসি করতে হবে ? ছুরিটুরির জন্যে নাকি ? ছুরি আবার কে বাইরে নিয়ে যায় ! ছুরি তো বাইরে থেকে ভেতরে আনবারই জিনিস ! সকালে ওরা শুধু নজর রাখে ছ'পাউণ্ড বা তার কাছাকাছি ওজনের রুটি কোনো কয়েদীর কাছে না থাকে— একসঙ্গে অত বেশী রুটি রাখা মানেই পালানোর মতলব করা। একটা সময়ে কোনো কয়েদীর কাছে ছ' আউন্সের এক টুকরো রুটি থাকাটাও রীতিমত ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল । তখন ওরা এই বলে হুকুম জারি করেছিল যে, প্রত্যেকটি ব্রিগেডকে নিজের নিজের কাঠের বাক্স বানিয়ে নিয়ে তাতে করে গোটা ব্রিগেডের দুপুরের খাবার বয়ে নিয়ে যেতে হবে । কেউ ভেবেই পেল না, এতে ওদের ঠিক কোন কাজটা হবে বলে ওরা মনে করছে। হয়ত ওদের একটাই উদ্দেশ্য —লোকগুলোকে ভোগানো, আরও একটু হয়রানি করা । কাঠের বাক্সে যে যার ভাগ রাখতে গিয়ে প্রত্যেকেই চিহ্ন করার জন্যে রুটির গায়ে একটু করে কামড় দিয়ে নিত । হলে হবে কি, সব ভাগই তো দেখতে হুবহু এক—এক রুটি থেকেই তো কাটা ! সুতরাং কাজে যাবার সময় সারাক্ষণ তারা তাদের রুটিগুলো বেহাত হতে পারে ভেবে মন খারাপ করত । ব্রিগেডের লোকজনদের মধ্যে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি তো হতই, এমন কি কখনও কখনও হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছে । একবার এক কাণ্ড হল—কাজের জায়গা থেকে তিন জন কয়েদী একটা মোটরগাড়িতে চড়ে উধাও হয়ে গেল, যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল রুটিভর্তি পুরো একটা কাঠের বাক্স । তখনই কর্তাদের টনক নড়ল—গার্ডরুমে নিয়ে গিয়ে কাঠের বাক্সগুলো চেলা করা হল । কর্তারা বললেন, এবার থেকে যে যার রুটি নিজে বয়ে নিয়ে যাবে ।

সকালবেলায় ওদের আরও একটা জিনিস দেখতে হত—জেলখানার কুর্তার তলায় যেন কেউ সাধারণ লোকের পরিচ্ছদ পরে বেরোতে না পারে । সেসব পরিচ্ছদ যার যা ছিল সবই তো জেলে ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে করে কেড়ে রেখেছে । আর নেবার সময়ই বলে দিয়েছে—মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কেউ সেসব ফেরত পাবে না । এ ক্যাম্প থেকে আজ পর্যন্ত কেউ মেয়াদ খেটে বেরোতে পারেনি ।

সেইসঙ্গে সেপাইদের এটাও দেখতে হত যে, বাইরের লোকদের দিয়ে চিঠি পাঠাবার জন্যে কেউ সঙ্গে কোনো চিরকুট নিয়ে যাচ্ছে কিনা । চিঠির জন্যে প্রত্যেককে দস্তুরমত তল্লাসি করতে গেলে ঐ করতেই দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে যেত ।

কিন্তু ভলকোভোই কী যেন চেঁচিয়ে বলতেই সেপাইরা সব ধাঁ করে হাতের দস্তানাগুলো খুলে ফেলল, কয়েদীদের বলা হল কোট আর শার্টের বোতামগুলো খুলতে —যার আড়ালে তারা সযত্নে জমিয়ে রেখেছিল ব্যারাকের ঈষদুষ্ণতা । তারপর সেপাইরা জনে-জনে দেখতে লেগে গেল আইন অমান্য করে কোনো কয়েদী বাড়তি কোনো কাপড়চোপড় পরেছে কিনা । একজন কয়েদীর গায়ে থাকবে দুটো করে শার্ট—একটা ভেতরে, একটা তার ওপর । দুটোর বেশী থাকলেই খুলে ফেলতে হবে । কয়েদীরা ভলকোভোইয়ের এই হুকুমের কথা লাইন থেকে লাইনে মুখে মুখে রটিয়ে দিল । যেসব

ব্রিগেড এর আগে বেরিয়ে যেতে পেরেছে—তারা বেঁচে গেল । কোনো কোনো ব্রিগেড এর আগেই গেটের বাইরে চলে গেছে । যারা থেকে গেছে—তাদেরই মরণ ! খোলো শার্ট । যার গায়ে বাড়তি যা কিছু আছে খুলে দাও এই কন্‌কনে ঠাণ্ডায় ।

গোড়ায় এইভাবেই শুরু হল, কিন্তু তারপরই ফ্যাচাং দেখা দিল । গেট খালি হয়ে যেতেই গেটে দাঁড়িয়ে সেপাইরা হাঁক জুড়তে লাগল,—দাঁড়িও না, চলে এসো, দাঁড়িও না, চলে এসো । ফলে ১০৪নং ব্রিগেডের বেলায় ভলকোভোই একটু আল্লা দিল । বলল, কারো গায়ে অননুমোদিত কাপড়জামা থাকলে এক্ষুণি খোলবার দরকার নেই । পাহারাঅলা সেপাইরা তাদের নাম টুকে রাখবে । লিস্টিভুক্ত লোকেরা সন্ধেবেলায় যেন তাদের বাড়তি জামাকাপড় ভাণ্ডারীর কাছে জমা দেয় । জমা দেবার সময় তাদের লিখে জানাতে হবে কেন এবং কিভাবে তারা ওসব জিনিস লুকিয়ে রেখেছিল ।

শুখভের গায়ে যা কিছু ছিল সবই জেলখানায় পাওয়া । এই আমি, কলজের ভেতরে-বাইরে হাত দিয়ে দেখে নাও । কিন্তু ৎসেজার মার্কোভিচের গায়ে বাড়তি একটা ফ্ল্যানেলের ভেস্ট আর বুইনভস্কিরও একটা ভেস্ট ধরনের বা কোমরবন্ধ গোছের জিনিস । সেপাইরা লিস্টি করে নিল । বুইনভস্কি ফোঁস করে উঠল । নৌবহরে থেকে তার চেঁচানোর অভ্যেস । বন্দীশিবিরে মোটে তিন মাস হল সে এসেছে ।

—ঠাণ্ডার মধ্যে মানুষকে খালি গা করার তোমাদের কোনো অধিকাব নেই । ফৌজদারি আইনের ন' নম্বর ধারায় কী লেখা আছে, জানো না তোমরা ?

অধিকার তাদের আছে এবং আইন তাদের জানা আছে । একা তোমারই, ব্রাদার, আক্কেল হয়নি এখনও ।

বুইনভস্কি আবার বলল,—তোমরা সোভিয়েট দেশের মানুষ নও ! তোমবা কমিউনিস্ট নও !

ন' নম্বর ধারা নিয়ে বলাতেও ভলকোভোই গায়ে মাখেনি, কিন্তু শেষের খোঁটাটা তার সহ্য হল না । রাগে ফেটে পড়ে বলে উঠল,—দশ দিনের সেল-হাজত !

জমাদারকে পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল,—আজই সন্ধে থেকে ।

সকালবেলায় লোককে সেলে আটক করাটা ওরা ঠিক পছন্দ করে না । তাতে খামোখা কাজের ঘণ্টাগুলো নষ্ট হয় । কাজেই দিনের বেলাটা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটুক, তারপর সন্ধেবেলায় সেলে যাক ।

যে মাঠে কয়েদীবা ফাইলে দাঁড়ায়, তার ঠিক পরেই ক্যাম্পের হাজত—কয়েদীদের সাজা পাওয়ার জায়গা । দু-সার পাকা দালান । এবার শীতের আগে দ্বিতীয় সারিটা নতুন তৈরি হয়েছে । প্রথমটাতে জায়গার টান পড়ছিল । এই হাজতটাতে আঠারোটা সেল আছে ; এই সেলগুলোকে আবার ভাগ ভাগ করে ছোট ছোট নির্জন কুঠুরিতে একেকজন করে রাখার ব্যবস্থা । গোটা বন্দীশিবিরটা কাঠ দিয়ে তৈরি ; হাজতটাই শুধু কংক্রিটের তৈরি ।

শুখভের শার্টের তলায় কন্‌কনে ঠাণ্ডা একবার সেই যে ঢুকে পড়েছে, কিছুতেই

তাকে আর তাড়ানো যাচ্ছে না । কয়েদীরা অনর্থক নিজেদের গায়ে জামাকাপড় জড়িয়েছে । শুখভের পিঠ আবার টনটন্ করতে শুরু করল । ইস, এক্ষুণি এই মুহূর্তে হাসপাতালের বিছানায় লম্বা হতে পারলে কী ভালই না লাগত—যদি ঘুমের কোলে ঢলে পড়তে পারত । এর বেশী আর কিছু সে চায় না । কম্বল যত ভারী হয় ততই তার ভাল ।

গেটগুলোর সামনে কয়েদীরা দাঁড়িয়ে জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াচ্ছে । তাদের দল বেঁধে নিয়ে যাবার জন্যে গেটের বাইরে সেপাইরা অপেক্ষা করছে ।

—দাঁড়িও না, পা চালাও ! দাঁড়িও না, পা চালাও !

কাজ বরাদ্দ করার অফিসারটি পেছন থেকে কয়েদীদের ঠেলতে ঠেলতে বলছে, — দাঁড়িও না, পা চালাও ! দাঁডিও না, পা চালাও !

পয়লা গেট । ক্যাম্পের সীমাসরহদ্দ । দোসরা গেট । গুমটি ঘরেব ঠিক পরেই দুদিকে লোহার রেলিং দেওয়া ।

পাহারাদার সেপাই হঠাৎ হেঁকে উঠল,—থামো সব ! লোকগুলো যেন ভেড়ার পাল। পাঁচজন পাঁচজন করে আলাদা হয়ে দাঁড়াও ।

ক্রমশ আলো ফুটছে । গুমটির ওধারে সেপাইদের পাতা-জ্বালানো আগুন পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে । ফাইলে দাঁড়ানোর আগে বরাবরই কয়েদীরা আগুন পুইয়ে নিয়ে শরীরটাকে গরম করে নেয়—সে আগুনের আলোয় লোক গুনতি করতেও সুবিধে হয় ।

গেটের একজন সেপাই চিল-চিৎকার করে গুনতে লাগল,—এক ! দুই ! তিন !

পাঁচজন পাঁচজন করে আলাদা হয়ে গিয়ে সার বেঁধে দাঁডিয়ে পডতে লাগল—যাতে সামনে থেকে আর পেছন থেকে স্পষ্ট দেখা যায় পাঁচটা মুণ্ডু, পাঁচটা পিঠ, দশটা ঠ্যাং।

আরেকজন গেটের সেপাই আবেকদিকের রেলিঙে ভর দিয়ে নিঃশব্দে গুনে যেতে লাগল । তার একমাত্র কাজ গুনতিতে কোনো ভুল হচ্ছে কিনা দেখা । তাছাড়া একজন লেফটেনান্টও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে ।

ও এসেছে ক্যাম্প থেকে ।

পাহারা দেওয়া যাদের কাজ, তাদের কাছে মানুষ সোনার চেয়েও দামী । কাঁটাতাবের বেড়াব ওপারে একজন লোকও যদি খোয়া যায়, যারা পাহারা দেয় তাদেব একজনকে দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা হবে ।

ব্রিগেডের লোকজনরা আবার সব এক জায়গায় হল । যে সার্জেণ্ট কয়েদীদের কাজে নিয়ে যাবে, সে এবার গুনতে শুরু করল,—এক ! দুই ! তিন !

আবার ব্রিগেডের লোকজনেরা পাঁচজন পাঁচজন করে ভাগ হয়ে গিয়ে আলাদা আলাদাভাবে লাইনবন্দী হয়ে এগোতে লাগল ।

কনভয় গার্ডের সহকারী কর্তা ওধারে দাঁড়িয়ে গোনা ঠিক হচ্ছে কিনা পরখ করতে লাগল ।

আবার একজন সার্জেন্ট ।

এ হল কয়েদীদের কাজে নিয়ে যাবার দলের লোক ।

পাহারা যারা দেবে তাদের ভুল করার উপায় নেই । ভুল করে যদি একটিও বাড়তি মাথা গুনতি করে বসে, তাহলে তাদেরই মাথা থাকবে না ।

চারদিকে গিজ গিজ করছে কনভয় গার্ড । তারা অর্ধচন্দ্রাকার হয়ে কয়েদীদের বেড় দিয়ে রয়েছে । হাতে হাতে সাব-মেশিনগান কয়েদীদের নাক-বরাবর উঁচিয়ে ধরা । ছাই-রঙের সব কুকুব নিয়ে পাহাবাওয়ালা সেপাইরা দাঁড়িয়ে । একটা কুকুর এমনভাবে দাঁত বার করে আছে যে, মনে হয় কয়েদীদের দেখে হাসছে । কনভয় গার্ডদেব মধ্যে ছ' জন ছাড়া আর সকলের গায়েই ভেড়ার চামড়ার খাটো জামা ; শুধু ছ' জনের গায়ে পুরো মাপের ওভারকোট । দিনের বেলায় লম্বা ঝুলের ওভাবকোট শুধু তাদেরই দেওয়া হয় যাদের ওয়াচ-টাওয়ারে উঠে পাহারা দিতে হয় ।

এবপর আবাব ব্রিগেডগুলো একাকার হয়ে গেলে কনভয় গার্ডেরা গোটা বিজলী স্টেশনের দলটাকে পাঁচজন পাঁচজন কবে গুনে নিল ।

বুইনভস্কি কার্যকাবণ ব্যাখ্যা করে বলল,—ভোরেব দিকেই সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে ; তাব কারণ, রাত্তিরের তাপ কমতে কমতে ঐ সময় একদম নিম্নতম মাত্রায় এসে ঠেকে ।

বুইনভস্কি সবকিছুবই ব্যাখ্যা দিতে ভালবাসে । কোন বছরে কোন দিন কোন তিথি, শুক্লপক্ষ না কৃষ্ণপক্ষ—বুইনভস্কিকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে ।

সবাই চোখের ওপব দেখতে পাচ্ছে বুইনভস্কি নিজেই দিনকে দিন কিবকম শুকিয়ে যাচ্ছে । গালদুটো ভেঙে গেছে, কিন্তু তার মন একটুও ভাঙেনি ।

বাইরে খোলা জাযগায় হাড কাঁপিয়ে দিচ্ছে ঠাণ্ডা হাওয়া । শুখভ যে শুখভ, সবই যার গা-সওয়া—তাবও মনে হল ঠাণ্ডায় নাক মুখ জমে গিয়েছে । কাজের জায়গায় যাবার সময় সারা পথ দাঁতে হাওয়া লাগবে—এটা বুঝতে পেরে শুখভ মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে নেবে ঠিক করল ; এই ধরনের হাওয়াব হাত থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে দুদিকে লম্বা ফিতে দেওয়া ন্যাকড়া শুখভ সবসময় নিজের কাছে রাখত । কয়েদীদের অনেকের কাছেই এইরকমের ন্যাকড়া থাকত ; এ জিনিসটাকে তারা খুবই কাজেব বলে মনে করত । চোখের নীচে পর্যন্ত ন্যাকড়ায় মুখ ঢেকে কানের তলা দিয়ে ফিতেদুটো টেনে নিয়ে গিয়ে পেছনদিকে গিঁট দিয়ে বেঁধে দিল । তারপর টুপির পেছনটা দিয়ে ঘাড়ের কাছটা ঢেকে দিয়ে ওভারকোটের কলারটা তুলে দিল । তারপর টুপির সামনের অংশটা কপালের ওপর নামিয়ে নিল । এবার আর চোখদুটোতে ছাড়া মুখের আর কোথাও হাওয়া লাগার জো রইল না । একটুকরো দড়ি দিয়ে শুখভ কোমরের কাছে ওভারকোটটা কষে বেঁধে নিল । এতে করে পুরোটাই বেশ আঁটোসাটো আর গরম থাকল । হাতমোজাদুটো পাতলা হওয়ায় শুখভের হাতদুটো ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডায় সিঁটিয়ে এসেছিল । শুখভ তার হাতদুটো জোড়া করে ঘষতে লাগল, তালি দিতে লাগল—কেননা এরপব সারাটা রাস্তাই

তো হাতদুটো পেছনে জোড়া করে হেঁটে যেতে হবে ।

গার্ডদের কর্তার রোজকার সেই 'কথামৃত' শুনে শুনে কয়েদীদের কান পচে গিয়েছিল,—শোনো সব, কয়েদীদের বলছি ! যখন যে অর্ডার দেওয়া হবে, প্রত্যেকে মেনে চলবে । লাইন যেন কেউ না ভাঙে ; ছুটবে না কেউ ; যে পাঁচজনের মধ্যে যার জায়গা সেইখানেই সে থাকবে, কেউ জায়গা বদল করবে না । কেউ যেন মুখ না খোলে ; ডাইনে বাঁয়ে না তাকায় ; হাতদুটো পেছনদিকে ধরা থাকবে । ডাইনে বাঁয়ে কেউ এক পা এগিয়ে গেলেই ধরে নেওয়া হবে সে পালাবার চেষ্টা করছে–কনভয় গার্ড বিনা বাক্যব্যয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করবে । আচ্ছা, আগে যে আছ—চলতে শুরু করো ।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের দুজন গার্ড রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করে দিল । কয়েদীদের দলটা সামনের দিকে হুড়মুড় করে এগিয়ে গেল । ডাইনে বাঁয়ে বিশ হাত জায়গা ছেড়ে সামনে পেছনে দশ হাত দূরে দূরে থেকে সাব-মেশিনগান উঁচিয়ে পাহারাদার সেপাইয়ের দল মার্চ করে চলল ।

একটা সপ্তাহ তুষারপাত হয়নি । রাস্তাটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে আকাট পিছল হয়ে আছে । ক্যাম্প পেরোতেই তেরছা হয়ে ওদের মুখের ওপর হাওয়া এসে বাড়ি মারতে লাগল । হাতগুলো পেছনদিকে জোড়া করা, মাথাগুলো নোয়ানো—কয়েদীদের দলটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন মৃতদেহ সৎকার করতে নিয়ে যাচ্ছে । চলতে চলতে সামনের দু'তিন জন লোকের শুধু পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছে, শুধু পায়ের পাতা—আর সেইসঙ্গে এক-খণ্ড পদদলিত মাটি, যার ওপর তোমার নিজের পাদুটো এসে পড়েছে । থেকে থেকে কোনো পাহারাদার সেপাইয়ের হাঁক শোনা যাচ্ছে,—উ-৪৭ ! হাতদুটো পেছনে করো ! ব-৫০২ ! এগিয়ে যাও ! ক্রমে ক্রমে এসব হাঁকডাক কমে আসতে লাগল । হাওয়া ওদের মুখে কেটে কেটে বসছে, ভাল করে চোখ চেয়ে ছাই দেখতেও পাচ্ছে না । ন্যাকড়া দিয়ে মুখ ঢাকা ওদের বারণ । ওদের চাকরিটাও বড় বেশী সুখের নয় !

ঠাণ্ডার দিন না হলে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই কথাবার্তা বলে—তা সে গার্ডের দল যতই চেঁচামেচি করুক । কিন্তু আজ সবাই শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে । প্রত্যেকেই তার সামনের লোকটার পেছনে নিজেকে আড়াল করে রেখে গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে আছে ।

বন্দীদের চিন্তাগুলোও স্বাধীন নয় । শুখভের ভাবনাগুলো কেবল একই জিনিস নিয়ে জাবর কাটছে । তোশকের ভেতর থেকে রুটির টুকরোটা ওরা খুঁজে বার করবে না তো ? হাসপাতাল থেকে সন্ধেবেলায় ওর ছুটির বন্দোবস্তটা হবে তো ? বুইনভস্কিকে শেষ পর্যন্ত সেলে সত্যিই আটক হতে হবে নাকি ? ৎসেজার কোত্থেকে অমন গরম আণ্ডারওয়্যার জোটাল ? ও নিশ্চয় ভাণ্ডারীদের কাউকে ঘুষ দিয়ে নিজের জিনিসটা বাগিয়েছে । নইলে পেল কোত্থেকে ?

বরাদ্দ রুটিটুকু ছাড়াই আজ সকালের খাবারটা খেতে হওয়ায়—তার ওপর খাবারটা

ছিল জুড়নো—আজ তার মনেই হচ্ছে না সে খেয়েছে। পেটের মধ্যে যাতে ক্ষিধেয় মোচড় দিয়ে না ওঠে, যাতে খাই-খাই ভাব পেয়ে না বসে, তার জন্যে ক্যাম্পের বিষয়ে ভাবনা বন্ধ করে শুখভ বাড়িতে কী চিঠি লিখবে তাই নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিল।

যেতে যেতে পাশেই পড়ল কয়েদীদের তৈরি সেই জায়গাটা যেখানে কাঠের কাজ হয় ; আরও খানিকটা গিয়ে কয়েদীদের তৈরি মাঠকোঠা, যেখানে জেলের কয়েদী নয় এমন মজুররা থাকে ; আরেকটু এগিয়ে কয়েদীদের তৈরি নতুন ক্লাবঘর—যে-সব মজুর জেলের কয়েদী নয় একমাত্র তারাই সেখানে সিনেমা দেখে। লোকালয় ছাড়িয়ে লোকগুলো যখন খোলা মাঠে এসে পড়ল, তখন তাদের সপাটে হাওয়ার মুখোমুখি হতে হল। সামনে সূর্যোদয়ের লাল আভা আকাশে ছড়ানো। দিগন্তের উত্তরে দক্ষিণে দিগম্বর হয়ে রয়েছে শ্বেতশুভ্র তুষার। যতদূর দৃষ্টি যায়, ধূ ধূ করছে মাঠ—কোথাও কোনো গাছ নেই।

নতুন বছর আরম্ভ হয়েছে। ১৯৫১ সাল। বারোমাসের মধ্যে যখনই হোক দুটো চিঠি লিখতে পারবে, দুটো চিঠি পেতে পারবে শুখভ। বাড়িতে শেষ চিঠি সে লিখেছে জুলাই মাসে ; সে চিঠির উত্তর পেয়েছে শুখভ অক্টোবরে। উসৎ-ইঝমায় ছিল অন্যরকম ব্যবস্থা—ইচ্ছে করলে সেখানে মাসে একটা করে লেখা যেত। কিন্তু অত লেখবার আছেই বা কী ? সেখানে থাকতে শুখভ মোটেই বাড়িতে এর চেয়ে ঘন ঘন চিঠি লিখত না।

শুখভ বাড়ি ছেড়ে এসেছে ১৯৪১ সালের ২৩শে জুন। তার আগেরদিন ছিল রবিবার। পোলোম্‌নিয়ার গির্জায় সেদিন এক জমায়েত ছিল ; জমায়েতে এসে লোকে বলল যুদ্ধ বেধেছে। খবরটা পোলোম্‌নিয়ার ডাকঘরের লোকেরা শুনেছিল ; তেমগেনিয়েভোতে কিন্তু যুদ্ধের আগে কারো বাড়িতে রেডিও ছিল না। শুখভের বউ লিখেছে এখন সব বাড়িতেই রেডিওর হৈ-হট্টগোল—রেডিও বলতে তার-খাটানো লাউডস্পীকার।

আজকাল চিঠি লেখা তো নয়, যেন অথৈ দীঘিতে নুড়ি ছুঁড়ে মারা। টুপ করে পড়ল আর ভুস করে বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল। ব্রিগেডের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে, ফোরম্যান আন্দ্রেই প্রোকোফিয়েভিচ তিউরিনকে কেমন লাগে না লাগে এসব নিয়ে কিছু লিখতেই ইচ্ছে করে না। বাড়ির লোকজনদের চেয়ে এখন বরং ঐ লাৎভিয়ান কিলগাসের সঙ্গে শুখভ ঢের বেশী মনের মিল খুঁজে পায়।

বাড়ির লোকেরাও তাই—বছরে দুটো করে চিঠি পাঠাতে পারে। কিন্তু ওরা কিভাবে আছে না আছে চিঠি পড়ে কিচ্ছু বোঝবার জো নেই। শুখভের বউ লিখেছে, ওখানকার যৌথ-খামারের নতুন একজন সভাপতি হয়েছে। নতুন লোক তো ফি বছরই হয়। যৌথ-খামার নাকি ঢেলে বড় করা হয়েছে—আরে ভাই, বড় তো আগেও করা হয়েছিল, পরে আবার ছোট করে ফেলা হয়। হুঁ, আর যারা যৌথ-খামারে তাদের বরাদ্দ কাজ পুরো করতে পারেনি, তাদের খোদ চাষের জমি কমিয়ে দেড় বিঘেরও কম করা হয়েছে —কেউ কেউ তো বলতে গেলে কিছুই পায়নি।

শুখভের বউ যৌথ-খামারের ব্যাপারে কী যে ছাই লিখেছে শুখভ মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি। শুখভের বউ লিখেছে যুদ্ধের পর যৌথ-খামারে নতুন লোক একজনও আসেনি। ছেলেছোকরার দল এবং অন্য যারাই পারে তারাই দলে দলে শহরে গিয়ে কারখানায় ঢুকে পড়ছে কিংবা ঘাসের চাপড়া দিয়ে জ্বালানী তৈরির কাজে চলে যাচ্ছে। যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অর্ধেক লোক আর ফিরে আসেনি। যারা ফিরে এসেছিল তারা আর যৌথ-খামারের দিকে ফিরে তাকায়নি। বাড়িতেই তারা থাকে কিন্তু কাজ করে অন্য। যৌথ-খামারে থেকে গিয়েছিল শুধু ফোরম্যান জাখার ভাসিলিচ আর চুরাশী বছরের বুড়ো ছুতোরমিস্ত্রি তিখন। তিখনের বিয়ে খুব বেশীদিন আগে হয়নি—ছেলেপুলেও হয়েছে। যৌথ-খামারের পত্তন হয় এখানে ১৯৩০ সালে—তখনও যে মেয়েরা ছিল এখনও তারাই এটাকে চালিয়ে যাচ্ছে।

শুখভের মাথায় কিছুতেই ঢোকে না 'বাড়িতেই তারা থাকে কিন্তু কাজ করে অন্য' এ কী করে হয়? চাষীরা এক সময়ে যে যার নিজের জমিতে লাঙল দিত, পরে তারা যৌথ-খামারে যোগ দিল—দুটো যুগই শুখভ দেখেছে। কিন্তু শুখভ বুঝতেই পারে না—চাষীরা নিজেদের গ্রামে কাজ করবে না, এ কেমন করে হয়? এ জিনিস কিছুতেই সে বরদাস্ত করতে পারে না। তাহলে কি ওরা বাইরে যায় মরশুমী ধরনের কাজকর্ম করতে? খড় কাটবার সময় গ্রামের তাহলে কী হাল হয়?

শুখভের বউ লিখেছে, বাড়িঘর ছেড়ে বাইরে মরশুমী কাজ করতে যাওয়া—সে-সব পাট অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। এক সময়ে এদিককার কাঠের কারিগরদের বেশ নামডাক ছিল, কিন্তু এখন আর ছুতোরমিস্ত্রিরা কোনো কাজকর্ম পায় না ; চাহিদা নেই বলে ঝুড়ি বোনার কাজও এখন আর হয় না। সে জায়গায় লোকে এক মজাদার ব্যবসা ফেঁদে বসেছে—গালচে রং করার ব্যবসা। প্রথমে যুদ্ধফেরত একজন লোক টিন কেটে তার ওপর রং বুলিয়ে নক্সা করার ব্যাপারটা শিখে এসে এখানে চালু করে। তারপর থেকে ক্রমেই বেশী বেশী লোক এই কাজে ভিড় করতে থাকে। এরা কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিল না, কোনো একটা জায়গায় থেকে কাজ করত না। খড় কাটা বা ফসল কাটার সময় মাসখানেক থেকে যৌথ-খামারের কাজে সাহায্য করত—তারপর যৌথ-খামার থেকে এই মর্মে একটা ছাড়পত্র জুটিয়ে নিত যে : এই যৌথ-খামারের সদস্য অমুকচন্দ্র অমুককে এতদ্বারা ব্যক্তিগত কার্যব্যপদেশে স্থানত্যাগের অনুমতি দেওয়া হল এবং উপরোক্ত ব্যক্তির কাছে যৌথ-খামারের কোনো বাকিবকেয়া পাওনা নেই। এই ছাড়পত্রটি পেয়ে গেলে এরা সারা দেশ চক্কর দিতে পারে। সময় সংক্ষেপ করার জন্যে এরা এমন কি প্লেনে চড়েও ঘোরাঘুরি করে ; এদের পকেটে থাকে হাজার হাজার টাকা। গালচে রং করার জন্যে হেন জায়গা নেই যেখানে তারা যায় না। বাড়িতে পুরনো চাদর বা কম্বল থাকলে পঞ্চাশ রুবলে এরা গালচের মত করে রং করে দেয়। সময়ও লাগে খুব কম—ঘণ্টাখানেকের মত। ইভানের বউয়ের খুব ইচ্ছে ইভানও বাড়ি ফিরে এসে রং করার কাজ নেয়। এখন ইভানের বউকে যেভাবে কষ্টেসৃষ্টে দিন চালাতে হচ্ছে,

ইভান রং করার কাজ নিলে আব তাদের সে অভাব থাকবে না ; তখন তারা ছেলেমেয়েদের টেকনিক্যাল স্কুলে পড়াতে পারবে ; ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরের বদলে তখন তারা নতুন একটা দালান তুলতে পারবে । যারা গালচে রং করার কাজ করে, তারা সবাই নতুন নতুন বাড়ি করছে । রেল-রাস্তার কাছেপিঠে বাড়ি করতে গেলে এখন আর আগের মত পাঁচ হাজার রুবলে হয় না—এখন লাগে পঁচিশ হাজার রুবল ।

শুখভ তার উত্তরে বউকে লিখেছিল : জীবনে কখনও ছবি এঁকেছে বলে তার মনে পড়ে না । সেক্ষেত্রে কী করে সে রং-তুলির কাজ করবে ? আর কী ধরনেরই বা আজব গালচে ওসব—গালচেগুলোতে থাকে কী ? শুখভের বউ তার উত্তরে লিখেছিল : নেহাৎ মাথায় গোবর পোবা না থাকলে যে-কেউ ও ছবি আঁকতে পারে, স্টেনসিল ফেলে ফাঁকগুলো দেখে দেখে দমাদ্দম তুলি বুলিযে যাও । রকম রকম নক্সা আছে । গালচের একটা ধরন আছে, তার নাম 'ত্রোইকা'—এক হুসার অফিসার রাজকীয় চালে তিন ঘোড়ায় টানা চমৎকাব একটা গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে । দ্বিতীয় ধবনটার নাম 'বল্লাহরিণ' আব তৃতীয়টা হল পাবস্যের গালচেব নকল । ডিজাইন বলতে এই ক'টাই । কিন্তু দেশের যেখানেই যাও লোকে এই পেলেই খুশী হয়ে তোমাকে ধন্যবাদ দেবে । বলতে কি, তোমাব হাত থেকে ছোঁ মেবে নেবে । তার কারণ, প্রকৃত গালচের দাম যেখানে কয়েক হাজার রুবল, সেখানে তাবা এ জিনিস পাচ্ছে মোটে পঞ্চাশ রুবলে।

শুখভের খুব ইচ্ছে করে এইবকমের একটা গালচে নিজেব চোখে দেখতে ।

বছরের পর বছব বন্দীশিবির আব জেলখানায় থেকে থেকে ইভান দেনিসোভিচের কালকে কী হবে, একবছর পবে কী হতে পাবে এবং সংসাবেব লোকজনদের গ্রাসাচ্ছাদনের কী ব্যবস্থা কববে—এসব বিষযে ভাবনাচিন্তা করবার অভ্যেসটাই চলে গেছে । তাকে কিছুই ভাবতে হয না, ক্যাম্প যারা চালায় তারাই এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে থাকে ; এক হিসেবে তাতে ব্যাপারটা অনেক সহজ হযেছে । তাছাড়া এখনও পুরো দু বছর তাকে মেয়াদ খাটতে হবে । কিন্তু ঐ গালচের ব্যাপাবটা তাকে সত্যিই বেশ ভাবিয়ে তুলেছে ।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এরকম একটা ব্যবসায় টাকা বোজগার করাটা কিছুই নয় । পাডাপড়শীরা সবাই যখন একাজে নেমে পড়েছে । তখন কেনই বা শুখভ তাদের পেছনে পড়ে থাকবে । বরং তাতে তার আঁতে ঘা লাগবে । ...হাজার হলেও, আসলে কিন্তু শুখভ গালচের ব্যাপারটাতে জড়িয়ে পড়তে চায় না । ও জিনিস করতে হলে, বোলচাল আর হামবড়া ভাব থাকা দরকাব । কাউকে না কাউকে তেল দিতে হবে । শুখভ এই পৃথিবীর মাটিতে পা দিয়ে আছে চল্লিশ বছর । অর্ধেক দাঁত তার এর মধ্যেই পড়ে গেছে । মাথায় টাক গজিয়েছে । কিন্তু আজও কাউকে সে ঘুষ দেয়ও নি, ঘুষ নেয়ও নি । এমন কি ক্যাম্পজীবনেও ও-ব্যাপারটাতে তার কখনও হাতেখড়ি হয়নি ।

যে টাকা সহজে আসে, সে টাকার কোনো ওজন নেই—মনেই হবে না ওটা তোমার রোজগারের টাকা । সেকেলে বুড়োরা বেশ একটা ভাল কথা বলত ; বলত—যদি না

পুরো দামে কেনো, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুবে না জেনো । শুখভের এখনও খাটবাব ক্ষমতা আছে, নানারকম কাজও তার জানা আছে । ছাড়া পাওয়ার পর চুল্লী বানাবার কাজ, ছুতোরমিস্ত্রির কাজ, টিনের জিনিস তৈরির কাজ সে কি আর একটা জুটিযে নিতে পাববে না ?

তবে এমন হতে পারে যে, জেলে ছিল বলে তাকে কেউ কাজে নেবে না । গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তাকে উঠতে না দিতে পাবে । তখন ঐ গালচের কারবারে সে কোমব বেঁধে নেমে পডতে পারবে ।

কয়েদীর দল ততক্ষণে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে ; বিজলী স্টেশনের বাইবের দিকে গুমটি ঘরের সামনে তারা দাঁড়িয়ে রইল । তারও আগে কোণেব দিক থেকে ভেড়াব চামডার ঢোল্লা ওভারকোট-পরা দুজন কনভয় গার্ড আড়াআড়িভাবে মাঠটা পেরিযে দূবের ওয়াচ-টাওয়ারের দিকে রওনা হল । প্রত্যেকটি ওয়াচ-টাওয়াবে পাহাবা দেবাব লোক গিয়ে না পৌঁছুনো পর্যন্ত কয়েদীদের তারা ভেতরে ঢুকতে দেবে না । কনভয গার্ডদের কর্তা কাঁধে সাব-মেশিনগান ঝুলিয়ে ফাঁড়ির ভেতর ঢুকে গেল । ফাঁড়িব চিমনি থেকে গলগলিয়ে ধোঁয়া বেবোতে লাগল । ফাঁড়িটাতে ওরা সারা রাত একজন বেসামবিক চৌকিদার রেখে পাহারা দেওযায়—যাতে সিমেণ্ট আর তক্তা চুরি যেতে না পাবে ।

কাঁটাতারের গেটটা পেবিয়ে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, তাব ওপাশে অনেক দূবে কাঁটাতারের বেড়া—তাব পেছনে কুয়াশা ভেঙে প্রকাণ্ড লাল সূর্য উঠছে । শুখভের ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আলিওশা মহানন্দে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে—ঠোঁটের কোণে তাব স্মিত হাসি । গালদুটো ভেঙে গেছে, যেটুকু বরাদ্দ পায় সেইটুকুই খায়, বাড়তি এক আধলাও রোজগার করে না—ওব কিসের অত আনন্দ ? রবিবাবে, অন্য সব পাদ্রীদেব জুটিয়ে নিয়ে বিড় বিড় ফিস ফিস করে । হাঁসের গায়ে যেমন জল বসতে পারে না, ওরাও তেমনি গা থেকে ক্যাম্পের এই জীবনটাকে ঝেড়ে ফেলে দেয় ।

শুখভের মুখেব ঢাকাটা তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে । তাতে জায়গায় জায়গায় জমে গিয়ে বরফের একটা আস্তরণ পড়েছে । শুখভ তার মুখ থেকে সরিয়ে ন্যাকড়াটা গলার কাছে নামিয়ে দিয়ে হাওয়ার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল । ঠাণ্ডাটা তার জামাকাপড়ের তলায় তেমন যেতে পারেনি, কিন্তু পাতলা হাতমোজার ভেতবে তার হাতদুটো জমে গিয়েছিল—বাঁ পায়ের আঙুলগুলোরও সেই অবস্থা । কোনো সাড় নেই । তাব বাঁ পায়েব ফেল্টের জুতোটা একদম ক্ষয়ে এসেছে । এর মধ্যেই দুবার সেলাই কবে নিতে হয়েছে । শুখভের মাজা থেকে ঘাড় পর্যন্ত পিঠটা টনটন করছে । এই ব্যথা নিয়ে কী করে সে কাজ করবে ?

এদিক ওদিক তাকিয়ে শুখভ তাব ব্রিগেডের ফোরম্যান তিউরিনকে দেখতে পেল । শেষের পাঁচজনের মধ্যে তিউরিন দাঁড়িয়ে । লোকটার কাঁধ চ্যাটালো, মুখটা চওড়া । সবসময় মুখ গোমড়া করে থাকে । দলের লোকেরা তার সামনে কোনোরকম হাসিমস্করা করতে পারে না ; কিন্তু তারা যাতে ভাল খেতে পায় সেটা সে দেখে । লোকগুলোর

রুটির বরাদ্দ কিভাবে বাড়ানো যায়, এই নিয়ে এখন সে খুব ভাবছে। এইবার নিয়ে তিউরিনের দুবার মেয়াদ খাটা হচ্ছে। ও হল যাকে বলে সত্যিকার 'গুলাগ'-সন্তান। 'গুলাগ' হল সারা দেশের বন্দীনিবাসগুলো পরিচালনা করার সরকারী প্রতিষ্ঠান। ক্যাম্পের জীবন এবং রীতিনীতিগুলো আদ্যোপান্ত তার জানা আছে।

ক্যাম্পের কয়েদীদের কাছে দলের নেতাই হল সব। নেতা যদি ভাল হয়, তোমাকে সে দ্বিতীয় জীবন দেবে। নেতা খারাপ হলে কাঠের পোশাকে তোমার সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে সে মাটির তলায় পাঠিয়ে দেবে। আন্দ্রেই প্রোকোফিয়েভিচ তিউরিন। আন্দ্রেই উসৎ-ইঝমাতে থাকার সময় থেকেই শুখভকে চিনত। সেখানকার বারোয়ারী ক্যাম্পেই তাদের প্রথম দেখা হয়। কিন্তু ইভান তখন আন্দ্রেইয়ের ব্রিগেডে ছিল না। প্রতিবিপ্লবী অপরাধ ও কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলে আইনের ৫৮তম ধারা প্রয়োগ করা হয়—এই ধারায় যাদের সাজা হয়েছিল, তাদের সবাইকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে উস্‌ৎ-ইঝমা থেকে কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডের জায়গা এই বন্দীনিবাসে নিয়ে আসা হল। তিউরিন এই বন্দীনিবাসে এসে শুখভকে নিজের দলে জুটিয়ে নিল। ক্যাম্পের কর্তা, পরিকল্পনা আর উৎপাদন বিভাগ, কাজের জায়গার ওপরওয়ালা, ইঞ্জিনিয়ার—এদের কারো সঙ্গে শুখভের কোনো সংস্রব নেই। তার হয়ে তার দলের নেতাই ওদের সামনে লোহার মত শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। তার প্রতিদানে তিউরিন যদি একটু ভুরু কুঁচকে তাকায়, আঙুলের ইশারা করে—অমনি শুখভকে সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজ তুলে পালাতে হবে, যা সে চাইবে তাই করতে হবে। ক্যাম্পে আর যার চোখেই তুমি ধুলো দাও না কেন, আন্দ্রেই প্রোকোফিয়েভিচকে কিন্তু কক্ষনো ঠকিও না। এটাই হল এখানে বাঁচবার রাস্তা।

ফোরম্যান তিউরিনকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিল শুখভ—আগের দিন যেখানে তারা কাজ করেছিল সেখানেই আজ কাজ হবে, না অন্য কোথাও হবে? কিন্তু তিউরিনকে গম্ভীর মুখে ভাবতে দেখে তার চিন্তায় বাধা দিতে শুখভের দ্বিধা হল। বেচারা এইমাত্র সেই 'সমাজতান্ত্রিক জীবনায়নে'র ব্যাপারটা চুকিয়ে এসেছে এবং এখন সে 'কোটা ছাপিয়ে যাওয়া'র সমস্যাটা নিয়ে ভাবছে। তার মানে, পুরো ব্রিগেডের পরের পাঁচ দিনের খোরাক।

তিউরিনের মুখময় গোটা গোটা বসন্তের দাগ। যেদিক থেকে হাওয়ার ঝাপ্টা আসছে সেইদিকেই সে সটান মুখ ফিরিয়ে আছে। মুখ একটুও কুঁচকে নেই। তার মুখের চামড়া ওক গাছের বাকলের মত টান-টান।

কয়েদীরা আগাগোড়া দাঁড়িয়ে হাতে হাত ঘষছে, মাটিতে পা ঠুকছে। জঘন্য ইতর হাওয়া। দেখে তো মালুম হচ্ছে ছ'টা ওয়াচ-টাওয়ারের সব ক'টাতেই পাহারাদার চিড়িয়ারা খাড়া হয়ে গেছে। তবু ওরা কয়েদীদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আরও একটু হুঁসিয়ার হয়ে নিয়ে তবে ওরা ছাড়ছে।

বেশ খানিকক্ষণ পর গুমটিঘর থেকে কনভয় গার্ডের কর্তা আর চেকিং অফিসার বেরিয়ে এসে গেটে দাঁড়াল। তারপর গেট খোলা হল।

—পাঁচ জন পাঁচ জন ! এক্ ! দুই !

কয়েদীরা তালে তালে পা ফেলছে যেন কুচকাওয়াজ করতে করতে চলেছে। একবার গেটের ভেতর ঢুকে পড়তে পারলে হয় ! সেখানে কেউ ওদের কাজের ওপর ওস্তাদি ফলাতে আসবে না।

গুমটি ঘরের ঠিক পেছনেই অফিসবাড়ি। তার কাছেই দাঁড়িয়ে কর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক সমস্ত ব্রিগেডের ফোরম্যানদের ডাকছিল। ফোরম্যানরা সব হন্তদন্ত হয়ে ছুটল। দেরও সেইদিকে যাচ্ছিল। নিজে কয়েদী হলেও, দের পেয়েছিল অধস্তন তত্ত্বাবধায়কের পদ। লোকটা পয়লা নম্বরের হারামী ; কযেদী ভাইদের সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করত যেন তারা কুকুর-বেড়ালেরও অধম।

আটটা তখন বেজে গেছে। আটটা বেজে পাঁচ। একটু আগে জেনারেটর ট্রেনে আটটার বাঁশী বেজেছে। অফিসাররা ভয় পাচ্ছিল কয়েদীরা এই বুঝি বাজে সময় নষ্ট করে ফেলে, গা গরম করে নেবার জন্যে এখানে সেখানে ছিটিয়ে যায়। কিন্তু সামনে তো সারাটা দিন তাদের পড়েই আছে। তারা সবকিছুরই ঢের সময় পাবে। গেট পেরিয়ে যারাই ভেতরে ঢুকছে, নীচু হয়ে হয়ে এখান থেকে একটা ওখান থেকে একটা কাঠি কুড়িয়ে নিচ্ছে। আগুন জ্বালাবে। জামাকাপড়ের লুকানো ফাঁকেফোঁকড়ে কাঠিগুলো চালান করে দিচ্ছে।

তিউবিন তার সহকারী পাভলোকে তার সঙ্গে অফিসে যেতে বলল। ৎসেজারও একই দিকে হনহনিয়ে চলেছিল। ৎসেজার শাঁসালো লোক। মাসে দুবার করে পার্সেলে তার নানা জিনিস আসে এবং তা থেকে দরকার মত একে তাকে ভেট দেয। অফিসে তাকে হালকা কাজ দেওয়া হয়েছে ; কয়েদীদেব কাজ যাচাই করে দেখে যে অফিসার, ৎসেজার তার সহকারী।

১০৪ নং ব্রিগেডের বাকি লোকজনেরা সঙ্গে সঙ্গে কাজের জায়গায় চলে গেল —চোখের সামনে থেকে কেটে পড়ো, চোখের সামনে থেকো না।

সামনে যে ময়দানটা খাঁ খাঁ করছে, তার মাথার ওপর কুয়াশায় জড়ানো লাল টুকটুকে সূর্য উঠল। এক জায়গায় ওপারে বরফ জমে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে ঘর-বাড়ির তৈরি কাঠামোর জোঁড়া দেবার অংশগুলো। এক জায়গায় ভিতের ওপর খানিকটা গাঁথনি হয়ে পড়ে আছে। এক জায়গায় ফেলে-দেওয়া একটা মাটি খোঁড়ার যন্ত্র, এক জায়গায় একটা কোদাল, আরেক জায়গায় একগাদা লোহালক্কড় পড়ে রয়েছে। চারিদিকে গর্ত আর গড়খাইয়ের ছড়াছড়ি। মোটর সারানোর কারখানাটা তৈরি হয়ে গেছে, এখন শুধু ওপরটা বাকি। একটা ঢিপিমতন জায়গায় বিজলী স্টেশন তৈরির কাজ চলেছে ; দোতলা হয়ে গিয়েছে, তেতলা হচ্ছে।

সবাই যে যার গা ঢাকা দিয়েছিল। একমাত্র দেখা যাচ্ছিল টঙের ওপর পাহারাদার ছ'জন সেপাইকে—আর অফিস-বাড়ির পাশে ব্যস্তসমস্ত কিছু লোককে। এই হল এখন আমাদের মওকা। কর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক বহুবার এই বলে শাসিয়েছে যে, আগের দিন

রাত্রেই সে ব্রিগেডগুলোর কাজ ভাগ করে রাখবে ; কিন্তু সন্ধে থেকে সকালের মধ্যে সব প্ল্যান ভেস্তে যায় বলে এ পর্যন্ত কোনোদিনই তার পক্ষে আগে থেকে কাজ ভাগ করে রাখা সম্ভব হয়নি ।

সুতরাং এই সময়টা আমাদের দখলে । কর্তার দল যখন কাজ ঠিক করতে ব্যস্ত, যে যেখানে পারো গা ঢাকা দাও । যেখানে একটু গরম পাও, লুকিয়ে পড়ো । বসে পড়ো, বসো । মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট পাওয়ার মানে হয় না । যদি কাছাকাছি আগুনের চুল্লী থাকে, পায়ের পট্টিগুলো খুলে তাতিয়ে নিলে ভাল হয় । তাহলে সারাদিন তোমার পা দুটো গরম থাকবে । হাতের কাছে চুল্লী থাক না থাক, বসা ভাল ।

১০৪নং ব্রিগেডের লোকেরা মোটর মেরামতী কারখানার একটা প্রকাণ্ড হলের ভেতর ঢুকে গেল ; শীতের ঠিক আগে এখানে কাঁচের জানলা বসানো হয়েছে—৩৮নং ব্রিগেড এখন কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজ করছে । কংক্রিটেব কিছু কিছু চাঙড় ফর্মায় আঁটা রয়েছে আর কিছু কিছু রয়েছে দাঁড় করানো অবস্থায় । একদিকে মশলা তৈরির জাল । কাঁচা মেঝে, উঁচু ছাদ । এমনিতে এ বাড়ির ঘর গরম থাকার কথা নয় । কিন্তু তা সত্ত্বেও আগুনের আঁচে ঘরদোর ওরা গরমই রেখেছে । কয়লা খরচ করতে ওদের গায়ে লাগে না । ওরা অবশ্য ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা করেছে লোকজনদের জন্যে নয় —কংক্রিটের চাঙড়গুলো ভালভাবে শুকোবার জন্যে । ঘরে এমন কি একটা থার্মোমিটারও ঝুলিয়েছে । যে রবিবারে কয়েদীরা কাজে না যায়, বাইরের একজন লোককে পাঠানো হয় চুল্লীটাকে জ্বেলে রাখার জন্যে ।

৩৮নং ব্রিগেড অবশ্য অন্য ব্রিগেডের কাউকে চুল্লীর কাছে ঘেঁষতে দিল না । ওটা তারা পুরোপুরি নিজেদের দখলে রেখে দিল । কুছপরোয়া নেই ! আমরা কোণের দিকে বসছি । কোণটা এমন কিছু মন্দ নয় ।

শুখভের ট্রাউজারের পেছনটা তুলোর প্যাড দেওয়া ; সে একটা কাঠের ফর্মার ধার ঘেঁসে থেবড়ে বসে পড়ল—হেন জিনিস নেই যাব ওপর সে ভর দিয়ে বসেনি । দেয়ালটাতে পিঠটা হেলান দিল । দেয়ালে ঠেস দিতেই তার ওভারকোট আর ভেতরের জ্যাকেটে এমনভাবে টান পড়ল যে, বাঁদিকের বুকে হৃদযন্ত্রের ঠিক পাশেই হঠাৎ একটা চাপ অনুভব করল । একটা শক্ত ডেলা গোছের জিনিস—পাঁউরুটির একটা টুকরো, দুপুরে খাবে বলে সকালের যে রেশনটা সে সঙ্গে করে এনেছে । রোজই সে সকালের রেশনের আধখানা বাঁচিয়ে রেখে কাজে আসার সময় সঙ্গে করে আনে—দুপুরের আগে সেটাতে হাত দেয় না। কিন্তু অন্যান্য দিন অর্ধেকটা সে প্রাতরাশের সময় খেয়ে নেয় । আজ তার খাওয়া হয়নি । শুখভ শেষ পর্যন্ত বুঝল রুটিটা এইবেলা খেয়ে ফেলা দরকার —শরীরটা গরম থাকতে থাকতে । এখন খেলে মোটেই সেটা অসময়ে খাওয়া হবে না । দুপুরের খাওয়ার এখনও পাঁচ ঘণ্টা দেরি ! এখনও ঢের বেলা !

পিঠের ব্যথাটা এখন পায়ে এসে ঠেকেছে । পা দুটোতে কোনো জোর নেই । ইস্, একবার যদি সে কোনো একটা চুল্লীর কাছে যেতে পারত ।

শুখভ তার হাতমোজাদুটো হাঁটুর ওপর রাখল ; ওভারকোটের বোতামগুলো খুলে ফেলল ; মুখের ওপর থেকে হিমজমাট ন্যাকড়াটার বাঁধন খুলে বার কয়েক ঝেড়ে নিয়ে পকেটে পুরল । এবার সে সাদা কাপড়ে জড়ানো রুটিটা বার করে কাপড়টা এমনভাবে ধরে থাকল যাতে রুটির গুঁড়োগুলো মাটিতে না পড়ে—তারপর এক-একটা কামড় দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে রুটি খেতে লাগল । দু'ভাঁজ কাপড়ের মধ্যে থাকায় এবং গায়ের গরম পাওয়ায় রুটিটাতে এতটুকু হিম লাগতে পারেনি ।

বন্দীশিবিরে বসে শুখভের প্রায়ই মনে পড়ত গ্রামে থাকার সময়কার খাওয়াদাওয়ার কথা । কড়াইভর্তি আলুভাজা, হাঁড়িভর্তি খিচুড়ি এবং একটা সময় গেছে যখন কব্জি ডুবিয়ে মাংস খাওয়া হত । দুধ খাওয়া হত এত যে, পেট ফেটে যাবাব যোগাড় । শুখভ ক্যাম্পে এসে শিখেছে ওভাবে খাওয়াটা ঠিক নয় । খাওয়া উচিত এমনভাবে যাতে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে খেতে পারো । এই যেমন শুখভ এখন খাচ্ছে । দাঁত দিয়ে কুট করে কেটে জিভ দিয়ে মুখের মধ্যে নেড়ে নেড়ে গলিয়ে নিয়ে গালে ফেলে চুষতে থাকা । জবজবে কালো রুটিটার, আঃ, কী আস্বাদ ! আট বছর গিয়ে ন বছর হতে চলল, শুখভ কী খেয়েছে এতদিন ? কিছুই নয় । কিন্তু কাজ করেছে কত ? ওরেঃ সাবাস ! কম নয় !

অতঃপর শুখভ তার ছটাকী রুটিটা নিয়ে তন্ময় হয়ে গেল । আর তার পাশে বসে রইল গোটা ১০৪নং ব্রিগেড ।

নীচু মতো একখণ্ড কংক্রিটের ওপর বসে একটা সিগারেট হোল্ডারে আধখানা সিগারেট পুরে পালা করে টানছিল দুজন এস্তোনিয়ার লোক—দুজনে এত ভাব যে ভাই বলে মনে হয় । দুজনেরই কটা চুল, লম্বা নাক, ড্যাবাড্যাবা চোখ, হ্যাংলা চেহারা, দুজনেই ঢ্যাঙা । দুজনে সবসময় এমন আঠার মত লেপটে থাকে যে, মনে হয় একজনকে ছাড়া আরেকজন নিশ্বাসই নিতে পারবে না । ফোরম্যান কখনই ওদের আলাদা করে না । ওরা সবসময় এক খাবার দুজনে ভাগ করে খায়, দুজনে একসঙ্গে ওপরের বাঙ্কে শোয় । সার বেঁধে যাবার সময়, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা রাত্তিরে বিছানায় শোবার পর ওরা দুজনে সারাক্ষণ আস্তে আস্তে মিহি গলায় কথা বলে ! ওরা দুজনে তাই বলে মোটেই ভাই নয় এবং ওদের প্রথম পরিচয়ই হয়েছে ১০৪নং ব্রিগেডে এসে। একজন কাজ করত জাহাজে ; সে সমুদ্রের ধারে মানুষ । আরেকজন যে, সোভিয়েত রাজত্ব পত্তনের পর তাকে শৈশবেই সুইডেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । বড় হয়ে সে পড়াশুনো করবার জন্যে নিজে ইচ্ছে করে এস্তোনিয়ায় ফিরে আসে ।

বলা হয়ে থাকে, জাত জিনিসটার কোনোই মানে নেই । সব জাতেই এমন লোক আছে যারা মোটেই সুবিধের নয় । কিন্তু শুখভ জীবনে যত এস্তোনিয়ার লোক দেখেছে, তাদের সংখ্যা যাই হোক—এ পর্যন্ত একটিও খারাপ লোক চোখে পড়েনি ।

এমনিভাবে সমস্ত কয়েদী বসে রইল—কেউ চাঙড়ের ওপর, কেউ কাঠের ফর্মায়, কেউ মাটিতে । সকালবেলায় জিভগুলো নড়ে না ; প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাবনা

নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে ; সবাই চুপচাপ । ফেতিউকভ, ওরফে ফেউ—এর মধ্যে কোত্থেকে যেন গোটাকতক পোড়া সিগারেটের টুকরো জুটিয়ে ফেলেছে । ও যদি পোড়া সিগারেটের টুকরো পায়, তাহলে এমন কি পিকদানী ঘাঁটতেও—কিছুতেই ওর বাধবে না । পোড়া সিগারেটের টুকরোগুলো হাঁটুর ওপর রেখে ফেতিউকভ খুলে খুলে তার ভেতর থেকে যে তামাকটুকু পোড়েনি সেই তামাক ঢেলে ঢেলে সিগারেটের কাগজে ভরছিল । বাইরে ফেতিউকভের তিন ছেলে ; ফেতিউকভ গ্রেপ্তার হওয়ার পর তারা বাপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছে, ফেতিউকভের বউও আবার নতুন করে বিয়ে করেছে । কাজেই তাদের কারো কাছ থেকে ফেতিউকভ কোনোরকম সাহায্য পায় না ।

ফেতিউকভের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ দেখবার পর বুইনভ্স্কি শেষ পর্যন্ত খেঁকিয়ে উঠল,—ওহে, হচ্ছেটা কী ? যতসব রোগের জীবাণু কুড়িয়ে কুড়িয়ে মুখে দিচ্ছ ? ঠোঁটে সিফিলিস হয়ে মরবে যে ! ফেল শিগ্‌গির !

বুইনভস্কি ছিল নৌবহরের ক্যাপ্টেন—তাই হুকুম করা তার স্বভাব । সকলের সঙ্গেই সে ঐভাবে কথা বলে । কিন্তু ফেতিউকভের ওপর বুইনভ্স্কির কোনো জোর নেই । বাড়ি থেকে বুইনভস্কির কোনো জিনিসপত্রও আসে না । ফেতিউকভ হাসতে হাসতে মুখ বিকৃত করে বলল,—সবুর করো, ক্যাপ্টেন, সবুর করো । এখনই কী ! আগে আটটা বছর ঘানি টানো, তারপব দেখবে তুমিও এটা ওটা খুঁটে খুঁটে বেড়াচ্ছ । তোমার চেয়েও ঢের ঢের মানী লোককে এ ক্যাম্পে আসতে দেখলাম ...

ফেতিউকভ নিজেকে দিয়ে দুনিয়াকে বিচাব করছিল ; কিন্তু ক্যাপ্টেন বুইনভস্কি হয়ত বরাবর ঠিক একভাবে চালিয়ে যাবে ।...

কানে খাটো হওয়ায় সেন্‌কা ক্লেভশিন শুনতে পায়নি কী বলা হল । লাইনে দাঁড়াবার সময় বুইনভ্স্কি যে ফ্যাসাদে পড়েছিল, সেনকা ভেবেছে সেই নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে ! সেনকা বলল,—ওখানে গলা বাড়াতে যাওয়া তোমার মোটেই উচিত হয়নি । তারপর সখেদে মাথাটা নাড়িয়ে বলল,—সব আপনি ঠিক হয়ে যেত ।

সেন্‌কা ক্লেভশিন খুবই গোবেচারা মানুষ । ওর কপালটাই খারাপ । ১৯৪১ সালে ওর একটা কানের পর্দা ফেটে যায় । তারপর যুদ্ধে বন্দী হয় । বন্দীশালা থেকে পালায় । কিন্তু আবার ধরা পড়ে বুকেনওয়াল্ডে চালান যায় । বুকেনওয়াল্ড থেকেও ও যে কী করে বেঁচে গেল সেটাই একটা তাজ্জব ব্যাপার । এখন ও বেশ চুপচাপ জেলের মেয়াদ খাটছে । সেন্‌কা বলল,—গলা বাড়িয়েছ কি গেছ ।

কথাটা ঠিক । বরং মেনে নিয়ে কাঁদাকাটা ভাল । যদি রুখে দাঁড়াও ছাতু করে ছেড়ে দেবে ।

আলিওশা নিঃশব্দে দু'হাতে মুখ ঢেকে রয়েছে । প্রার্থনার মন্ত্র জপ করছে ।

শুখভ পাঁউরুটির প্রায় সবটাই খেয়ে শেষ করে ফেলল—শুধু ওপরের অর্ধচন্দ্রাকার ছালটুকুন ছাড়া । রুটির টুকরো দিয়ে বাটির গা থেকে খিচুড়ি চেঁছেপুঁছে খেতে—আঃ, কী ভাল যে লাগে ! এর কাছে দুনিয়ার কোনো চামচই কিছু নয় । দুপুরের জন্যে শুখভ

রুটির ছালটুকু বাঁচিযে রেখে একটা সাদা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে নিল ; তাবপর নীচের জামার ভেতরের পকেটে পুঁটলিটা চালান করে দিয়ে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে তার জন্যে জামার বোতামগুলো ভাল করে এঁটে তৈরি হয়ে নিল । এবার ওরা যেখানে খুশি ওকে কাজে পাঠাক । অবশ্য হাতে আরেকটু সময় পেলে মন্দ হত না ।

৩৮নং ব্রিগেড উঠে পড়ে যার যার কাজে চলে গেল । কেউ গেল সিমেন্ট মাখতে, কেউ জল আনতে, কেউ লেগে গেল লোহার শিক দিয়ে রিইনফোর্স করার কাজে । এদিকে ১০৪নং ব্রিগেডে তিউরিন কিংবা তার সহকারী পাভলোর কোনো পাত্তা নেই । এদিকে যদিও ব্রিগেডের লোকজনেরা দাঁড়িয়ে আছে বিশ মিনিটও হয়নি, এবং যদিও কাজের সময় (শীতকাল বলে কম) সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত, তবু মাঝখানেব এই ফাঁকটুকুর জন্যে তাবা নিজেদের খুব ভাগ্যমন্ত বলে মনে করছে—যেন সন্ধেটা বেশ খানিকক্ষণ এগিয়ে আনা গেছে ।

লালমুখো পেটমোটা লাৎভিয়ান কিলগাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—ইস, কতদিন যে বরফের ঝড় হয়নি ! শীত যেতে বসেছে—অথচ এবার একবারও ববফের ঝড উঠল না । এ আবার কোনদেশী শীত ?

ব্রিগেডের বাকি সবাইও তখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে লাগল, সত্যি ! কী কাণ্ড, বরফেব ঝড় হল না ।

এদিকে একবাব যখন তুষারঝঞ্ঝা বইতে শুরু করে, তখন বাইবে কাজে যাবার কোনো প্রশ্নই থাকে না । শুধু কি তাই ? ব্যাবাক ছেড়ে কাউকে বেরোতেই দেওয়া হয় না । যদি দড়ি ধরে ধরে না চলো, তাহলে হয়ত ব্যারাক থেকে খাবার জায়গায় যেতে গিয়েই দেখা গেল তুমি উবে গিয়েছ । কোনো কয়েদী যদি বরফে জমে যায়, কুত্তায় ছিঁড়ে খেলেও তাকে দেখতে কাবো ভারি বয়েই গেছে । কিন্তু যদি সে সটকান দেয় ? এমন এমন ঘটনা ঘটেছে । ঝড়ের সময় ঝরা তুষাবগুলো থাকে ঝুরঝুরে ; কিন্তু স্তূপাকার হয়ে যখন সেগুলো চলতে আরম্ভ করে, তখন জমে জমে বেদম শক্ত হয়ে ওঠে । কিছু লোক তাতে চড়ে কাঁটাতারের বেড়া টপকে পালিয়েছে । তারা অবশ্য বেশীদূর যেতে পারেনি ।

ভাল করে ভেবে দেখলে, বরফের ঝড়ে কারো কোনো লাভ নেই । কয়েদীদের থাকতে হয় চাবিবন্ধ ঘরে । সময়মত কয়লা মেলে না । ব্যাবাকের ভেতর কোথাও এতটুকু তাপ নেই । ময়দা এসে না পৌঁছুনোয় রুটি হতে পাবে না । তিন দিন কি এক সপ্তাহ—ঝড় যতদিনই চলুক, দিনগুলোকে ছুটির দিনের মতই ধরা হয় ; কিন্তু পরে তার জন্যে পর পর কয়েকটা রবিবার ওরা তোমাদের নাকে দড়ি দিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে খাটাবে ।

তবু কিন্তু কয়েদীরা বরফের ঝড় পছন্দ কবত, তারা চাইত ঝড় উঠুক । একটু জোরে হাওয়া দিলেই তারা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখত । আয় বৃষ্টি হেনে ! ছাগল দেব মেনে !

বৃষ্টি বলতে বৃষ্টি নয়—তুষার ।

এ দলের একজন একটু গা গরম করবে বলে ৩৮ নম্বর ব্রিগেডের চুল্লীটার কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করেছিল, তাকে ওরা ঠেলা মেরে সরিয়ে দিল ।

এমন সময় তিউরিন ভেতরে এল । মুখটা তার থম থম করছে । ব্রিগেডের লোকজনদের বুঝতে বাকি রইল না—ঘাড়ে কাজ চেপেছে, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে করতে হবে ।

তিউরিন চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল,—আচ্ছা ! একশো চার নম্বর—হাজির সব ?

তিউরিন আর গোনাগণ্তি করার ঝুটঝামেলার মধ্যে গেল না — কেননা এ জায়গা ছেড়ে কোথায়ই বা কে যাবে ? কাজেই লোক না গুনে তিউরিন কাকে কী কাজ করতে হবে চট্পট্ বুঝিয়ে দিল । এস্তোনিয়ান দুজন আর সেইসঙ্গে ক্লেভশিন আর গপ্চিককে পাঠানো হল কাছেই একটা জায়গা থেকে সুরকি মেশানোর দুটো বড় বড় বাক্স বিজলী স্টেশনের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে । সবাই বুঝতে পারল তাদের ব্রিগেডের ওপর বিজলী স্টেশনে গিয়ে কাজ করবার ভার পড়েছে ; বাড়িটা এতদিন অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে এবং শীত পড়বার পর থেকে তাতে আর কারো হাত পড়েনি । দুজনকে পাঠানো হল যন্ত্রপাতির ঘরে । পাভলো আগে গিয়ে সেখান থেকে যন্ত্রপাতি যোগাড়ের ব্যবস্থা করছিল । দলের চার জন লোককে ডেকে তিউরিন বিজলী স্টেশনের বাড়িটার পাশ থেকে, জেনারেটর যে ঘরে আছে সেই ঘরের প্রবেশপথ থেকে, খোদ জেনারেটর রুম থেকে এবং মই থেকে বরফ সাফ করার হুকুম দিল । দুজনের ওপর হুকুম হল জেনারেটর রুমে কয়লা দিয়ে এবং যেখান থেকে যেটুকু কাঠ জোটাতে পারবে তাই দিয়ে আগুন ধরাবার । একজনকে সে পাঠাল স্লেজে করে সিমেন্ট পৌঁছে দেবার জন্যে । দুজনকে পাঠানো হল জল আনতে । একজন গেল বালি আনতে ; তার সঙ্গে আরেকজনকে পাঠানো হল সেই বালির ওপর জমা বরফ সাফ করবার কাজে সাহায্য করতে এবং শাবল মেরে সেই বরফ ভেঙে টুকরো টুকরো করতে ।

সবাইকে সব কাজ দেওয়ার পর বাকি রয়ে গেল শুধু শুখভ আর কিল্গাস—ব্রিগেডের মধ্যে এই দুজনেরই সবচেয়ে পাকা হাত । ওঁদের দুজনকে ‘ওহে ছোকরা, শোনো এদিকে’ বলে ডাকল ।

বয়সে যদিও তিউরিন ওদের চেয়ে বড় নয়, তবু ওদের সে ছেলেছোকরা বলেই ডাকে । ডেকে বলল, দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর তোমরা দোতলার দেয়ালে সিমেন্টের চাঙড়গুলো বসাবে—৬ নম্বর ব্রিগেড শীতের আগে যে পর্যন্ত কাজ করে রেখে গেছে, তার পর থেকে । জেনারেটর রুমটাকে একটু গরম করার কোনো একটা ব্যবস্থা করতে হবে । গোটা তিনেক বড় বড় জানলা আছে । যাহোক কিছু দিয়ে জানলাগুলো ঢেকে দিতে হবে । আমি তোমাদের কিছু লোকজন দিচ্ছি, জানলায় কী লাগাবে তোমরা ভেবে ঠিক করে নাও । জেনারেটর রুমটাতে সুরকি তৈরি করা হবে । আর সেইসঙ্গে ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবারও একটা ব্যবস্থা থাকবে ; নইলে কুকুরবেড়ালের মত

আমাদের ঠাণ্ডায় মরতে হবে ।

তিউরিন আরও হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গপ্চিক ছুটে এসে নালিশ করল, —অন্য ব্রিগেডের লোকেরা সুরকি মেশানোর বাক্সটা কিছুতেই দিতে চাইছে না, নিতে গেলে তেড়ে মারতে আসছে । গপ্চিক নেহাৎ ছেলেমানুষ, বছর ষোল বয়স— শুয়োরছানার মত গোলাপী রং । শুনে তিউরিন তক্ষুণি ছুটে গেল ।

এই ঠাণ্ডায় কাজে হাত লাগানো যত কষ্টেরই হোক, সবচেয়ে বড কথা হল কাজ একবার শুরু করে দেওয়া—শুধু একবার শুরু করে দিতে পারলেই হয় ।

শুখভ আর কিল্‌গাস পরস্পরের দিকে চাইল । প্রায়ই তারা দুজনে মিলে কাজ করে থাকে । ভাল ছুতোরমিস্ত্রি আর রাজমিস্ত্রি হিসেবে তারা পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে । চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে বরফ, তার মধ্যে থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা-হোক কিছু দিয়ে জানলার খোঁদলগুলো আটকানো—কাজটা খুব সহজ হবে না । কিন্তু কিল্‌গাস বলল, —ভানিয়া, বাড়ি তৈরির পাটাগুলো যেখানে রাখা আছে, আমি জানি তার মধ্যে ঘর ছাওয়ার জন্যে রোল-করা একরাশ কাগজ আছে । আমিই লুকিয়ে রেখে দিয়েছি । চলো না, ওটা আমরা হাতিয়ে নিয়ে আসি ।

কিল্‌গাস লাৎভিয়ান হলে কী হয় রুশভাষা তার কাছে জলভাত । দেশে তার বাড়ির পাশেই ছিল সনাতনধর্মে বিশ্বাসী একটা খৃস্টানপাড়া ; ছেলেবেলাতেই রুশভাষায় তার হাতেখড়ি হয় । বন্দীশিবিরে সবে দু'বছর হল সে এসেছে ; কিন্তু এর মধ্যেই আদত কথাটা সে বুঝে নিয়েছিল—যদি কিছু পেতে চাও দাঁত দিয়ে কামড়ে নিতে হবে । নাম তার জোহান । জোহান কিলগাস। কিন্তু শুখভ আর সে দুজনেই দুজনকে ভানিয়া বলে ডাকত ।

দুজনে ঠিক করল রোল-করা কাগজটা আনতে যাবে । কিন্তু শুখভ প্রথমে ছুটে গেল যেখানে মোটর মেরামতী কারখানার ঘর তৈরি হচ্ছিল সেখান থেকে কর্নিকটা আনতে । রাজমিস্ত্রিদের আবার যেমন তেমন কর্নিক হলে ঠিক চলে না ; কর্নিকটা হতে হবে বেশ হাল্কা এবং যুৎসই । কিন্তু এখানে এই কাজের জায়গায় যন্ত্রপাতিগুলো সকালে দিয়ে সন্ধেবেলা নিয়ে নেওয়াই হল রেওয়াজ । কাল কার কি রকম জুটবে কেউ বলতে পারে না—সবই ভাগ্যের ব্যাপার । কিন্তু শুখভ একবার গণ্ডায় আণ্ডা মিলিয়ে যন্তরখানার মুন্সীকে ফাঁকি দিয়ে সবচেয়ে ভাল কর্নিকটা বাগিয়ে নিয়েছিল । রোজ সে কাজ সেরে কর্নিকটা লুকিয়ে রেখে যেত । রোজ সকালে ইঁট বা পাটা গাঁথার দরকার পড়লেই গিয়ে কর্নিকটা নিযে আসত । অবশ্য ১০৪নং ব্রিগেডকে ওরা যদি 'সমাজতান্ত্রিক জীবনায়নে'ব কাজে আজ ঠেলে পাঠাত, তাহলে ওটা তার হাতছাড়া হয়ে যেত । যাই হোক, এখন সে কিছু ইঁটপাটকেল সরিয়ে একটা ফাটলের মধ্যে আঙুল গলিয়ে লুকোনো কর্নিকটা টেনে তুলল ।

শুখভ্ আর কিল্‌গাস্ মোটর মেরামতী কারখানা থেকে বেরিয়ে কংক্রিটের ফলক জোড়া-দেওয়া বাড়িগুলোর দিকে হাঁটা দিল । সূর্য দেখা দিয়েছে বেশ খানিকক্ষণ আগে,

কিন্তু রোদটা মিয়োনো—কেমন যেন কুয়াশায় ঢাকা ভাব । সূর্যের চারপাশ থেকে কতকগুলো ফ্যাকড়া বেরিয়েছে ঠিক আলোর খুঁটির মত ।

শুখভ মাথাটা নেড়ে সূর্যের দিকে ইশারা করে বলল,—খুঁটি পোঁতা রয়েছে বলে মনে হয় !

কিল্‌গাস নির্লিপ্তভাবে বলল, খুঁটি পুঁতলেই বা আমাদের কী এসে যায় ! বলে একটু হাসল । তারপর বলল, খুঁটিগুলোর মাঝখানে মাঝখানে কাঁটাতার না বসালেই হল ।

কিল্‌গাস যাই বলুক তার মধ্যে একটু রসিকতা থাকে । ব্রিগেডের সবাই তাকে সেইজন্যে এত পছন্দ করে । জেলে আর যে-সব লাৎভিয়ান আছে তারা সবাই কিলগাসকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে । হাজার হোক, কিলগাস খেতে পায় মন্দ নয় । মাসে ওর বাড়ি থেকে দুটো করে পার্সেল আসে । ওর টেবো-টোবো গাল দেখে মনেই হবে না ও জেলখানায় আছে । রসিকতা করা কিল্‌গাসেরই সাজে ।

যেখানে দালানকোঠা তৈরির কাজ হচ্ছে সেই এলাকাটা প্রকাণ্ড । এপাশ থেকে ওপাশে যেতেই তো অনেকখানি সময় লেগে যাবে । রাস্তায় ৮২ নম্বর ব্রিগেডেব ছোকরাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল । আবার তাদের ওপর হুকুমও হয়ে গেল বরফজমাট মাটিতে যেন তারা গর্ত খোঁড়বার চেষ্টা করে । খুব বড় গর্ত নয় ; লম্বায় দেড় ফুট, আড়ে দেড় ফুট আর নীচের দিকে দেড় ফুট । কিন্তু জমি এখানে পাথরের মত, এমন কি গ্রীষ্মকালেও—আর এখন তো সে জমি ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে এমন শক্ত নিরেট হয়ে আছে যে তাতে দাঁত ফোটাতে পারবে না । শাবল মারতে গেলে শাবল সাঁ করে পিছলে যাবে । শুধু আগুনের ফুলকিই উঠবে—না খসবে ধুলোমাটি, না ভাঙবে টুকবো । যাদের ওপর গর্ত খোঁড়ার ভার পড়েছিল, তারা তাদের ক্ষুদে ক্ষুদে গর্তের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে জুল জুল করে তাকাচ্ছে—শুখভ আর কিল্‌গাস যেতে যেতে দেখতে পেল । এমন একটা জায়গা নেই যেখানে দুদণ্ড গিয়ে একটু গরম পেতে পারে—তাছাড়া কাজ ছেড়ে কোথাও যাওয়ার হুকুমও নেই । সুতরাং শাবল হাতে নাও—এখানে গা গরম করার একমাত্র উপায় সমানে শাবল চালিয়ে যাওয়া ।

দলটার মধ্যে শুখভের একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ; ভিয়াৎকায় তার বাড়ি । শুখভ তাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিল,—বাপু হে, এক কাজ করো ; একটু আগুন জ্বালিয়ে নাও, তাহলে আপনা থেকেই বরফ গলে গিয়ে গর্ত তৈরি হয়ে যাবে ।

তার উত্তরে ভিয়াৎকার সেই লোকটা বলল,—আগুন জ্বালাতে দিলে তো ! একটা চেলাকাঠও ওরা আমাদের দেয় না ।

—নিজেদেরই জুটিয়ে নিতে হবে ।

কিল্‌গাস শুধু পিচিৎ করে থুথু ফেলে নিল ।

—তুমিই বলো, ভানিয়া—কর্তৃপক্ষের ঘটে যদি বুদ্ধিই থাকবে, তাহলে কি কেউ এই ঠাণ্ডার মধ্যে শাবল দিয়ে মাটি খাবলাবার জন্যে লোক পাঠায় ?

কিল্‌গাস অস্পষ্টভাবে বারকয়েক শ-কার ব-কার আউড়ে চুপ করে গেল । এত

ঠাণ্ডায় বেশী কথাও বলা যায় না। ওরা দুজনে আরও খানিকটা এগিয়ে যেখানে বরফের নীচে বাড়ি তৈরির পাটাগুলো ডাঁই করা আছে সেখানে এল।

শুখভ কিল্‌গাসের সঙ্গে কাজ করতে ভালবাসে। কিলগাসের একটাই যা দোষ। ওর ধূমপানের অভ্যেস নেই, বাড়ি থেকে ওর তামাক আসে না।

ঠিক তো, এই সেই জায়গা। কিলগাসের চোখ আছে বলতে হবে। দুজনে মিলে ধরাধরি করে প্রথমে একটা, তারপর আর একটা পাটা সবাতেই তাব তলা থেকে ঘর ছাইবার রোল-করা কাগজটা পাওয়া গেল।

দুজনে টেনেটুনে তো বাব করল। কিন্তু এখন নিয়ে যাবে কেমন করে ? উঁচু টং থেকে পাহারাওয়ালারা যদি দেখে ফেলে কিছু আসে যায় না। ওবা ওখানে মাথায় শুধু একটা চিন্তা নিয়েই ময়নার মত দাঁড়ে বসে আছে—ওরা দেখছে কয়েদীরা যেন না পালায়। আর কাজের জায়গায় পাহারাদার সেপাইরা ? যদি সমস্ত পাটাগুলোকে কুড়ুল দিয়ে চেলা করে জ্বালানী করো—তাতেই বা কে দেখতে আসছে ? এমন কি যদি কোনো ক্যাম্পগার্ডের সামনাসামনি পড়ে যাও তাতেও কোনো ভয় নেই। কেননা সে নিজেই তক্কে তক্কে ঘুরছে কোন জিনিসটা হাতিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। আর যদি সাধারণ কয়েদীদের কথা ওঠে—বাড়ি তৈরির পাটাগুলো দেখলেই তো ওরা থু থু করে। ব্রিগেডের ফোরম্যানদেরও ঐ এক ব্যাপার। একমাত্র যাদের এদিকে কড়া নজব, তারা হল : এক, বেসামরিক (অর্থাৎ, জেলের বাইরেব লোক) ওয়ার্ক সুপারভাইজার ; দুই, যারা জুনিয়ব ওয়ার্ক সুপারভাইজার (কয়েদী) ; আর তিন, ঢ্যাঙা বোগা শকুরোপাতেঙ্কো। কোনো পদের নয়—সাধারণ একজন কয়েদী মাত্র। ওকে ঘণ্টা হিসেবে ফুবনে শুধু একটাই কাজ দেওয়া হয়েছে—কয়েদীরা যাতে বাড়ি তৈবির পাটাগুলো নিয়ে হাঁটা না দেয় সেদিকে নজর রাখা। খোলা জায়গায় সবচেয়ে বেশী ভয় রয়েছে শকুরোপাতেঙ্কোর হাতে ধরা পড়বার।

শুখভ বলল,—দেখ ভানিয়া, আড় করে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তার চেয়ে এসো দুপাশ থেকে খাড়া করে ধরে নিয়ে যাই—তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতেও সুবিধে হবে, গায়ে আড়ালও পড়বে। দূব থেকে দেখে কেউ ধবতে পারবে না।

শুখভ মন্দ বলেনি। আড করে নিয়ে যাওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কাজেই ওবা ওভাবে নিয়ে গেল না। ওরা করল কি, ওটাকে তৃতীয় একজন লোকের মত দুজনের মাঝখানে খাড়া করে ধরে হন্ হন করে হাঁটতে লাগল। পাশ থেকে দেখলে মনে হবে দুজন লোক যেন খুব ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে হাঁটছে।

শুখভ বলল,—কিন্তু ওয়ার্ক সুপারভাইজার তো জানলার গায়ে ঘব ছাইবার কাগজ দেখতেই পাবে। তখন ও তো সব বুঝে ফেলবে।

কিলগাস অবাক হওয়ার ভাব করে বলল,—আমরা তার কী জানি ! বিজলী স্টেশনে এসে দেখা গেল জানলায় কাগজ দেওয়া। তার মানে, আগে থেকেই ওখানে ছিল। তখন আর কী করা হবে ? টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে ?

হ্যাঁ, ঠিকই তো ।

পাতলা হাতমোজার মধ্যে আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে । শুখভের মনে হচ্ছে না হাতে আঙুল আছে । বাঁ পায়ের ফেল্ট বুটটার জন্যে শুখভ জোরে চলতে পারছে না । পায়ের জুতোজোড়াই হল আসল । হাতদুটো তো কাজে লাগলেই গরম হয়ে যাবে ।

ফুটফুটে শুচিশুভ্র বরফের ওপর দিয়ে ওরা চলতে লাগল । যন্ত্রপাতির ঘর থেকে বিজলী স্টেশন পর্যন্ত বরফের ওপর স্লেজ টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ । স্লেজে করে নিশ্চয় সিমেন্ট বয়ে নিয়ে গেছে ।

বিজলী স্টেশনটা একটা উঁচু ডাঙার ওপর । তার ঠিক পেছনেই এলাকাটা শেষ হয়েছে । বিজলী স্টেশনের গায়ে অনেকদিন হয়ে গেছে কারো হাত পড়েনি । ভেতরে যাবার সব ক'টা রাস্তাই বরফে ঢাকা পড়ে গেছে । স্লেজের রাস্তা আর তার ওপর গভীরভাবে কাটা নতুন দাগগুলো তুলনায় রীতিমত স্পষ্ট । ব্রিগেডের লোকজনেরা কাঠের কোদাল দিয়ে বিজলী স্টেশন আর গাড়ির রাস্তার বরফ সরিয়ে সরিয়ে এই পথ দিয়েই গেছে ।

বিজলী স্টেশনের লিফ্‌টটা চালু থাকলে বড় ভাল হত । কিন্তু মোটরটা পুড়ে যাওয়ার পর আর সারানো হয়নি । এ-অবস্থায় সবকিছুই দোতলায় ঘাড়ে করে টেনে তুলতে হবে । সুরকি । সিমেন্টের ব্লক । সবকিছু ।

দু দুটো মাস বিজলী স্টেশনটা পাঁশুটে কঙ্কালের মত পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে ছিল । এমন সময় সেখানে এল ১০৪ নম্বর বিগেড । কিসের টানে ১০৪ নম্বর ব্রিগেডের মানুষেরা এক জায়গায় বাঁধা পড়েছিল ? খালি পেটে জড়ানো ক্যানভাসের বেল্ট ? হাড়কাঁপানো শীত ? না আছে মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই, না একটু আগুন । তবু ১০৪ নম্বর ব্রিগেড আসাতেই বাড়িটাতে যেন প্রাণের সাড়া জেগে উঠল ।

জেনারেটর রুমে ঢুকবার মুখেই সুরকি মেশাবার বাক্সটা ভেঙে খসে পড়ে গিয়েছিল । বাক্সটা ছিল একদম পচা । বাক্সটা যে আস্ত গিয়ে পৌঁছুবে এ বিশ্বাস গোড়াতেই শুখভের ছিল না । ফোরম্যান তিউরিন নেহাৎ লোকদেখানোর মত করে একপ্রস্থ গালাগাল দিল ; সেও স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছিল যারা বয়ে আনছিল তাদের দোষ নয় । এমন সময় শুখভ আর কিল্‌গাস রোল-করা কাগজ নিয়ে সেখানে হাজির হল । তিউরিন দেখে খুব খুশী হল । তক্ষুণি নতুনভাবে সে কাজকর্মের ব্যবস্থাটা ঢেলে সাজাল । শুখভ চুল্লীটা ঠিক করে ফেলবে যাতে অবিলম্বে তাতে আগুন দেওয়া যায় । কিল্‌গাসের ওপর সুরকির বাক্সটা সারাবার ভার পড়ল, এস্তোনিয়ান যুগল তাকে সাহায্য করবে । সেন্‌কা ক্লেভ্‌শিনকে একটা কুড়ুল হাতে দিয়ে বলা হল দুটো লম্বা গোছের কাঠের বাতা চেলা করে জানলায় কাগজ আটকাবার ব্যবস্থা করতে । জানলা যা চওড়া, তাতে আড়ের দিকে দুটো কাগজ জুড়তে হবে । কাঠের বাতা কোথায় পাওয়া যাবে ? নিছক মাথা গুঁজবার জন্যে তক্তা দিতে ওয়ার্ক সুপারভাইজারের ভারি বয়েই গেছে । ফোরম্যান এদিক-

ওদিক তক্তা খুঁজে বেড়াতে লাগল ; সেই দেখে অন্যেরাও খুঁজতে লেগে গেল । দোতলায় ওঠবার সিঁড়িতে হাত দিয়ে ধরবার যে রেলিংটা আছে, তা থেকে একজোড়া কাঠের বাতা খসিয়ে নেওয়া যায় । না নিলে চলবেই বা কী করে । ওপরে ওঠবার সময় একটু শুধু হুঁশিয়ার থেকো—নইলে পা ফস্‌কালেই গেছ !

হয়ত কেউ ভাবতে পারে, দশ বছর ধরে যে জেলের ঘানি টানছে তার কী এমন দায় পড়েছে যে খেটে খেটে পিঠের হাড় বেঁকিয়ে ফেলবে ! অর্থাৎ, আমার ভাল লাগে না, ব্যস । এর ওপর আর কথা নেই । সন্ধে অবধি দিনমানটা যো-সো করে কাটিয়ে দেব । তারপর রাত্তিরটা আমার ।

কিন্তু তাতে ভবী ভোলেনি । নইলে আর ওয়ার্ক ব্রিগেড করা হয়েছে কেন ! এ তো আর স্বাধীন অবস্থার ব্রিগেড নয়, যেখানে রাম আর শ্যাম আলাদা আলাদা মজুরী পাবে । বন্দীশিবিরগুলোতে ব্রিগেড হল একরকমের কল, যেখানে কর্তৃপক্ষের বদলে কয়েদীরাই এ ওকে চোখে চোখে রাখে । কলটা এইভাবে চলে : হয় প্রত্যেকে বাড়তি খাবার পাবে, নয় প্রত্যেকেই উপোসী থাকবে । তুই যদি কাজ না করিস, ছুঁচো—তোর জন্যে আমাকে না খেয়ে থাকতে হবে । গা লাগা, জানোয়ার কাঁহাকা !

এইরকমের অবস্থায় পড়লে আর ঢিলেমির ভাব থাকতে পারে না । তখন আর তুমি উব্‌দো হয়ে বসে থাকতে পারো না । চাও না চাও, তখন তোমাকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াতে হবে । দু ঘণ্টার মধ্যে যদি আমরা মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে ফেলতে না পারি, আমাদের সকলেরই প্যাঁচে পড়তে হবে । সে একরকমের ভালই ।

পাভলো যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে এল । যার যেটা দরকার নিয়ে নাও । সেইসঙ্গে চুল্লীর খানিকটা পাইপ । টিনের কাজ করবার কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না বটে, তবে একটা হাতুড়ি আর কুড়ুল ছিল । ঐ দিয়েই কোনোরকমে আমরা কাজ চালিয়ে নেব ।

শুখভ নিজের হাতদুটো ঘষে গরম করে নিচ্ছে, তারপর পাইপে পাইপে বসিয়ে জোড়গুলো ঠুকে জুড়ে নিচ্ছে । একবার হাত ঘষছে, তারপর আবার হাতুড়ি দিয়ে জোড়গুলো ঠুকছে । কর্নিকটা সে কাছেই একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে । চারপাশে যদিও সব নিজেদের ব্রিগেডেরই লোক, তবু তারা কর্নিকটা মেরে দিতে পারে । এমন কি কিল্‌গাসকেও বিশ্বাস নেই ।

শুখভের মাথায় তখন আর অন্য কিছুই নেই । নিজের বিষয়ে সমস্ত স্মৃতি সমস্ত চিন্তাভাবনা তখন চুলোয় গেছে । সে তখন একমনে ভাবছে—চুল্লীর চোঙটা বেঁকিয়ে কিভাবে সে ঝোলাবে যাতে তাদের ধোঁয়া খেতে না হয় । গপ্‌চিককে পাঠানো হল, একটা তার খুঁজে আনতে—যাতে জানলায় নলটাকে বেঁধে দিলে মুখটা বাইরের দিকে থাকে ।

ঘরের কোণে আরেকটা বসানো চুল্লী ছিল—তার চিমনিটা ইট দিয়ে গাঁথা । চুল্লীটার মুখে একটা লোহার পাত ছিল ; আগুনের আঁচে লোহার পাতটা যখন লাল হয়ে তেতে উঠত, তখন তার ওপর বরফলাগা বালি ছড়িয়ে দিলে বরফ গলে জল শুকিয়ে গিয়ে

বালিটা বেশ শুকনো কড়কড়ে হয়ে থাকত । ব্রিগেডের লোকজনেরা ঐ চুল্লীটাতে এরই মধ্যে আঁচ দিয়ে ফেলেছে এবং বুইনভ্স্কি আর ফেতিউকভের ওপর ভার পড়েছে ঠেলাগাড়িতে করে বালি বয়ে আনার । হাতগাড়ি ঠেলতে কোনোই বুদ্ধির দরকার হয় না । কাজেই আগে যারা মাতব্বর গোছের লোক ছিল, তিউরিন তাদেরই বেছে বেছে এই কাজ করতে দিয়েছে । লোকে বলে, ফেতিউকভ নাকি কোথাকার কোন্ এক অফিসের বড়সাহেব ছিল ; সবসময় গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়াত ।

গোড়ায় গোড়ায় ফেতিউকভ ক্যাপ্টেন বুইনভ্স্কিকে ভড়কে দেবার খুব চেষ্টা করত আর কথায় কথায় খেঁকিয়ে উঠত । কিন্তু ক্যাপ্টেন একবার ফেতিউকভের মুখে সজোরে এমন এক চড় কষিয়েছিল যে, তারপর থেকে ও আর কখনও লাগতে আসেনি ।

কয়েদীরা এ ওকে ঠেলে চুল্লীটার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল শরীরটা একটু তাতিয়ে নেবে বলে—কিন্তু ফোরম্যান তাদের ধমকাল ।

—সেঁকি, দাঁড়াও—মুণ্ডুগুলো । যাও, পালাও—আগে সব কাজ সারো ।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায় । ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা, কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হল ফোরম্যান ! লোকলস্করেরা যে যার কাজ করতে চলে গেল ।

শুখভ শুনতে পেল তিউরিন ফিস ফিস করে পাভ্লোকে বলছে,—তুমি এখানে থাকো । একটু ডেঁটে রেখো সবাইকে । আমি যাই, গিয়ে কোটাটা বাড়িয়ে আসি ।

কাজ করার চেয়ে কোটা ছাপিয়ে যাওয়ার ওপরই নির্ভব করে বেশী । যে ফোরম্যান চালাক, প্ল্যান পুরো করার বিবরণসংক্রান্ত নথিপত্র তৈরি—কোটা ছাপিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেই সে বেশীরকম খাটে । খেতে পাবার এই হল উপায় । যেটা হয়নি—সেটা হয়েছে বলে প্রমাণ কবো । যে কাজগুলো কম দামী কাজের কোঠায় পড়েছে—এমনভাবে হাতসাফাই করো, যাতে সেগুলো বেশী দামী কাজের কোঠায় পড়ে । এই চালাচালির ব্যাপারে ফোরম্যানকে বেশ মাথা খেলাতে হয় । সেই সঙ্গে দরকাব খাতাঞ্চীদের সঙ্গে খানিকটা খাতির জমিয়ে রাখা । ওদের হাতও খানিকটা ভারী করা দরকার ।

যদি একটু ভেবে দেখ—কার জন্যে ঐ কোটা ? ক্যাম্পের জন্যে । নির্মাণ সংস্থাগুলোর কাছ থেকে বাড়তি হাজার হাজার টাকা পেয়ে ক্যাম্প লাল হয়ে গেছে ; অফিসারদের দেওয়া হয়েছে বোনাস । ভলকোভোই পেয়েছে চাবুক মেরে । আর কয়েদীর দল ? কয়েদীরা পেয়েছে সন্ধেবেলায় ছ-আউন্স রুটি । ছ-আউন্স রুটিই এখানে জীবনের নিয়ন্তা ।

দু'বালতি জল এল । কিন্তু আনতে আনতে বরফ । পাভলো ঠিক করল জল বয়ে আনার কোনো মানে হয় না । তার চেয়ে এ বাড়ির বরফগুলো তাতিয়ে জল করে নেওয়াই তো ভাল । দু বালতি জল চুল্লীর ওপর বসিয়ে দেওয়া হল ।

গপচিক কোত্থেকে যেন ঝকঝকে নতুন খানিকটা অ্যালুমিনিয়ামের তার হাতিয়ে এনেছে—তারটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রিদেরই হবে । এনে শুখভকে বলল,—ইভান দেনিসিচ ! বেশ ভাল তার এটা, এ দিয়ে চামচে হয় । আমাকে তুমি চামচে বানাতে শেখাবে ?

বিচ্ছুটাকে শুখভ ভালবাসত। শুখভের নিজের একটি ছেলে ছিল, ছোটবেলাতেই মারা যায় ; দেশের বাড়িতে তার দুই বয়স্থা মেয়ে আছে। পশ্চিম য়ুক্রেনের বেন্দেরার দলের গেরিলাদের জন্যে জঙ্গলে দুধ নিয়ে যাচ্ছিল বলে গপ্‌চিককে ধরে জেলে পোরা হয়েছে। সাবালকদের যে সাজা দেওয়া হয়, গপচিককে সেই সাজাই দেওয়া হয়েছে —নাবালক বলে রেয়াত করা হয়নি। গপচিক যেন ফুটফুটে ছোট ছানা ; সবার কাছে সেইভাবেই সে আদর কাঁড়িয়ে বেড়াত। ছোট্ট ছানা হলে কী হবে, এর মধ্যেই সে খানিকটা ধূর্তুমি রপ্ত করে ফেলেছে। বাড়ি থেকে ওকে যা খাবার পাঠাত, কাউকে না দিয়ে তা সে একাই খেয়ে শেষ করত। কখনও কখনও দেখা যেত রাত্তিরবেলায়ও ওর মুখ চলছে।

যাই বলো, সবাইকে তো আর ও খাওয়াতে পারে না।

গপচিক আর শুখভ চামচে করবার জন্যে খানিকটা তার কুট করে ভেঙে নিয়ে ঘরের এক কোণে লুকিয়ে রেখে দিল। চুল্লীর চোঙ ঝোলাবার জন্যে শুখভ দু টুকবো কাঠ দিয়ে উপস্থিতমত একটা মই বানিয়ে গপ্‌চিককে তার ওপর ঠেলে তুলে দিল। গপ্‌চিক ঠিক কাঠবেড়ালির মত মই বেয়ে তরতরিয়ে মটকায় উঠে গেল। কড়িকাঠে হাতুড়ি দিয়ে একটা পেরেক ঠুকে, তাতে তার লাগিয়ে চোঙটার গায়ে জড়িয়ে দিল। শুখভও গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছিল না। চুল্লীব চোঙটাতে একটা কনুই লাগিয়ে চোঙের মুখ বাইরের দিকে করে দিল। আজ অবশ্য তেমন হাওয়া নেই, কিন্তু কাল তো হতে পারে। হাওয়াব ঝাপ্টায় চুল্লীর ধোঁয়া উজিয়ে ভেতরে আসুক এটা সে চায় না—বিশেষ করে, ঐ চুল্লীটা যখন তাদের নিজেদেরই জন্যে।

সেন্‌কা ক্লেভশিন এর মধ্যে লম্বা লম্বা কয়েকটা কাঠের ফলক চিরে ফেলেছে। ওগুলো পেরেক দিয়ে আটকাবার জন্যে আবার সেই গপ্‌চিক সোনামানিকেরই ডাক পড়ল। দুষ্টুর শিরোমণি লটরপটর করতে করতে ওপরে উঠে নীচের লোকদের ওপর খুব তম্বি করতে শুরু করে দিল।

রোদ আরেকটু চড়া হয়ে কুয়াশা খেদিয়ে দিল। সূর্যের চারপাশে লম্বা লম্বা খুঁটির মত আর সেই রশ্মিগুলো দেখা গেল না। বাড়ির ভেতরটা গোলাপী আভায় ভরে উঠল। ঠিক সেই সময় চুরি করে-আনা দ্বিতীয় চুল্লীটাতে আগুন দেওয়া হল। সেটা হল আরও বেশী আনন্দের কারণ।

শুখভ বলে উঠল,—জানুয়ারি মাসে সূয্যিঠাকুর গরুর পাছা গরম করে।

সুরকি মেশানোর বাক্সটা সেরেসুরে শেষবারের মত তাতে একটা কুড়ুলের কোপ মেরে কিলগাস চেঁচিয়ে বলল,—শুনে রাখো, পাভলো ভায়া! আমি কিন্তু ঐ কাজটার জন্যে ফোরম্যানের কাছ থেকে একশো রুবলের এক আধলাও কম নেব না।

পাভলো হেসে ফেলল,—আচ্ছা, তুমি একশো গ্রামই পাবে। তার মানে, আউন্স তিনেক ভোদ্‌কা।

গপ্‌চিক ওপর থেকে ফোড়ন কাটল,—সরকারী উকিল আরও একটু বাড়িয়ে দেবে।

শুখভ হঠাৎ হাঁ-হাঁ করে উঠল,—কী করো, কী করো—উঁহু, ওভাবে নয় । ছাদ-ছাওয়ার কাগজ কক্ষণো ওভাবে কাটে না ।

কিভাবে কাটতে হয় শুখভ দেখিয়ে দিল ।

লোহার চুল্লীটার কাছে একগাদা লোক ভিড় করেছে । পাভ্লো দূর-ছাই করে তাদের তাড়িয়ে দিল । কিল্‌গাসকে সে কিছু লোক দিল যাতে তাদের সাহায্য নিয়ে কিল্‌গাস সিমেন্ট বয়ে নিয়ে যাবার ঠেলাগাড়ি তৈরি করে ফেলে । আরও কিছু লোককে সে বালি টানার কাজে লাগিয়ে দিল ; কিছু লোককে পাঠানো হল ওপরে উঠে ভারার গা থেকে আর নতুন যেখানে কংক্রিটের গাঁথনি বসবে সেখান থেকে বরফ পরিষ্কার করতে । একজনের ওপর ভার দেওয়া হল চুল্লীর মুখ থেকে গরম বালি নিয়ে সে সুরকি মেশাবার বাক্সে রাখবে।

বাইরে একটা মোটরের ভট ভট্ আওয়াজ শোনা গেল ; কংক্রিটের চাঙড়গুলো পৌঁছে দেবার জন্যে বরফের ভেতর দিয়ে পথ কেটে কেটে আসছে একটা ট্রাক । পাভ্লো তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল--ট্রাকটাকে হাত দেখাতে হবে আর বলে দিতে হবে ঠিক কোন জায়গায় মালগুলো রাখা হবে ।

প্রথমে একপ্রস্থ, পরে আরেক প্রস্থ ঘর ছাওয়ার কাগজ পেরেক দিয়ে আটকানো হল । এতে কতটা ঠাণ্ডা আটকাবে কে জানে ? যত যাই হোক, কাগজ তো ! কিন্তু দেখতে হল ঠিক সত্যিকার দেয়ালের মত । কাগজ দিয়ে ঢেকে দেবার ফলে ভেতরটা খানিকটা অন্ধকার-অন্ধকার হল । সেই স্তিমিত আলোয় চুল্লীর শিখাগুলো আরও বেশী জ্বল জ্বল করে উঠল ।

আলিওশা এল কয়লা নিয়ে । তাকে দেখেই হৈ হৈ করে উঠে কেউ বলল,—ঢেলে দাও চুল্লীতে । কেউ বলল,—খবরদার, ঢালবে না ! তবু যা হোক কাঠের জ্বালে একটু হাত-পা গরম করা যাচ্ছে । আলিওশা কার কথা শুনবে বুঝতে না পেরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল ।

ফেতিউকভ চুল্লীর একেবারে ধারে গিয়ে তার ফেল্টের বুটজোড়াটা বোকার মত সটান আগুনের আঁচের মধ্যে ঠুসে দিয়েছিল । বুইনভস্কি এসে ওকে ঘাড় ধরে তুলে দিয়ে ঠেলাগাড়ির দিকে ঠেলে পাঠাল ।—যা, নচ্ছার—বালি বইগে যা !

ক্যাপ্টেন বুইনভস্কির কাছে ক্যাম্পের কাজও নৌবহরের কাজেরই মত । তোমাকে যা কিছুই করতে বলা হোক, বললে করতেই হবে । গত একমাসে ক্যাপ্টেনের গাল একেবারে চড়িয়ে গেছে, তবু কিন্তু সে ঠিক আগের মতই চালিয়ে যাচ্ছে ।

শেষ পর্যন্ত তিন তিনটে জানলাই বুঁজিয়ে দেওয়া হল । এখন শুধু দরজাগুলো দিয়েই যা আলো আসছে । সেই সঙ্গে ঠাণ্ডাও । নীচের দিকটা যেমন আছে তেমনি রেখে পাভ্লো দরজাগুলোর ওপরের দিক বন্ধ করে দেবার হুকুম দিল—ঘরে ঢুকবার সময় সবাই একটু কুঁজো হয়ে ঢুকবে । তার কথামত কাঠের পরত দিয়ে দরজাগুলোর খানিকটা আটকে দেওয়া হল ।

ইতিমধ্যে তিন লরী মাল খালাস করে দিয়ে গেছে। এখন সমস্যা দাঁড়াল বিনা কপিকলে কী করে ঐসব কংক্রিটের চাঙড়গুলো ওপরে তোলা হবে।

যারা রাজমিস্ত্রির কাজ করে, পাভ্‌লো তাদের ডেকে বলল,--চলো, ওপবে যাই। বলেছে যখন উঠতেই হবে। শুখভ, কিল্‌গাস আর পাভ্‌লো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। একেই তো সিঁড়িটা বেজায় সরু, তার ওপর হাত দিয়ে ধরবার রেলিংটা সেন্‌কা খসিয়ে নেওয়ায় সবসময় দেয়াল ঘেঁষে থাকতে হবে। না হলেই চিৎপটাং। মুশকিল আরও বেড়েছে বরফ পড়ে সিঁড়ির ধাপগুলো গোলাকার হয়ে যাওয়ায়। পা রাখার জায়গা নেই। কী করে ওরা মশলাগুলো ওপরে টেনে তুলবে ?

চাঙড়গুলো কোথায় বসবে ওরা একবার সেই জায়গাটা দেখতে লাগল। কোদাল দিয়ে বরফ চাঁছা হচ্ছে। এই হল সেই জায়গা। যে পর্যন্ত দেয়াল গাঁথা হয়েছে, তার ঠিক মাথায় হাতুড়ি পিটিয়ে বরফের চাঁইটা ভেঙে চুরমার করে তারপর একটা কচি ডাল দিয়ে ঝেড়ে মুছে নিতে হবে।

চাঙড়গুলো ওপরে ওঠানোর কোনটা সব চেয়ে ভাল পন্থা, এবার ওরা তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দিল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে ওরা কর্তব্য স্থিব করে ফেলল। চাঙড়গুলো বয়ে অত উঁচু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার কোনো দরকার নেই। মাটিতে চারজন লোক থাকবে, তারা ভারা-বাঁধা স্তর পর্যন্ত তোল্লা করে উঠিয়ে দেবে; দুজন লোক সেখান থেকে চাঙড়গুলো দোতলার দুজন লোকের হাতে এগিয়ে দেবে। সেগুলো তারা তখন ধরে রাজমিস্ত্রির কাছে পৌঁছে দেবে। তাতেই সবচেয়ে জলদি কাজ হবে।

দোতলার ওপর হাওয়া তত জোরালো নয়, তবে গায়ে যেন কেটে বসে। চাঙড়গুলো বসাতে শুরু করলেই হাওয়া এসে ওদের ছেঁকে ধরবে। গাঁথুনি যতটা হয়েছে ওরা যদি তার পেছনে গা আড়াল করতে পারে, তাহলে কতকটা বাঁচবে ; মন্দ কি, বরং খানিকটা তো গবম গরম ভাব হবে।

শুখভ আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হল। আকাশ একেবারে ধোয়ামোছা ; সূর্য প্রায় মধ্যাহ্নভোজনের জায়গায় এসে গেছে। সত্যি এ এক তাজ্জব ব্যাপার। কাজের মধ্যে সময় এইভাবেই কেটে যায়। শুখভ বহুবার লক্ষ্য করেছে, বন্দীশিবিরে দিনগুলো যেন নেহাৎ হুড়মুড়িয়ে চলেছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখার সময় নেই। কিন্তু তার সাজাখাটার মেয়াদটার কোনো নড়চড় নেই ; যেন যা ছিল তাই আছে—একটুও ছোট হয়নি।

ওরা নীচে নেমে এসে দেখে বাকি সবাই চুল্লীটার চারদিকে গোল হয়ে বসে আছে। একমাত্র বুইনভ্‌স্কি আর ফেতিউকভ সমানে বালি টেনে যাচ্ছে। দেখে পাভলো তো রেগে আগুন। তক্ষুণি আটজনকে সে কংক্রিটের চাঙড় আনতে পাঠাল, দুজনকে সুরকির বাক্সে সিমেন্ট ঢালতে পাঠাল—ওরা করবে শুকনো অবস্থায় বালির সঙ্গে সিমেন্ট মেশানোর কাজ। একজন গেল জল আনতে। আরেকজন গেল কয়লা আনতে।

কিলগাস তার সঙ্গের লোকদের বলল, —চলো বাপসকল, হাতগাড়ির কাজটা সেরে ফেলি।

শুখভ পাভলোকে জিজ্ঞেস করল,—ওদের সঙ্গে হাত লাগাব ?

পাভ্‌লো ঘাড় নেড়ে বলল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও।

তারপর ববফ গলাবার জন্যে একটা ঢাউস টিন আনা হল। তাতে সিমেন্ট মাখার জল হবে। এমন সময় কে একজন বলে উঠল বেলা দুপুর হয়ে গেছে।

শুখভ সায় দিয়ে বলল,—ঠিক বলেছে। সূর্য এখন ঠিক মাথার ওপর.।

ক্যাপ্টেন বুইনভস্কি ফোড়ন কেটে বলল,—সূর্য মাথার ওপর উঠলে এখন দুপুর নয়, বেলা একটা।

শুখভ অবাক হয়ে বলল,—কেন তা হবে ? যাদেরই নাতিপুতি আছে তারাই জানে —সূর্য যখন মাথার ওপর ওঠে তখনই ঠিকদুকুর।

ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল,—ওসব দাদামশায়দের আমলের ব্যাপার। তারপরেব আমলে নতুন হুকুম জারী হয়েছে। ঠিক বেলা একটায় সূর্য থাকে মাথার ওপব।

—হুকুম কে জারী করল ?

—সোভিয়েত সরকার।

ক্যাপ্টেন বুইনভস্কি হাতগাড়িগুলো নিয়ে চলে গেল। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে শুখভের তর্ক করার ইচ্ছে ছিল না। সূর্যও নাকি সরকারী হুকুম মেনে চলে ! তাও কি হয় ?

হাতুড়ি মেরে মেরে শেষ পর্যন্ত চারটে হাতগাড়ি তৈরি হয়ে গেল।

পাভলো দুজন রাজমিস্ত্রিকে ডেকে বলল,—আচ্ছা, ঠিক আছে—এসো আমরা একটু বসে খানিকটা আগুন পুইয়ে নিই। এসো সেনকা, তুমিও এসো—দুপুরে খাওযার পর তোমাকে ওদেব সঙ্গে দেয়াল গাঁথতে যেতে হবে।

অতএব চুল্লীর পাশে বসবার তো তাদের এখন হক্‌ রয়েছে। এখুনি দুপুরের খাওয়ার ছুটি হবে ; তাব আগে দেয়াল গাঁথার কাজে হাত দেবার আর সময় পাওয়া যাবে না। আর যদি একটু বেশী আগে সিমেন্ট মেশানো যায়, ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যাবে।

শেষ পর্যন্ত কয়লাগুলো ভালভাবে ধরে গেলে সমানে আগুনের তাপ পাওয়া যেতে লাগল। তবে সেটা টের পেতে হলে চুল্লীটার কাছ ঘেঁষে বসা দরকার। বাকি ঘরটা যে ঠাণ্ডা সেই ঠাণ্ডাই থেকে গেল।

চারজনই তাদের হাত অনাবৃত করে আঁচের কাছে ধরল।

তাই বলে বুটজুতো পরে যেন কক্ষণো আগুনের কাছে পা বাড়িও না। মনে থাকে যেন। যদি তোমার পায়ে বুট থাকে, আগুনের তাপে চামড়া ফেটে যাবে। আর যদি ভালেঙ্কি হয়, বরফের কুচোগুলো গলে গিয়ে ভিজে যাবে, জুতোর গা থেকে ভাপ উঠবে —ঠাণ্ডার হাত থেকে একটুও পরিত্রাণ পাবে না। আর যদি আগুনের আরও কাছে গিয়ে বসবার চেষ্টা করো ভালেঙ্কি পুড়ে যাবে। তার ফল হবে এই যে, সারা বসন্তকাল তোমাকে

ছ্যাঁদাওয়ালা জুতো পরে থাকতে হবে । ফুটো জুতোর বদলে নতুন জুতো পাবে—সে আশা করো না ।

কিল্‌গাস দুষ্টুমি করে বলল,—শুখভের কী আসে যায় ? আর দাদা, শুখভ তো বেরুল বলে—বাইরে এক পা বাড়িয়েই দিয়েছে ।

একজন আবার তার সঙ্গে আরেকটু জুড়ে দিল,—ঐ যে হে — ঐ খালি পা-টা। সবাই হো-হো করে হেসে উঠল । শুখভ তার তালি-মারা ফেল্টের বুটটা খুলে ফেলে পায়ের পট্টিগুলো সেঁকে নিচ্ছিল ।

—শুখভের দিন তো এখানে ঘনিয়ে এল ।

কিল্‌গাসকে দিয়েছে তেইশ বছরের সাজা । আগে কিন্তু বেশ ছিল ; সকলের ঢালাও সাজা—দশ বচ্ছর । কিন্তু উনপঞ্চাশ সালের পর থেকেই নতুন পর্ব শুরু হল— যে কেউ যাই করে থাকুক—পঁচিশ বচ্ছর ধরে ঘানি টানার ব্যবস্থা । পটোল না তুলে মেরেকেটে দশ বছর টিঁকে থাকা যায়, কিন্তু টিঁকে থাকো তো দেখি পঁচিশ বছর ।

সবাই শুখভকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে—এতে শুখভের বেশ ভাল লাগল । সত্যিই, তার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ; তবে সে যে খালাস পাবে এ বিশ্বাস তার নেই । যুদ্ধের মধ্যে যাদের মেয়াদ ফুরিয়েছিল, তাদের কী দশা হয়েছিল মনে নেই ? ১৯৪৬ সালে নতুন হুকুমনামা যতদিন না এল, ততদিন তাদের জেলে আটক থাকতে হয়েছিল । সুতরাং মূলে যাদের তিন বছরের সাজা হয়েছিল, তাদের আরও পাঁচ বছর বেশী সাজা খাটতে হল । আইন জিনিসটা এমন যে, সরকার তাকে ইচ্ছেমত সোজা উল্টো দুই-ই করতে পারে । সুতরাং তোমার দশ না হয় পুরলো—ওরা তখন বলবে, এই নাও দাদা, আরও দশ । না নেবে তো যাও কালাপানি পার ।

যত যাই হোক, কথাটা মনের মধ্যে মাঝেসাঝে ঝিলিক না দিয়ে পারে না । মনে হলেই দম বন্ধ হয়ে আসে । সমস্ত কিছু সত্ত্বেও জেলের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। লাটাইতে সুতো খুলছে...হায় ভগবান ! বাইরে যখন বার হব, তখন স্বাধীন মানুষ । স্বাধীন !?

ক্যাম্পের একজন পুরনো লোক হয়ে মুখ ফুটে এসব কথা বলা ঠিক নয় । কাজেই শুখভ সেকথা চেপে গিয়ে কিল্‌গাসকে বলল,—তোমার যে পঁচিশ, সে-পঁচিশ গোনবার মোটে চেষ্টাই করো না । পঁচিশ বছর বসে থাকাও যা আর চিম্‌টের বৈঠে মেরে ডিঙি বাওয়াও তাই । তবে আমি যে পুরো আটটা বছর বসে থেকেছি—তাতে ভুল নেই ।

উটপাখির মত তোমরা বালির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকো ; তোমাদের এ সময় নেই যে তোমরা ভাববে কেমন করে জেলে এলে এবং কেমন করেই বা এখান থেকে বেরোবে ।

রেকর্ডে আছে, শুখভের সাজা হয়েছে রাজদ্রোহের জন্যে ; নিজের বিরুদ্ধে নিজেই সে সাক্ষী দিয়েছে । মাতৃভূমির প্রতি বেইমানি করার জন্যে সে জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল এবং পরে যে রুশ বাহিনীতে সে ফিরে এসে যোগ দিয়েছিল,

তার কারণ জার্মান গোয়েন্দা বিভাগ তাকে কিছু কাজের ভার দিয়েছিল । কী ধরনের কাজের ভার—না শুখভ, না তার তদন্তকর্তা—দুজনের একজনও ঠিক ভেবে বার করতে পারেনি । সুতরাং শুধু কাজের ভার—এইটুকু বলেই তারা ছেড়ে দিয়েছিল ।

শুখভ সোজা এঁচে নিল : যদি সই না করি, সাড়ে তিন হাত মাটি । সই করলে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকা যাবে । সুতরাং শুখভ সই করল ।

ব্যাপারটা আদতে ঘটেছিল এই : বিয়াল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে লালফৌজ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে । আকাশ থেকে খাবারদাবার ফেলা হচ্ছে না । কোনো এরোপ্লেন নেই । ক্রমে এমন খারাপ হাল হল যে, লোকে মরা ঘোড়ার পায়ের খুরগুলো কেটে নিয়ে জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেতে লাগল । গোলাবারুদও সব ফুরিয়ে গিয়েছিল । জার্মানরা একেবারে অল্প কয়েকজন করে লোককে বন্দী করছে । এমনি একটা দলে আটকা পড়ে গিয়েছিল শুখভ । বনের মধ্যে দিন দুই বন্দী হয়ে থাকার পর শুখভ আর তার সঙ্গে আরও চারজন লোক সেখান থেকে এক ফাঁকে কেটে পড়ে । ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে জলকাদা ভেঙে, হবি তো হ, নিজেদের এলাকাতেই তারা এসে পৌঁছুল । শুখভের দুজন সঙ্গী মেশিনগানের গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল । আরেকজনও জখম হয়েছিল ; সে মরল পরে । শুখভ আর তার একজন সঙ্গী শুধু এই দুজনই যা বেঁচে গেল । ওরা যদি একটু চালাক-চতুর হত তাহলে বলত : জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম । তাহলেই সব ঠিক হয়ে যেত । তা নয়, বোকার মত ওরা সত্যি কথাটাই বলে ফেলল । বলল,—পালিয়ে চলে এসেছি ।

আর যায় কোথায় ! সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্তাদের গলার স্বর সপ্তমে উঠল ।—পালিয়ে এসেছ ? ইয়ার্কি মারার—, বলে মা তুলে বিশ্রী একটা গালাগাল দিল । যদি ওরা পাঁচজনই বেঁচে থাকত, তাহলে হয়ত পাঁচজনের মুখের কথার সঙ্গে মিলিয়ে ওদের দুজনের জবানবন্দী বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত । ওদের মুখের কথা প্রশ্নকর্তারা বিশ্বাস করলেন না । ওদের বলা হল,—আগে থেকে দুজনে যুক্তি করে পালানোর গপ্পটা বুঝি ফেঁদে রেখেছিলি ? শয়তান কাঁহাকা !

সেন্‌কা ক্লেভ্‌শিন কালা হলেও জার্মানদের হাত থেকে পালাবার কথাটা শুনতে পেয়েছিল । শুনে সে চিৎকার করে বলল,—আমি তিনবার ওদের হাত থেকে পালিয়েছিলাম, তিনবারই ধরা পড়েছিলাম ।

সেন্‌কার ওপর দিয়ে সারাটা জীবন কম ঝড়ঝাপ্টা যায়নি । এমনিতে সে চুপচাপই থাকে । কানে কম শোনে বলে বড় একটা কথাবার্তা সে বলে না । লোকে তার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানে না ; শুধু এইটুকু জানে যে, সেন্‌কা ছিল বুকেনওয়াল্ডে ; সেখানকার গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগ ছিল এবং বিদ্রোহ ঘটানোর জন্যে সে গোপনে সেখানে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করেছিল । জার্মানরা তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় লাঠিপেটা করে ।

কিল্‌গাস ছাড়ল না । শুখভের কথার উত্তরে বলল,—হ্যাঁ, তা আট বছর আছ

বটে—কিন্তু কোথায় ছিলে, চাঁদ ? ছিলে তো সাধারণ ক্যাম্পে । মেয়েমানুষদের সঙ্গে । গায়ে নম্বর লাগাতে হত না । হাড়ভাঙা খাটুনির ক্যাম্পে থাকতে তো বুঝতাম । ওখান থেকে আজ পর্যন্ত কেউ জান নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি ।

—মেয়েমানুষদের সঙ্গে বলছ ? মেয়েমানুষ নয়, গাছের গুঁড়ি...

আগুনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুখভের মনে পড়ে গেল উত্তরাঞ্চলে তার সাত বছরের বন্দীজীবনের কথা । প্যাকিং বাক্স আর রেলের স্লীপার তৈরির জন্যে সমানে তিন বছর তাকে কাঠের গুঁড়ি বইতে হয়েছে । সেখানেও এমনি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলত—রাত্তিরে যখন কাঠ কাটার কাজ হত ! বড়কর্তার হুকুম ছিল—যে দল দিনের ববাদ্দ কাজ বেলাবেলি শেষ করতে পারবে না, রাত্রে জঙ্গলে থেকে তাদের কাজ কবতে হবে ।

রাত দুপুরের আগে কোনোদিনই তারা ক্যাম্পে ফিরতে পারত না ; এদিকে সকাল হতে না হতেই আবার জঙ্গলে ছুটতে হত ।

—নন্‌ন-না ভাই, বলতে গিয়ে শুখভের কথাটা জড়িয়ে গেল ।—আমি বলব, বরং এ জায়গায় খানিকটা শান্তি আছে । দিনের বরাদ্দ কাজ শেষ হোক না হোক, ক্যাম্পে তবু ফেরা যাবে । ওখানকার চেয়ে রেশনের পরিমাণও এখানে কম-সে-কম ছটাকখানেক বেশী । এখানে তুমি হাড় ক'খানা বজায় রাখতে পারো । হলই বা স্পেশাল ক্যাম্প, তাতে হয়েছে কী ! নম্বরগুলো কি তোমাকে কামড়ায় ? নম্বরের তো কোনো ভারই নেই, হে !

ফেতিউকভ ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল,—ফুঃ, এখানে নাকি শান্তি ! দুপুরের খাওয়ার ছুটির আর দেরি নেই বলে সবাই এখন আগুনের কাছ ঘেঁষে এসে বসেছে । ফেতিউকভ বলল,—ঘুমন্ত লোকদের গলা কাটা যায় এখানে । শান্তির জীবনই বটে !

ফেতিউকভের দিকে তর্জনী নেড়ে পাভ্‌লো শাসিয়ে বলল,—লোক নয়, বিভীষণ ।

এটা ঠিক যে, ক্যাম্পে একটা নতুন রকম ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে । একদিন ভোরের ঘণ্টা বাজার সময় দেখা গেল দুজন লোক (সবাই যাদের কর্তৃপক্ষের চর বলে জানে) গলা-কাটা অবস্থায় তাদের বাঙ্কে পড়ে আছে । আর একদিন দেখা গেল একজন সাধারণ কয়েদীরও ঐ অবস্থা । বাঙ্ক ভুল হয়েছিল বোধহয় ? কর্তৃপক্ষের একজন চর তো সাজা দেবার হাজতের অফিসারদের কাছে পালিয়ে গিয়েছে—সেখানে তাকে তালাবন্ধ করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে । অদ্ভুত সব ব্যাপার । সাধারণ ক্যাম্পগুলোতে এমন জিনিস ঘটে না । আর বলতে কি, এ জিনিস এখানেও এই প্রথম ঘটছে ।

আচমকা বিজলী ট্রেনের হুইস্‌ল বেজে উঠল । প্রথমেই পুরোদমে নয়—গোড়ায় একটু ভাঙা ভাঙা মত, যেন গলাটা ঝেড়ে নিচ্ছে ।

দুপুর । দিনের অর্ধেক কাবার । এবার খাওয়ার ছুটি ।

এঃ, ওরা বড্ড গা ঢিলে দিয়ে ফেলেছে । অনেক আগেই ওদের উচিত ছিল খাওয়ার জায়গায় গিয়ে লাইনে দাঁড়ানো । এখানে কাজে আসে এগারোটা ব্রিগেড—দুটো দলের

বেশী একসঙ্গে বসে খাওয়ার জায়গা হয় না ।

তিউরিনের এখনও পাত্তা নেই । পাভ্‌লো একবার চকিতে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল । তারপর বলল,—শুখভ আর গপ্‌চিক,—আমার সঙ্গে এসো । দেখ, কিল্‌গাস —আমি গপ্‌চিককে পাঠালে দলের সবাইকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেও চলে আসবে ।

ওরা উঠতেই সেই জায়গায় অন্যেরা এসে চুল্লীর কাছে বসল । এমনভাবে ওরা চুল্লীটার কাছে এগিয়ে গেল যেন চুল্লীটা কোনো মেয়েমানুষ । ওরা সবাই তাকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে তার গা ঘেঁষে গিয়ে বসল ।

একজন সবাইকে শুনিয়ে বলে উঠল,—সরে এসো ! বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে নেওয়া যাক ।

এ ওর মুখের দিকে চাইল । কই, কেউই সিগারেট ধরাচ্ছে না । হয় কারো কাছে তামাক-টামাক কিছু নেই, নইলে যার আছে সে চেপে যাচ্ছে ।

শুখভ আর গপচিক পাভলোর সঙ্গে বেরিয়ে গেল । গপ্‌চিক ঠিক একটা খরগোশের ছানার মত ওদের পেছন পেছন খর খর করে চলল ।

শুখভ বেরিয়েই বলে উঠল,—ঠাণ্ডা আগের চেয়ে কম । এখন খুব বেশী হলে শূন্য । দেয়াল গাঁথতে খুব খারাপ লাগবে না ।

চাঙড়গুলোর দিকে তারা ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল । বেশ কিছু চাঙড় ডাঁই করা হয়েছে ভারার তক্তায় । কিছু চাঙড় তুলে ফেলা হয়েছে দোতলার ওপর ।

শুখভ চোখ কুঁচকে একবার সূর্যের দিকে তাকাল, বুইনভ্‌স্কির ফতোয়াটা ঠিক কিনা পরখ করবার জন্যে ।

ফাঁকায় এসে বোঝা গেল, হাওয়া তখনও গায়ের ওপর কেটে কেটে বসছে । হাওয়া যেন একথা তাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিতে চাইছিল—ভুলে যেও না হে, এটা জানুয়ারি ।

একটা চুল্লীকে ঘিরে চারদিকে তক্তাপোঁতা ছোট একটা চালাঘর । ফাটা-ফুটোগুলো বুঁজোবার জন্যে মরচে-ধরা লোহার পাত পেরেক দিয়ে আটকানো । ভেতরে পার্টিশন করা—একদিকে রান্নার জায়গা, আরেকদিকে খাওয়ার জায়গা । মেঝেয় পাটাতন নেই ; পা দিয়ে মাটি ঠেসে দেওয়া হয়েছে—ব্যস্‌, আর কিছু নয় । চারদিকে কোথাও গর্ত, কোথাও মাটি উঠে আছে । রান্নার জিনিস বলতে চৌকো চুল্লীটার সঙ্গে সিমেন্ট-করা একটা বড় পাত্র ।

রান্নাঘরের কাজে আছে দুজন লোক—একজন রসুই করে, আরেকজন দেখাশুনো করে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপার । সকালে ক্যাম্প থেকে বেরোবার আগে রান্না করার লোকটাকে বড় ক্যাম্পের পাকশালা থেকে দিনের রেশন দিয়ে দেওয়া হয় । মাথাপিছু হয়ত ছটাকখানেক মকাই ; একেকটি ব্রিগেড ধরলে সেরখানেক, আর এ জায়গায় যত লোক কাজে আসে তাদের সবাইকে ধরলে মোট আঠারো সেরেরও কম হবে । রান্নার লোকটি তাই বলে ক্রোশখানেক রাস্তা নিজে বয়ে নিয়ে যায় না । রেশনের বস্তাটা সে আর কারো

পিঠে চাপায় । তাকে সে অন্যদের ভাগ থেকে নিয়ে খানিকটা বাড়তি খাবার দেয়—নিজে ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে তাও বরং ভাল । জল আনা, কাঠকুটো যোগাড় করা, উনুন ধরানো—কোনোটাই সে নিজে করে না । প্রত্যেকটা কাজই সে কাউকে না কাউকে দিয়ে করিয়ে নেয়—তার বদলে তাদের বাড়তি কিছুটা করে খাবার দেয় । অন্যদের ভাগ থেকেই সে দেয়, কাজেই তার আর দিতে কী ?

নিয়ম হল, সবাইকে খাওয়ার জায়গায় বসে খেতে হবে । খাবার নিয়ে বাইরে যেতে পারবে না । বাটিগুলো আনতে হয় ক্যাম্প থেকে । এখানে যে একটা রাত ফেলে রেখে যাবে, তার জো নেই । কেননা কয়েদী নয় এমন যেসব বাইরেব মজুর এখানে কাজ করতে আসে, তারা বাটিগুলো পেলেই নিয়ে চলে যাবে । কাজেই এখানে একসঙ্গে পঞ্চাশটার বেশী বাটি আনা হয় না । এঁটো বাসনগুলো সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলে আবার তাইতে করে নতুন লোককে খাবার দেওয়া হয় । যে লোকটা বাটিগুলো বয়ে আনে তাকে খানিকটা বাড়তি খাবার দেওয়া হয় । বাটিগুলো ঘরের বাইরে যাতে চলে না যায়, তার জন্যে দরজায় একজনকে দিয়ে পাহারা দেওয়ানো হয় । কিন্তু তা সত্ত্বেও, হয় সে লোকটার পিঠে হাত বুলিয়ে, নয় তার চোখে ধুলো দিয়ে কয়েদীরা বাটিগুলো বাইরে নিয়ে যায়। কাজেই তখন আবার আর কাউকে পাঠিয়ে বাইরের মাঠ-ময়দান থেকে এঁটো বাসনের ডাঁইগুলো আনিয়ে নিতে হয । এমনি করে দশজনের খাবারে ভাগ বসাবার লোক ক্রমেই বেড়ে বেড়ে যায় ।

যে রসুই করে, তার কাজ শুধু হাঁড়িতে খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে তাতে নুন ছড়িয়ে দেওয়া ; চর্বির খানিকটা সে হাঁড়িতে দেয়, খানিকটা নিজে খায় । ভাল চর্বি কখনই কয়েদীদের কপালে জোটে না ; কেবল দুর্গন্ধ বাসি চর্বিটুকু হাঁড়ির মধ্যে যায় । ক্যাম্পের ভাঁড়ার থেকে তাই যতটা বাসি চর্বি দেয়, কয়েদীদের ততটাই লাভ । উনুনে জল যখন ফুটে ওঠে, রাঁধুনী তখন খুন্তি দিয়ে নাড়ানাড়ি কবে । যার ওপর স্বাস্থ্যরক্ষার ভার, তাকে সেটুকুও করতে হয় না । সে দিব্যি গ্যাঁট হযে বসে দেখে । খিচুড়ি হওয়ামাত্র সে-ই প্রথম খেয়ে দেখে—এবং বেশ ঠেসেই খায় । রাঁধুনীও ভর-পেট খেয়ে নেয় । এরপর আসে ডিউটি-ফোরম্যান—একজনই রোজ নয়, যেদিন যার পালা পড়ে । ডিউটি-ফোরম্যানকে দেখে নিতে হয় খিচুড়িটা লোকজনদের পাতে দেবাব মত ঠিক হয়েছে কিনা । ডিউটি-ফোরম্যান পাবে ডবল ভাগ ।

এমনি সময় বাঁশী বাজে । তখন অন্য ফোরম্যানেরা ভেতরে আসে । রান্নার লোকটি খিচুড়ির বাটিগুলো জানলা গলিয়ে হাতে হাতে এগিয়ে দেয় । দেখা যায়, শুধু বাটির তলায় জেগে রয়েছে একটু করে পাতলা জলের মত খিচুড়ি । কেই বা দেখতে যাচ্ছে ওজন, আর কেই বা জিজ্ঞেস করছে বরাদ্দের কতটা পাওয়া গেল না গেল । মুখ খুলেছ কি, গালাগালির চোটে ভূত ভাগিয়ে দেবে ।

ধূ ধূ করছে প্রান্তর ; তার ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে বইছে হাওয়া । গরমের সময় হাওয়াটা থাকে খড়খড়ে শুকনো ; শীতের সময় কনকনে । এখানকার মাটিতে—বিশেষ

করে, কাঁটাতারের রাজত্বে—কিছুই হয় না। এ তল্লাটে ফসলের দানা দেখতে পাবে একমাত্র রুটি রাখার ভাঁড়ারে ; এখানে জই পাকে একমাত্র গুদামঘরে। খেটে খেটে যদি তুমি হাড় কালি করে ফেলো, যদি সাষ্টাঙ্গে পড়ে যাও—তবু মাটি থেকে দাঁতে কুটো-কাটারও কিছু তুমি জোটাতে পারবে না। মুরুব্বিরা যা দেবে, কিছুতেই তার একফোঁটা বেশী তুমি পাবে না। সেটুকুও তুমি পুরো পাচ্ছ না—কারণ, তাতে থাবা বসাবার জন্যে আছে. রান্নার লোকজন, তাদের হাতনুড়কুত এবং কয়েদীদের মধ্যে যারা কর্তাব্যক্তি। তারা বাইরে এসে মারে। ক্যাম্পের ভেতরে বসে মারে। মারে তারও আগে—খোদ মালখানা থেকে। যারা মারে, তারা কিন্তু বড় একটা গতর খাটায় না। তোমার বেলায় অন্য ব্যাপার—তুমি যেমনি গতরেও খাটবে, তেমনি যা দেবে তাই নেবে। জান্‌লা গলিয়ে হাতে বাটি দেবে, পাওয়া মাত্র কেটে পড়বে।

যে যার সে তার।

পাভ্‌লো, শুখভ আর গপ্‌চিক খাওয়ার ঘরের ভেতরে এল। ঘরের ভেতর এমন গিজগিজ করছে লোক যে, টেবিল বা বেঞ্চি কিছুই তাদের চোখে পড়ল না। কিছু লোক খাচ্ছিল বসে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী লোক ছিল দাঁড়িয়ে। ৮২নং ব্রিগেডের লোকেরা বাইরের কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে সকাল থেকে দুপুর গর্ত খুঁড়ছে ; তারাই এসে আগেভাগে জায়গা দখল করে বসেছে। এখন তাদের খাওয়াদাওয়া শেষ, তবু তাদের নড়বার নাম নেই। এমন গরম জায়গা ছেড়ে যাবেই বা কোন্‌ চুলোয় ? লোকে ওদের যাচ্ছেতাই বলে গাল দিচ্ছে ; ওরা কিছু গায়েই মাখছে না। বাইরের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডার চেয়ে ঘরের ভেতরটা ঢের বেশী আরামের।

পাভলো আর শুখভ কোনোরকমে ঠেলেঠুলে ভেতর এল। ওরা এসেছে একেবারে ঠিক সময়ে। একটি ব্রিগেড তখন খিচুড়ির বাটি নিচ্ছে। লাইনে দাঁড়িয়ে আছে আর একটিমাত্র দল। ওদের সহকারী ফোরম্যান জানলার ধারে দাঁড়িয়েছে। বাকি সবাই আমাদের পিছনে।

জানলার ওপাশ থেকে রাঁধুনী লোকটা 'বাটি কোথায় ? বাটি নিয়ে এসো' বলে চেঁচাচ্ছে। লোকজনেরা সঙ্গে সঙ্গে জানলায় বাটি এগিয়ে দিচ্ছে। শুখভও চটপট কিছু বাটি জোগাড় করে জানলার ধারে এগিয়ে দিল—বাড়তি খাবারের আশায় নয়, যাতে পরিবেশনটা একটু তাড়াতাড়ি হয়।

কিছু সাহায্যকারী লোক বাসন ধুতে শুরু করে দিয়েছে। তারাও ভাগে খানিকটা বেশী পাবে।

পাভলোর সামনে যে সহকাবী ফোরম্যানটি ছিল, সে এবার পেতে শুরু করে দিল। পাভলো তার কাঁধের ওপর দিয়ে হাঁক দিল : গপ্‌চিক।

দরজাব কাছ থেকে বলতে শোনা গেল,—এই যে আমি! ছাগশিশুর মত মিষ্টি মিহি গলা।

—ব্রিগেডের লোকজনদের ডাকো!

গপ্‌চিক তক্ষুণি ছুট লাগালো ।

খিচুড়িটা আজ যা হয়েছে এমন আর হয় না—তোফা ! জই দেওয়া হয়েছে যে ! অন্যান্য দিন সাধারণত দুবেলাই মাগারা দেয় ; নইলে কুঁড়ো । কিন্তু জইতে যেমনি পেটও ভরে, তেমনি খেতেও ভাল ।

শুখভ জোয়ান বয়সে তার ঘোড়াগুলোকে জই খাওয়াত । তখন সে স্বপ্নেও ভাবেনি কোনোদিন একমুঠো জইয়ের জন্যে তাকে হামলাতে হবে ।

—বাটি কোথায় ? বাটি নিয়ে এসো ! জানলায় হাঁক শোনা গেল ।

এবার ১০৪নং ব্রিগেডের পালা । সহকারী ফোরম্যান পাভ্‌লো ফোরম্যানের 'ডবল ভাগ' নিয়ে জান্‌লা ছেড়ে চলে গেল ।

এটাও যায় মুনিষদেবই ভাগ থেকে । তবে এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করে না । প্রত্যেক ফোরম্যানের জন্যেই একটা করে বাড়তি বরাদ্দ থাকে ; হয় সে নিজে খায়, নইলে আর কাউকে দিয়ে দেয় । তিউরিন দিত পাভ্‌লোকে ।

এবার শুখভের কাজ হল *ঠেলেঠুলে* কোনোরকমে একটা টেবিলে গিয়ে জায়গা দখল করা । ধুঁকে-পড়া দুজন লোককে লেঙ্গি মেরে সরিয়ে, একজনকে দয়া করে সরে যেতে বলে, শুখভ একটা টেবিলের খানিকটা জায়গা খালি করে নিল । বারোটা বাটি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসবে ; তার ওপর ছ'টা ; তারপর সেই ছ'টার ওপর আরও দুটো । এবার পাভলোর কাছ থেকে শুখভ বাটিগুলো নেবে ; এক-দুই করে তাকেও গুনতে হবে এবং সেইসঙ্গে দেখতে হবে কেউ যেন একটা বাটিও হাতিয়ে নিতে না পারে । হুঁশিয়ার থাকতে হবে—যেন কারো হাত লেগে বাটিগুলো উল্টে না যায় । ঘেঁষাঘেঁষি টেবিলে কেউ খাওয়া শেষ করে হুড়মুড় করে বেঞ্চি ছেড়ে উঠছে, কেউ-বা বেঞ্চিতে পা গলিয়ে দিয়ে বসছে খেতে । শুখভকে নজর রাখতে হচ্ছে টেবিলে বাইরের কেউ যেন তাদের জায়গায় হস্তক্ষেপ না করে । এইও, কার বাটি থেকে খাওয়া হচ্ছে ? আমাদেরটা থেকে নাওনি তো !

জানলার ওপার থেকে রান্নার লোকটি গুনতে লাগল, দুই চার, ছয় ! একেবারে দুটো দুটো করে সে এগিয়ে দিচ্ছে । তাতে গোনাব ব্যাপারে ভুল হওয়ার ভয় কম ।

পাভ্‌লো জানলায় দাঁড়িয়ে য়ুক্রেনীতে বিড় বিড় করে সেইসঙ্গে গুনে চলল,—দুই, চার, ছয় । শুখভকে সে দুটো দুটো করে বাটি দিচ্ছে, শুখভ সেগুলো টেবিলে রেখে দিচ্ছে । মুখে কিছু না বললেও শুখভ মনে মনে ঠিক গুনে যাচ্ছিল ।

—আট, দশ ।

গপচিক ব্রিগেডের লোকদের আনতে এত দেরি করছে কেন ?

—বাবো, চোদ্দ—গোনা চলতে লাগল ।

রান্নাঘরে বাটি নেই আর । পাভলোর ঘাড় আর মাথার ওপর দিয়ে শুখভ রাঁধুনীর দুটো হাত দেখতে পাচ্ছিল—জানলার ওপর দুটো বাটি রেখে হাত দিয়ে সে ধরে রয়েছে—বাটিদুটো হাতছাড়া করবে কি করবে না ভাবছে । যে বাসন মাজছে, তাকে গালাগাল

দেবার জন্যে নিশ্চয় ও ঘুরে দাঁড়িয়েছে । ঠিক সেই সময় একগাদা এঁটো বাসন জানলা গলিয়ে তার দিকে এগিয়ে দেওয়া হল । সে তখন বাটি থেকে হাত সরিয়ে এঁটো বাসনগুলো ফিরিয়ে নিল ।

শুখভ তার হাতের বাটিগুলো টেবিলে রেখে দিয়ে একটা বেঞ্চিতে লাফিয়ে উঠে জানলার দুটো বাটিই হস্তগত করল । তারপর, যেন রান্নার লোকটিকে বলছে না , বলছে যেন পাভ্‌লোকে—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে গলা নামিয়ে গুনতে গুনতে বলল,—চোদ্দ ।

রান্নার লোকটি চেঁচিয়ে উঠল,—থামো, থামো ! কোথায় নিয়ে চললে ?

পাভ্‌লো বলল,—আমাদের লোক ও ! আমাদের লোক ।

—তোমাদের লোক ! কিন্তু ও যে হিসেব গুলিয়ে দিল ।

পাভ্‌লো কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে বলল,—চোদ্দ হয়েছে । পাভ্‌লো নিজে হলে খাবার চুরির মত অতটা নিম্নপর্যায়ে নামতে পারত না । কারণ, সহকারী ফোরম্যান হিসেবে তার একটা ইজ্জৎ বলে জিনিস আছে । শুখভ যা বলেছে, পাভ্‌লো শুধু তার প্রতিধ্বনি করেছে । দোষটা সে শুখভের ঘাড়ে চাপাতে পারবে ।

রান্নার লোকটি চটে উঠে বলল,—চোদ্দ তো আগেই বলেছি !

শুখভ গলা চড়িয়ে বলল,—বলেছ তো কী হয়েছে ! তুমি তো দাওনি । হাত দিয়ে ধরে ছিলে ! বিশ্বাস না হয়, নিজে গুনে দেখে নাও । টেবিলেই তো সব আছে ।

রান্নার লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে শুখভ দেখল সেই এস্তোনিয়ার দুই মানিকজোড় আসছে । চট্ করে শুখভ তাদের হাতে দুটো বাটি ধরিয়ে দিল । তারপর এক ফাঁকে টেবিলের কাছে গিয়ে দেখে নিল বাটিগুলো সব আছে কিনা—বলা যায় না, কেউ যদি ওখান থেকে বাটি চুরি কবে তো ধরবার জো থাকবে না ।

জানলার ফাঁক দিয়ে রান্নার লোকটির রক্তবর্ণ মুখ দেখা গেল ।

কড়াভাবে সে জিজ্ঞেস করল,—বাটিগুলো কোথায় ?

শুখভ গলা চড়িয়ে বলল,—আজ্ঞে মশাই, এই যে— । সামনে আড়াল করে একজন দাঁড়িয়েছিল, শুখভ তাকে 'আহা, সরে যাও না' বলে ঠেলে সরিয়ে দিল । মাথার বাটি দুটো তুলে শুখভ দেখিয়ে বলল,—এই দুই । আর—এই দেখ, ঠিকঠাক চারটে করে তিন সার—গুনে দেখ ।

জানলার ফুটোটা এইটুকু । এত ছোট যে, তার ভেতর দিয়ে রান্নাঘরে উঁকি মেরে হাঁড়িতে কতখানি খাবার থাকল এটা বোঝা কয়েদীদের পক্ষে সম্ভব নয় । সেই ছোট্ট ফুটোটা দিয়ে রান্নার লোকটা সন্দেহের চোখে জুল্ জুল্ করে তাকিয়ে বলল,—তোমাদের দলের লোকজন আসেনি এখনও ?

পাভ্‌লো ঘাড় নেড়ে বলল,—না, আসেনি ।

পাভলো হেঁকে বলল,—এইতো, বলতে বলতে সব হাজির ।

রান্নার লোকটি চটেমটে বলল,—আসেনি তো সাততাড়াতাড়ি খাবারের বাটিগুলো নিচ্ছ কী জন্যে ?

পাভ্‌লো হেঁকে বলল,—এই তো, বলতে বলতে সব হাজির—

ক্যাপ্টেন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল । তার হাঁকডাক সকলেরই কানে গেল। এমনভাবে কথা বলছিল, যেন সে এখনও জাহাজেরই ক্যাপ্টেন,—কী হচ্ছে ? এখানে এত ভিড় কিসের ? খাওয়া হয়ে থাকলে যাও সব, কেটে পড়ো । অন্যদের বসতে দাও ।

রান্নার লোকটি আরও খানিকটা বিড়ির বিড়ির করল । তারপর টান হয়ে দাঁড়াল। জানলায় আবার তার দুটো হাত দেখা গেল ।

—ষোল, আঠারো...

এবং শেষের বাটিতে ডবল ভাগ দিয়ে বলল,—এই হল তেইশ । ব্যস । এবার পরের ব্রিগেড ।

১০৪নং ব্রিগেডের লোকজন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল । দ্বিতীয় টেবিলে যারা খেতে বসেছিল, শুখভ তাদের মাথার ওপর দিয়ে নিজেদের দলের লোকদের হাতে বাটিগুলো চালান করে দিল ।

গরমকালে প্রত্যেক বেঞ্চিতে পাঁচজনে হেসেখেলে বসতে পারে । কিন্তু শীতের সময় গায়ে থাকে মোটা জাব্বাজোব্বা—তখন পাশাপাশি চারজন করে বসতেও কষ্ট হয় । বসলেও খাওয়া কঠিন ।

দুটো বাড়তি বাটি আছে ; শুখভ ধরেই রেখেছিল দুটোর মধ্যে অন্তত একভাগ সে পাবে । সময়মত যে বাটিটা পেয়েছে, সেটা তাই চটপট শেষ করবার কাজে সে লেগে গেল । ডান হাঁটুটা পেটের কাছে এনে জুতোর মাথা থেকে 'উসৎ-ইঝমা, ১৯৪৪' লেখা চামচেটা বার করে শুখভ মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলে বাঁ বগলে রাখল । তারপর চামচেটা দিয়ে খিচুড়ির বাটিটার ধার বরাবর নাড়তে লাগল ।

এখন হল একাগ্রচিত্তে খাওয়ার সময়—বাটির তলা থেকে পাতলা খিচুড়ির একটা পর্দা উঠিয়ে নিয়ে সুন্দরভাবে মুখের মধ্যে রাখবে, তারপর জিভ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোল্লা পাকাতে থাকবে । কিন্তু শুখভেব খেয়ে শেষ করার তাড়া ছিল ; তার খাওয়া হয়ে গেছে এটা যাতে পাভ্‌লো দেখতে পেয়ে তাকে আরেক ভাগ খিচুড়ি দেয় । এস্তোনিয়ানরা যখন ঘরে ঢোকে, ফেতিউকভও তাদের সঙ্গে ছিল । শুখভকে দু' বাটি খিচুড়ি মেরে দিতে সে দেখেছে । ফেতিউকভ পাভলোর মুখোমুখি বসে খাচ্ছিল । কেবলি সে বাড়তি ভাগগুলোর দিকে নজর দিচ্ছিল, যাতে পাভ্‌লো দয়াপরবশ হয়ে আরও এক-আধভাগ তাকে দেয় ।

রোদে-পোড়া সোমত্ত চেহারা পাভ্‌লোর । সে বেশ নির্বিকারভাবে তার ডবল খানা শেষ করল । তার মুখ দেখে বোঝার জো নেই আশপাশে কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে কিনা কিংবা আদৌ তার মনে আছে কিনা যে, তার হাতে দুটো বাড়তি খাবারের ভাগ আছে ।

শুখভ তার খিচুড়িটুকু শেষ করল। দু' বাটি খিচুড়ি খাবে, এটা তার সমস্ত মনপ্রাণ এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, মোটে একটা বাটিতে তার ক্ষিধে গেল না। কাজেই তখন ভেতরের পকেট থেকে সে একটা সাদা ন্যাকড়ার পুঁটলি খুলে তা থেকে একটুকরো পাঁউরুটি বার করে পাঁউরুটিব টুকরোটা দিয়ে সযত্নে বাটির পাশ আর তলা চেঁছেপুঁছে নিল। পাঁউরুটির গা থেকে খিচুড়িটুকু জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে আবার সে বাটিটা চাঁছতে পুঁছতে লেগে গেল। শেষকালে মাজাঘষা পরিষ্কার চেহারা দাঁড়াল বাটিটার —শুধু ওপর-ওপর রংটা যা একটু চাপা। যে লোকটা পাত পরিষ্কার করছিল, শুখভ তার হাতে বাটিটা তুলে দিল এবং টুপিটা মাথায় না চাপিয়ে ঠায় বসে রইল।

বাটিদুটো শুখভই সরিয়েছে বটে, কিন্তু সহকারী ফোরম্যানই হল বাটিদুটোর মালিক।

আরও খানিকক্ষণ কাটল; পাভলো নির্বিকারভাবে খেয়ে চলেছে। এদিকে শুখভ অশান্তিতে ছটফট করছে। পাভলো খাওয়া শেষ করে বাটিটা জিভ দিয়ে চাটল না; চামচেটা চেটেপুঁছে সরিয়ে রেখে কপালে আর বুকের দুপাশে আঙুল ঠেকিয়ে ক্রসচিহ্ন করল। তারপর বাকি চারটে বাটির মধ্যে দুটো বাটি হাত দিয়ে আলতোভাবে ছুঁল।

—ইভান দেনিসোভিচ। একটা তুমি নাও, আর একটা ৎসেজারকে দিয়ে এসো।

ৎসেজারকে একটা বাটি দিয়ে আসতে হবে শুখভ জানত। কী এখানে, কী ক্যাম্পে —বারোয়ারী খাওয়ার জায়গায় গিয়ে খেতে ৎসেজারের আত্মসম্মানে লাগত। কিন্তু জানলেও, পাভলো যখন একসঙ্গে দুটো বাটিতে হাত রেখেছিল, সঙ্গে সঙ্গে শুখভের বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠেছিল—পাভলো কি তাহলে দুটো বাটিই শুখভকে দিচ্ছে? পাভলোর কথা শুনে শুখভ একটু ধাতস্থ হল।

শুখভ এবার তার যথাবিহিত স্বত্বটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বেশ মন লাগিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল। নতুন ব্রিগেডের লোকজনেরা তাকে যে পেছন থেকে ঠেলাঠেলি কবছিল, সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র হুঁশ ছিল না। পাছে বাড়তি অন্য ভাগটা ফেতিউকভ পেয়ে যায়, এটাই ছিল তার একমাত্র দুশ্চিন্তা। পবের পাত কুড়োবার কাজে ফেতিউকভ একেবারে সিদ্ধহস্ত—কিন্তু চুরি করতে বলো, ওর সে সাহস নেই।

টেবিলের ওপাশে কাছাকাছি বসেছিল বুইনভস্কি। অনেক আগেই ওর খিচুড়ি খাওয়া হয়ে গেছে; বাড়তি যে কিছু আছে, তা সে জানতও না। খাওয়া শেষ করে গরম ঘরটার মধ্যে বসে থাকতে বুইনভস্কির বেশ আরাম লাগছিল। উঠে পড়ে বাইরের ঠাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়াবে কিংবা নিরুত্তাপ ছাউনির মধ্যে ঢুকবে—সেটুকু মনের জোর বুইনভস্কির তখন ছিল না। একটু আগে যাদের সে বাজখাঁই গলায় খেদিযেছিল, তাদেরই মত বেআইনীভাবে সে জায়গা জুড়ে বসে রইল, অথচ অন্য ব্রিগেডের নতুন লোকেরা বসতে জায়গা পেল না। বুইনভস্কি এখানে খুব বেশিদিন আসেনি—এখনও এখানকার সাধারণ কাজের সঙ্গে নিজেকে সে রপ্ত করে নিতে পারেনি। বুইনভস্কি জানতে পারত না বটে, কিন্তু এই ধরনের কয়েকটি মুহূর্তই তাকে নৌবহরের একজন জাঁদরেল চোখা অফিসার

থেকে আস্তে আস্তে বদলে ধড়িবাজ গদাইলস্কর কয়েদীতে পরিণত করে ফেলছিল। এই গয়ংগচ্ছ ভাবখানার জোরেই পঁচিশটা বছর সে জেলের ঘানি টেনে যেতে পারবে।

এর মধ্যেই বুইনভস্কিকে উঠে যাবার জন্যে লোকে চেল্লাচিল্লি ঠেলাঠেলি করতে শুরু করে দিয়েছে।

পাভ্‌লো বলল,—ক্যাপ্টেন! বলি, ও ক্যাপ্টেন।

বুইনভ্স্কি যেন ঘোরের মধ্যে ছিল। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

পাভলো কোনোরকম জিজ্ঞেসপত্তর না করেই ওর হাতে আরেক বাটি খিচুড়ি তুলে দিল।

বুইনভস্কির চোখ কপালে উঠল। খিচুড়ির দিকে সে এমনভাবে তাকিয়ে থাকল যেন খুব একটা আজব চিজ.।

পাভ্‌লো ওকে সাহস দিয়ে বলল,—নাও, ধরো! বলে শেষের বাটিটা ফোরম্যানের জন্যে নিয়ে পাভলো চলে গেল।

ক্যাপ্টেনের ঠোঁটের ফাঁকে একটু সলজ্জ হাসি ফুটে উঠে তক্ষুণি মিলিয়ে গেল। প্রায়ই সে ইউরোপের চারধারে, উত্তরের সমুদ্রপথে টহল দিয়ে বেড়িয়েছে—নৌবহরের সেই ক্যাপ্টেন খিচুড়ির বাটির ওপর মহানন্দে ঝুঁকে পড়েছে—তাও জলেব মত পাতলা জইয়ের খিচুড়ি, তাতে একটুও চর্বি পড়েনি।

ফেতিউকভ উঠে যাবার আগে শুখভ আর বুইনভস্কির দিকে কটমট কবে তাকিয়ে গেল।

শুখভকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তাহলে শুখভ বলবে, ক্যাপ্টেনকে দেওয়াটা ভাল কাজ হয়েছে। বেঁচে থাকার ঘাঁতঘোঁতগুলো জেনে নিতে বুইনভস্কির আরো কিছুদিন সময় লাগবে। এখনও পর্যন্ত সে জানেই না কিভাবে বেঁচে থাকতে হয়।

শুখভের এমন কি ক্ষীণ একটা আশাও ছিল—ৎসেজার হয়ত তাকে নিজের ভাগটা দিয়ে দেবে। না দেওয়াই সম্ভব ; কেননা গত দু' সপ্তাহ ওর বাড়ি থেকে কোনো খাবারদাবারই আসেনি।

দ্বিতীয় দফায় খাওয়া শেষ করে শুখভ ফের প্রথমবারেরই মত বাটিটার তলা আব পাশগুলো রুটির ছালটা দিয়ে সযত্নে চেঁছেপুঁছে নিয়ে জিভ দিয়ে চেটে নিল। শেষ পাতে রুটির ছালটা মুখে পুরে দিল। তারপব ৎসেজারেব জুড়িয়ে জল হয়ে যাওয়া খিচুড়ির বাটিটা হাতে নিয়ে উঠে পড়ল।

দরজায় যে লোকটা পাহারা দিচ্ছিল, শুখভের হাতে বাটি দেখে সে আটকাল। 'অফিসে যাচ্ছি' বলে তাকে কনুই দিয়ে সরিয়ে শুখভ বেরিয়ে গেল। গুমটির কাছে অফিসের চালাঘব। সকালবেলার মত চিমনি দিয়ে গলগলিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। একজন ফালতু আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। তাকে আবার চিঠিচাপাটি দিয়ে-আসা নিয়ে-আসার কাজও করতে হয়। ঘণ্টা হিসেবে ওর কাজ। তবে অফিসের চুল্লীতে যত ইচ্ছে কাঠকুটো

জ্বালানো যায় ।

বাইরের দরজাটা খুলতেই ক্যাঁ-চ করে শব্দ হল । তারপর আরেকটা দরজা ; রন্ধ্রগুলো দড়ির কিংনি দিয়ে মোক্ষম করে আঁটা । শুখভ ভেতরে যেতেই বাইরের একরাশ ঠাণ্ডা ধোঁয়া হুশ করে ঢুকে পড়ল । শুখভ চটপট দরজাটা বন্ধ করে দিল । তার ভয় হল, এখুনি না কেউ খেঁকিয়ে ওঠে,—এইও, মাথামোটা ! বন্ধ কর দরজা ।

অফিসের ভেতরটা হামামের মত গরম । জানলার গায়ে গলন্ত বরফ ভেদ করে রোদ্দুর আনন্দে আটখানা হয়ে খেলা করছে—বিজলী স্টেশনের মাথার ওপর তার যেরকম শত্রুতাব ভাব ছিল, সে ভাব একেবারেই নেই । ৎসেজারের পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠে সেই রোদের ছটায় যেন মন্দিরের ধুপধুনোর মত দেখাচ্ছে । চুল্লীতে সারাক্ষণ গনগনে আঁচ । শালারা কিরকম বেধড়ক কাঠ পোড়াচ্ছে, দেখ ! চুল্লীর নলগুলো পর্যন্ত লাল হয়ে তেতে উঠেছে ।

এমন গরম জায়গায় এক মিনিটও কেউ যদি বসে, ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে আসবে ।

অফিস-বাড়ির দুটো কামবা । দ্বিতীয় ঘরটা নির্মাণকাজের তত্ত্বাবধায়কেব । মাঝের দরজাটা ভাল করে বন্ধ করা ছিল না বলে ঘরের ভেতর থেকে তত্ত্বাবধায়কের গলার স্বর ভেসে আসছিল,—মজুরি আর বাড়ির মালমশলার খাতে যা বরাদ্দ ছিল, তার ওপর আমাদের বাড়তি খরচ হয়ে গেছে । সিমেন্টের চাঙড়গুলোর কথা বাদই দিলাম—কিন্তু দামী দামী সব তক্তা কেটে তোমাদের লোকজনেরা ছাউনির মধ্যে আগুন পোহাচ্ছে । আর তোমরা নাকে সরষেব তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছ । ক'দিন আগে তোমাদের লোকজনেরা প্রচণ্ড হাওয়ার মধ্যে মালগুদামের কাছে সিমেন্ট খালাস করেছে । সেখান থেকে খোলা অবস্থায় দশ কদম দূরে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে গেছে । ফলে কী হয়েছে ? না, গোটা এলাকায় এক হাঁটু সিমেন্ট জমে গেছে । আর লোকগুলো ভূতের মত চেহারা নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। জিনিসের কিরকম অপচয়, একবার ভেবে দেখ ।

শুনেই বোঝা যায়, ও ঘরে বৈঠক চলছে । নিশ্চয় তাতে ছোট মাতব্বরেরা আছে ।

দরজার কাছে এককোণে একজন ফালতু টুলের ওপর বসে ঢুলছে । আরও খানিকটা দূরে খুঁটির মত বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে শকুরোপাতেস্কো—ব-২১৯ নম্বর কয়েদী । জানলা দিয়ে সে নজর রাখছে যেন কেউ তার পাটাগুলো টুক করে উঠিয়ে নিয়ে না যায় । কিন্তু মাথার ওপর চাল-ছাওয়ার কাগজগুলো যে হাওয়া হল—তুমি দেখতে পেলে না, চাচা ?

দুজন খাতাঞ্চি—দুজনেই কয়েদী—চুল্লীর ওপর রুটি টোস্ট করছিল । তার দিয়ে ওরা বেশ একটা ধরার ব্যবস্থা করে নিয়েছে যাতে না পোড়ে ।

ডেস্কের ওপর আড় হয়ে ৎসেজার পাইপ টানছিল । শুখভের দিকে পেছন ফিরে ছিল বলে শুখভকে দেখতে পায়নি । ৎসেজারের মুখোমুখি হয়ে বসেছিল খ-১২৩ নম্বর, আদালতে যার বিশ বছরের সাজা হয়েছে । বুড়ো হলেও তার বেশ গাঁটাগোট্টা

চেহারা। বসে খিচুড়ি খাচ্ছিল।

ৎসেজার মিহি গলায় থেকে থেকে বলছিল,—আজ্ঞে, না মশাই—আপনি যদি বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখেন, তাহলে আপনাকে মানতেই হবে আইজেনস্টাইন একজন যুগান্তকারী প্রতিভাধর পুরুষ। 'ভয়ঙ্কর সেই ইভান' ছবিতে কি তার পরিচয় পাননি? ওপরিচনিকদের সেই নাচ! ক্যাথিড্রালের সেই দৃশ্য!

খ-১২৩ চটে গিয়েছিল। মুখের সামনে চামচেটা ধরে বলল,—ওসব চমকসুন্দর! কচলে কচলে শিল্পের আর কিছু রাখেনি। দৈনন্দিন মাছভাতের বদলে মশলাদার মোগলাই ব্যাপার। তাও কী! না, তাতে একেবারে জঘন্যতম রাজনৈতিক মত তুলে ধরা হয়েছে—স্বৈরতন্ত্রের জয়গান করা হয়েছে। তিন পুরুষের রুশ মনীষাকে এর ভেতর দিয়ে ঝাঁটা মারা হয়েছে।

লোকটা খেয়ে চলেছে, কিন্তু খাওয়ার দিকে কোনোই মন নেই—ওভাবে খেলে খাওয়াটা কক্ষনো গায়ে লাগে না।

—ওভাবে না দেখিয়ে উপায়ই বা কী ছিল?

—এবার পথে এসো। উপায় কী ছিল? তাহলে আর যুগান্তকাবী প্রতিভা-টতিভা—ওসব কথা বলো না। সোজা বলো, লোকটা ছিল পা-চাটা। মনিব যা বলেছে, ল্যাজ নীচু করে তাই শুনেছে। বড় প্রতিভা যাদের, তারা কখনও দমনপীড়নকারী শাহানশাদের রুচি অনুযায়ী নিজেদের দেখবার ধরন পালটায় না।

উঁচুদরের আলোচনা চলছে। এর মধ্যে কথা বলতে যাওয়া মানেই আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটানো। শুখভের সাহস হল না। কিন্তু সেই বা আর কাঁহাতক খামাখা দাঁড়িয়ে থাকে? এইসব ভেবে শুখভ বার দুই গলা খাঁকারি দিল।

ৎসেজার এপাশে ফিরে শুখভের দিকে একবারও না তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে তার খিচুড়ির বাটিটা এমনভাবে টেনে নিল—যেন খিচুড়ির বাটিটা আপনি হাওয়ায় ভেসে এসেছে।

—কিন্তু এও জেনে বেখে দিন—শিল্প জিনিসটা 'কী' নয়, শিল্প হল 'কেমন'।

খ-১২৩ আরেকবার হাত দিয়ে টেবিলে ঘা মেরে জবাব দিল,—যান মশাই, শিল্প যদি আমার মধ্যে সুভাব না জাগাল—তাহলে আপনি আপনার 'কেমন' নিয়ে জাহান্নামে যান।

খিচুড়ির বাটিটা দেবার পর শুখভ যতক্ষণ ইজ্জত বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। বলা যায় না, শুখভকে হয়ত খানিকটা তামাক নেবার জন্যে বলতে পারে। কিন্তু শুখভকে ৎসেজারের নজরেই পড়ল না।

কাজেই শুখভ গুটি গুটি যে রাস্তায় এসেছিল সেই রাস্তায় হাঁটা দিল।

বাইরে তেমন ঠাণ্ডা নেই। দেয়াল গাঁথতে এখন খুব একটা কষ্ট হবে না।

শুখভ রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। যেতে যেতে বরফের ওপর ইস্পাতের একটা ফলা দেখতে পেল। বোধহয় আলগা হয়ে ছিল, কোনো কিছু থেকে খসে পড়েছে।

জিনিসটা তার এক্ষুণি কোনো কাজে লাগবে না। কিন্তু কোন্ জিনিস কখন কাজে লাগে আগে থেকে কিছু বলা যায় না। কাজেই কুড়িয়ে নিয়ে শুখভ সেটা প্যান্টের পকেটে রেখে দিল। বিজলী স্টেশনে গিয়ে ওটা লুকিয়ে রেখে দিতে হবে। বড়লোক হওয়ার চেয়ে মিতব্যয়ী হওয়া ভাল।

বিজলী স্টেশনে গিয়ে শুখভের পয়লা কাজই হল লুকোনো কর্নিকটা বার করা। কর্নিকটা নিয়ে পেছনে দড়ির কোমরবন্ধে গুঁজে রাখল। তারপরেই সে মেশিনঘরের দিকে ছুটল।

বাইরের রোদে এতক্ষণ থাকার পর ঘরে ঢুকে কেমন যেন অন্ধকার-অন্ধকার লাগতে লাগল; বাইরের চেয়ে ঘর তেমন গরম বলেও বোধ হল না। তাছাড়া স্যাঁৎসেঁতে।

হয় শুখভের বসানো গোল চুল্লীটাকে ঘিরে, নয় যেখানে শুকোবার জন্যে রাখা বালি থেকে ভাপ উঠছে, তার কাছাকাছি তামাম লোক ভিড় করে রয়েছে। কিছু লোক জায়গা না পেয়ে গিয়ে বসেছে সুবকির বাক্সের এক ধারে। ফোরম্যান তিউরিন চুল্লীর কাছ ঘেঁষে বসে তার খিচুড়ির বাটিটা শেষ করছিল। তার ঠাণ্ডা খিচুড়ি চুল্লীতে বসিয়ে পাভ্‌লো গরম করে দিয়েছে।

ঘরের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন চলেছে। সকলেরই খুব খোশমেজাজ। লোকপরম্পরায় চুপি চুপি শুখভকে ওরা সুখবরটা জানিয়ে দিল। ফোরম্যান ভালভাবেই কাজের কোটা ছাপিয়ে গেছে। তিউরিন খুব ডগমগ হয়ে ফিরেছে।

কাজটা কোত্থেকে গজালো, কাজটাই বা কী—সেসব তিউরিন জানে। আজ সকালবেলাকার কথাটাই ধরো না কেন—কাজ কী হয়েছে? ঘোড়ার ডিম। চুল্লী বসানো কিংবা মাথা গোঁজার ঠাঁই করা—এর কোনোটার জন্যেই কোনো পাওনা হয় না। যা হয়েছে তা নিজেদের জন্যে, ইমারতের কাজ হিসেবে নয়। কিন্তু খাতায় কিছু একটা বাবদে লিখতে হয়েছে। সম্ভবত ৎসেজার খাতা লেখার ব্যাপারে তিউরিনকে সাহায্য করেছে। নইলে তিউরিন কি আর এমনি এমনিই ৎসেজারকে এত খাতির করে?

কোটা ছাপিয়ে গেছে—তার মানে পাঁচটা দিন ভাল রেশন মিলবে। না, ঠিক পাঁচ নয়—চার দিন বলাই ভাল। ভাল এবং আনাড়ি নির্বিশেষে পুরো ক্যাম্প যাতে প্রতিশ্রুত ন্যূনতম রেশন পায়, তার জন্যে খোদ অফিসাররাই একটা দিনের রেশন মেরে দেবে। এতে হয়ত ক্ষুণ্ন হওয়া উচিত নয়; কারণ, সকলেই পাবে সমান ভাগ। কিন্তু ওরা যে আমাদের পেট কেটে নিজেদের খরচ বাঁচায়। ঠিক আছে, কুছপরোয়া নেই—কয়েদীদের পেটে সব কিছুই সয়। আজকের দিনটা যো-সো করে চালিয়ে নেব, তারপর কাল না হয় খাওয়া যাবে।

যে দিনটা থাকে প্রতিশ্রুত ন্যূনতম খোরাকীর দিন, সেদিন চোখে এই স্বপ্ন নিয়ে সবাই ঘুমোতে যায়।

কিন্তু তারপর তোমার কাছে এই হিসেবটা ধরা পড়ে—খাটছ পাঁচদিন, কিন্তু খাচ্ছ চারদিন ।

দলের কারো মুখে রা নেই । যার কাছে এতটুকুও ধূমপানের জিনিস আছে, তাই ধরিয়ে সে চুপচাপ টানছে । আবছা আলোয় ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে সবাই আগুনের দিকে চেয়ে আছে । সকলে মিলে যেন একই পরিবার । চুল্লীর কাছে বসে ফোরম্যান তিউরিন জনকয়েককে একটা গল্প বলছিল । সবাই কান খাড়া করে শুনছিল । তিউরিন এমনিতে কথা বলে কম । কাজেই তার গল্প শুরু করার মানেই হল তার মেজাজটা খুব ভাল আছে ।

আন্দ্রেই প্রোকোফিচ তিউরিন । টুপি পরে খেতে না পারার দলে তিউরিনও পড়ে । মাথায় টুপি না থাকলে তিউরিনকে বুড়ো দেখায় । অন্য সবার মতই তিউরিনের চুল কদমছাঁট করা—কিন্তু তবু চুল্লীর মিটমিটে আলোতেও পরিষ্কার দেখা যায় শুখভের মাথার অনেকটাই বেশ সাদা হয়ে এসেছে ।

...ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডারকে দেখলেই আমার হাঁটু কাঁপত, আর চেয়ে দেখি আমার সামনে স্বয়ং রেজিমেন্টের কমাণ্ডার । আজ্ঞা করুন, অধীন লালফৌজের তিউরিন ।

কমাণ্ডার তাঁর হিংস্র ভুরুর নীচে থেকে আমার দিকে কটমট করে চাইলেন । —তোমার পুরো নাম ?

—আমি বললাম ।

—জন্ম সাল ? কোন সালে জন্মেছি বললাম । এটা বলছি তিরিশ সালের কথা । আমার তখন বাইশ বছর বয়েস—একেবারেই বালখিল্য ।

—ভাল, তা তিউরিন, আজ কী উদ্দেশ্যে ?

—শ্রমিক শ্রেণীর সেবার জন্যে । বলতেই কমাণ্ডার ক্ষেপে গিয়ে দুহাত দিয়ে টেবিলে দড়াম করে ঘুসি মারলেন ।

—তুমি কাজ করছ শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে ! নিজে কী তুমি, বদমায়েশ কাঁহাকা ?

আমি ভেতরে ভেতরে রাগে ফুলছিলাম । কিন্তু নিজেকে সামলে রাখলাম ।—পদাতিক বাহিনীর গোলন্দাজ, প্রথম শ্রেণী । উঁচুদরের সামরিক আর রাজনৈতিক...

কমাণ্ডার আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—কোন শ্রেণী ? হারামজাদা, তোমার বাপ ধনী চাষী । চেয়ে দেখ, কামেন থেকে ওরা লিখে পাঠিয়েছে । তোমার বাপ ধনী চাষী এবং তুমি সেখান থেকে গা-ঢাকা দিয়েছ । তোমাকে ওরা দু' বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে ।

শুনে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল । কোনো কথা বললাম না । একটা বছর বাড়িতে আমি চিঠি লিখিনি, যাতে ওরা আমার খোঁজ না পায় । বাড়ির লোকেরা বেঁচে আছে কি মরে গেছে কিছুই আমি জানতাম না ; বাড়ির লোকেরা আমার কোনো খবর রাখত না ।

কমাণ্ডার চিৎকার করে বললেন,—লজ্জা করে না ? বলবার সময় তাঁর উর্দির চারটে ফলকই নেচে উঠল, বিবেকে বাধে না চাষীমজুরের রাষ্ট্রকে ঠকাতে ?

আমি ভাবলাম আমাকে এবার উনি মারবেন। কিন্তু মারলেন না। উনি লিখিত হুকুম দিলেন—ছ' ঘণ্টার মধ্যে আমাকে সামরিক বাহিনী থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হল। বাইরে তখন নভেম্বরের ঠাণ্ডা। আমার গা থেকে শীতের ইউনিফর্ম কেড়ে নিয়ে আমাকে দেওয়া হল নতুন রংরুটদের পরা তিন বছরের পুরনো গ্রীষ্মের উর্দি। আমাকে ওরা মোক্ষম তুড়ুং ঠুকে দিল। শীতের উর্দি আমি না দিলেও পারতাম, আমি বলতে পারতাম অমুক জায়গায় যেতে চাই—কিন্তু তখন আমি আইনকানুন কিছুই জানতাম না। সেইসঙ্গে আমার হাতে ওরা একটা সর্বনেশে ছাঁটাইপত্র দিল। তাতে লেখা : 'কুলাকপুত্র বিধেয়...সামরিক বাহিনী হইতে বরখাস্ত করা হইল।' নতুন চাকরি পাওয়ার পক্ষে চমৎকার চিঠি বটে! রেলে বাড়ি যেতে চার দিনের রাস্তা; আমাকে ওরা টিকিট তো দিলই না, সঙ্গে একটা দিনের শুকনোশাকনা খাবার পর্যন্ত দিল না। শেষবারের মত মধ্যাহ্নভোজন করিয়ে ক্যাম্প থেকে আমাকে বিদায় করে দিল।

হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে বলে নিই : আটত্রিশ সালে কৎলাস ট্র্যানজিট ক্যাম্পে আমার সাবেক স্কোয়াড কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাকেও দশ বছর ঠুকে দিয়েছে। তার কাছেই শুনলাম—রেজিমেন্টের কমাণ্ডার আর পলিটিক্যাল অফিসার, দুজনকেই সাঁইত্রিশ সালে গুলি করে মারা হয়। তার মানে, সর্বহারাই হও আর ধনী চাষীই হও, বিবেক থাকুক বা না থাকুক...সবই এক কথা। শুনে আমি কপালে আর বুকে ক্রসচিহ্ন এঁকে বললাম,—যে যাই বলুক, হে সৃষ্টিকর্তা! মাথার ওপরে তুমি সত্যিই আছ। তোমার টনক নড়ে একটু দেরিতে, কিন্তু যখন মারো—সে বড় কঠিন মার।

দু' বাটি খিচুড়ি খাওয়ার পর ধূমপান না করে শুখভ আর পারছিল না। শুখভ সাত নম্বর ব্যারাকের লৎভিয়ার লোকটির কাছ থেকে দু' মগ তামাক কিনবে এটা ঠিক হয়ে আছে—কাজেই এখন ধার নিলে পরে তাই থেকে সে শোধ করে দিতে পারবে। সুতরাং সেই ভরসায় শুখভ এস্তোনিয়ার মৎস্যজীবী লোকটিকে ফিস্ ফিস করে বলল, —শোনো, এইনো! এক ছিলিমের মত আমাকে একটু তামাক দাও। কালকেই শোধ করে দেব। তুমি জানো, আমি তোমাকে ঠকাব না।

এইনো সটান শুখভের চোখে চোখ রাখল; তারপর একটুও তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে চোখ সরিয়ে নিয়ে ধর্মভাইয়ের দিকে তাকাল। সব জিনিসেই ওদের দুজনের হাফাহাফি ভাগ। পরস্পরেব মত না নিয়ে একরত্তি তামাকও কাউকে ওরা দেবে না। দুজনে ওরা কী যেন হিজিরবিজির করে বলাবলি করল। তারপর এইনো গোলাপী সুতোঝোলানো সুন্দর একটা তামাক রাখার থলি বার করল। থলি থেকে একটিপ কলে-কাটা তামাক বার করে শুখভের চেটোর ওপর রাখল। তারপর মেপে দেখে আরও কয়েকগাছি তামাক তাতে যোগ করল। ব্যস্, একটা সিগারেটের পক্ষে এই যথেষ্ট।

শুখভের কাছে একটুকরো খবরের কাগজ ছিল। কাগজটা ফ্যাড়্ ফ্যাড়্ করে ছিঁড়ে ফেলে, তাই দিয়ে একটা সিগারেট পাকিয়ে নিল। তিউরিনের দু'পায়ের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত কাঠকয়লা পড়ে ছিল—তুলে নিয়ে শুখভ তাই দিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে নিল।

তারপর টান দিয়ে ধোঁয়া গলায় নিয়ে গিলল। আবার একবার টান দিল। আবার ধোঁয়া গিলল। একটা মধুর আমেজ তার সমস্ত সত্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যেন কড়া মদের ঝাঁঝালো নেশায় চুর হয়ে গেল।

সবে সে সিগারেটটা ধরিয়েছে, এমন সময় মেশিনঘরের ওপাশে হঠাৎ একজোড়া নীল চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল—এই সেরেছে, ফেতিউকভ। শুখভের হয়ত ওর ওপর মায়া হত, হয়ত একটান টানতেও দিত—কিন্তু ও আজ ইতিমধ্যেই একবার একজনের কাছ থেকে একটান দিয়ে নিয়েছে। শুখভ নিজে ওকে ধোঁয়া ছাড়তেও দেখেছে। শুখভ তার চেয়ে বরং সেন্‌কা ক্লেভশিনকে দেবে। তিউরিন বলে যাচ্ছে, কিন্তু সেন্‌কা একটা কথা শুনতে পাচ্ছে না। বেচারা চুপচাপ ঠায় বসে ঘাড়টা বেঁকিয়ে আগুন পোহাচ্ছে।

তিউরিনের মুখময় বসন্তের দাগ। তাতে চুল্লীটা থেকে আলো এসে পড়েছে। এমন নির্বিকারভাবে বিনা খেদে নিজের কথা সে বলে যাচ্ছিল, শুনে মনে হবে যেন আর কারো কথা সে বলছে : আমার নিজের কাছে যা-কিছু রদ্দি মাল ছিল, একজন দোকানীকে সিকি ভাগ দামে বেচে দিলাম। তাই দিয়ে চোবাবাজারের দরে দুটো পাঁউরুটি কিনলাম—রেশন প্রথা তার আগেই চালু হয়ে গেছে। আমি ঠিক করেছিলাম একটা কোনো মালগাড়িতে চড়ে বসব ; কিন্তু তখন নতুন আইনকানুন হয়েছে—মালগাড়িতে উঠলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। হয়ত তোমাদের মনে থাকতে পারে, সে সময়ে বিনা পয়সায় দূরে থাক—টাকা দিলেও ট্রেনের টিকিট পাওয়া যেত না ; সরকারী কাগজ বা পাস দেখাতে হত। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যাকে তাকে ঢুকতেই দিত না। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত মিলিটারি পুলিশ, স্টেশনে স্টেশনে রেললাইনের দুপাশে থাকত সারি সারি পাহারা। রোদে একদম তাপ নেই ; মাথার ওপর সূর্য ডুবু ডুবু। ডোবাগুলোর ওপর বরফের সর জমে যাচ্ছে। রাতটা কোথায় কাটাবো ? একটা ইঁটের দেয়ালে উঠে কোনোরকমে টপকালাম। সোজা চলে গেলাম স্টেশনের শৌচাগারে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। না, কেউ আমার পিছু নেয়নি। প্যাসেঞ্জারের ভাব করে বেরিয়ে পড়লাম। আমি যেন পল্টনেরই লোক। স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে—ভ্লাদিভস্তক থেকে মস্কো যাচ্ছে। একদঙ্গল লোক ভিড় করে চলেছে গরম জল আনতে। জলের পাত্র হাতে করে এ ওর মাথা ঠুকে দিচ্ছে। গাঢ় নীল সোয়েটার গায়ে দিয়ে একটি মেয়ে হাতে একটা দেড়সেরী কেৎলি নিয়ে গরম জলের হিটারের কাছে ভয়ে ঘেঁষতে না পেরে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। খুদে খুদে পা দুটো পাছে ছ্যাঁকা লেগে পুড়ে যায় কিংবা কেউ মাড়িয়ে দেয়—এই তার ভয়।

আমি তাকে বললাম,—আমার পাঁউরুটিদুটো লক্ষ্মীটি তুমি একটু ধরো, আমি ঝাঁ করে তোমার গরম জল এনে দিচ্ছি। আমি যখন গরম জলের জায়গায় সবে পৌঁচেছি, এমন সময় ট্রেন চলতে আরম্ভ করল। মেয়েটি আমার রুটিদুটো হাতে করে দাঁড়িয়ে। ওদুটো নিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে কেঁদে ফেলে দিল। চায়ের কেৎলিটা খোয়াতে

ও সানন্দে রাজী ছিল। আমি চেঁচিয়ে বললাম,—ছুট লাগাও, ছুট লাগাও তুমি। আমি ঠিক ধরে ফেলব। মেয়েটি আগে আগে চলেছে, আমি তার পেছনে। দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেললাম। এক হাতে ওকে ধরে ট্রেনে উঠিয়ে দিলাম। ট্রেন তখন জোরে চলতে আরম্ভ করেছে। আমিও পাদানিতে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। ট্রেনের কণ্ডাক্টর আমার আঙুলের গাঁটগুলোতে বাড়ি মারল না কিংবা বুকে ঠেলা মেরে ফেলেও দিল না। গাড়িতে পল্টনের আরও লোকজন ছিল; আমাকে তাদেরই একজন বলে ভুল করেছিল। শুখভ কনুই দিয়ে সেন্‌কাকে একটা ঠেলা মারল।—নাও, ধরো সিগারেটটা—হতভাগা, দুটো সুখটান দিয়ে নাও। কাঠের হোল্ডারটাসুদ্ধ সেন্‌কার হাতে সিগারেটটা দিল। ওতে মুখ দিয়েই ও টানুক, সেন্‌কা মুখ দিলে কিছু হবে না। সেন্‌কা বড় অদ্ভুত লোক যাহোক: বেশ একটা নাটুকে ভঙ্গিতে বুকে হাত ঠেকিয়ে ঘাড়টা নুইয়ে সিগারেটটা হাতে নিল। কালা লোকের কাছ থেকে এব চেয়ে আর বেশী কী আশা করা যায়।

তিউরিন বলে চলল: কামরাটাতে ছিল ছ'জন মেয়ে। তারা সব লেনিনগ্রাদের ছাত্রী। হাতেকলমে কাজ শিখতে গিয়েছিল। এখন যে যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। ওদের ছোট্ট টেবিলের ওপর চমৎকার টাটকা মাখন, আলুথালু সাজ; হুকের গায়ে ঝুলছে বর্ষাতি, ওয়াড়-দেওয়া ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর সব সুটকেস। ওরা যেন সবুজ-আলো-দেখানো জীবনপথের যাত্রী।...ওরা কথা বলছে, হাসছে, আমরা এক জায়গায় বসে চা খাচ্ছি।

আমাকে ওরা জিজ্ঞেস করল কোন্ গাড়িতে আমি উঠেছি। বড় করে আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম। তারপর সত্যি কথা বললাম: যে গাড়িতে আমি উঠেছি, তাতে করে তোমরা পৌঁছুবে জীবনে আর আমি পৌঁছুব মৃত্যুতে।...

মেশিনঘরে সবাই নিঃসাড়ে বসে। চুল্লীতে শুধু মাঝে মাঝে ফুটফাট শব্দ হচ্ছে। মেয়েদের দলটা হায়-হায় করে উঠল। তারপর তারা নিজেরা আলোচনা করতে বসে গেল কী করা যায়।...ওরা করল কি, আমাকে ওপরের বাঙ্কে তুলে দিয়ে বর্ষাতি দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে দিল। এমনিভাবে সারা রাস্তা ওরা আমাকে আড়াল করে রেখে নোভোসিবিরস্ক-এ পৌঁছে দিল।...হ্যাঁ, এই সূত্রে বলে রাখি—পরে ওদের মধ্যে একজনকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ হয়েছিল। পেচোরায় জেলখানায়। কিরোভের খুনের মামলায় পঁয়ত্রিশ সালে মেয়েটি ধরা পড়ে। ঘাড়ে এমন হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ পড়েছিল যে, ও প্রায় মরবার দাখিল হয়েছিল। আমি তখন একে ওকে ধরে দর্জিঘরে মেয়েটিকে একটা কাজের বন্দোবস্ত করে দিই।

পাভ্‌লো ফিস্ ফিস্ করে তিউরিনকে জিজ্ঞেস করল,—এখন বোধহয় আমাদের সিমেণ্ট মেশানো উচিত?

পাভ্‌লোর কথা তিউরিনের কানেই গেল না।

...সব্জিক্ষেতের ভেতর দিয়ে রাত্তিরে আমি বাড়িতে পৌঁছুলাম। আবার সেই রাত্রেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে নিয়ে এলাম আমার ছোট ভাইটিকে। ওকে নিয়ে গেলাম গ্রীষ্মমণ্ডলের দিকে — ফ্রুনজ্-এ। ভাইকে খেতে দেব, কি-না নিজে খাব

—আমার সে সঙ্গতি ছিল না। ফ্রুনজ-এ দেখলাম রাস্তায় একটা পাত্রে পিচ গলানো হচ্ছে আর তার চার ধারে একদল বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো চোর-গুণ্ডা-বদমায়েশ ছোকরা বসে গুলতানি করছে। আমি তাদের পাশে বসে পড়ে বললাম,—ভদ্রমহোদয়গণ! আমার ভাইটিকে আপনাদের সাকরেদ করে নিন। ওকে আপনারা কী করে বাঁচতে হয় তার তালিম দিন। আমার ভাইটিকে ওরা দলে নিয়ে নিল।...কেন আমি তখন নিজেও ওদের দলে ঢুকে পড়লাম না, এই ভেবে এখন আমাব আপশোস হয়।

ক্যাপ্টেন বুইনভ্স্কি জিজ্ঞেস্ করল,—তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পরে আর কখনও দেখা হয়নি?

তিউরিন হাই তুলল।

—না, তার সঙ্গে আর কখনও আমার দেখা হয়নি।

তারপর আবার ও একটা হাই তুলল।

ছোকরা বলে সবাইকে সম্বোধন করে তিউরিন বলল,—মুষ্ড়ে পড়ো না। এমনকি এই বিজলী স্টেশনেও আমরা ঠিক টিঁকে থাকব। সুরকি মেশানোর কাজে যারাই আছ, তারাই লেগে পড়ো। বাঁশী বাজবার অপেক্ষায় বসে থেকো না।

ব্রিগেড এই রকমটাই হয়ে থাকে। ওপরের কর্তারা এমন কি কাজের সময়ও কয়েদীদের দিয়ে কাজ করাতে পারে না। অথচ ফোরমান বললে ছুটির সময়টুকুতে পর্যন্ত তারা কাজ করবে। তার কারণ, তাদের খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে তো ফোরম্যানই। ফোরম্যান তাদের দিয়ে কখনই বেগার খাটায় না।

ওরা যখন সুরকি মাখবে, রাজমিস্ত্রিদের তখন কী করবার থাকবে? অথচ তখনই কাজ শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। তখন কি তারা কেবল হাত গুটিয়ে বসেই থাকবে?

শুখভ লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল।

—যাই, ওপরে গিয়ে বরফ সরিয়ে দিয়ে আসি।

শুখভ ছোট একটা কুড়ুল আর একটা বুরুশ সঙ্গে নিল। চাঙড়গুলো গাঁথবার জন্যে রাজমিস্ত্রিদের উপযোগী হাতুড়ি, মাপজোখ করবার রড, ওলন আর একটুকরো সুতো দরকার। লালচে গাল নিয়ে কিল্গাস শুখভের দিকে এমন মুখ করে তাকাল যে, সে যেন বলতে চাইছে—ফোরম্যানের কথায় কেন তোমরা নাচছ? কিন্তু ব্রিগেডের লোকেরা খেতে পেল কি পেল না, কিল্গাসের তো তাতে ভারি বয়েই গেছে। দিনে ওর আধপোয়া কিংবা তারও কম খাবারে দিব্যি চলে যায়। বাড়ি থেকে যা আসে, তাই খেয়েই টেকো কিল্গাস জীবনধারণ করে।

তাই বলে কিল্গাস অবুঝ নয়। সেও উঠে পড়ল। তার জন্যে ব্রিগেডের কাজ আটকে থাকুক, এটা সে চায় না।

কিল্গাস শুখভকে ডেকে বলল,—দাঁড়াও, ভানিয়া! আমিও আসছি।

না এসে যাবে কোথায়, চাঁদ! তুমি যদি অতটা একালষেঁড়ে হতে, তাহলে তো

চড়চড় করে ওপরে উঠে যেতে, হে ।

শুখভের অত হানফান করে ছুটে যাওয়ার আরও একটা কারণ ছিল । ও চেয়েছিল কিল্‌গাস গিয়ে পড়বার আগেই ওলনসুতোটা হাতে পুরবে । যন্ত্রপাতির গুদাম থেকে ওরা মোটে একটাই ওলন নিয়ে এসেছিল ।

ফোরম্যানকে পাভলো জিজ্ঞেস করল,—দেয়াল গাঁথার কাজ কি তিনজন দিয়ে হবে ? আরও একজনকে ওদের সঙ্গে লাগালে কেমন হয় ? নাকি, মশলাতে টান পড়বে ? স্বভাবসিদ্ধ য়ুক্রেনী ভাষাতেই পাভ্‌লো কথাগুলো বলল।

তিউরিন কপাল কুঁচকে খানিকটা ভাবল ।

—ঠিক আছে, পাভ্‌লো । আমি ওদের সঙ্গে থাকছি । তুমি বরং এখানে এই সুরকির জায়গাটায় থাকো । ঢাউস খোল এটার— এখানে ছ'জন লোক রাখো । এমনভাবে চালাবে যাতে একধার দিয়ে যখন তৈরি মশলা টেনে নেওয়া হবে, তখন যেন সেইসঙ্গে অন্য মুখ দিয়ে নতুন মশলা ঢেলে দেওয়া হয় । দেখো, যেন সমানে একটানা কাজ চলে ।

—হেইও ! বলে পাভ্‌লো এক তুড়িলাফ দিল । বয়েস কম, রক্ত এখনও গরম । কয়েদখানার জীবন এখনও ওর সব রস নিংড়ে ফেলতে পারেনি । য়ুক্রেনী পিঠেপুলি-খাওয়া গোলগাল মুখ । বলল,—তুমি যদি দেয়াল গাঁথো—আমি বানাব সুরকি । দেখা যাক, কার কত মুরোদ । আরে, বড় বেল্‌চাটা গেল কোথায় ?

ব্রিগেডের এও আর এক মজা । পাভলো জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে চোরাগোপ্তা গুলি ছুঁড়ত, রাত্তিরে মফস্বল শহরগুলোতেও হানা দিত । ওর ভারি বয়ে গেছে জেলখানায় এসে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে ! কিন্তু ফোরম্যান যদি কাজ করতে বলে, তাহলে অবশ্য অন্য ব্যাপার ।

শুখভ আর কিলগাস দোতলায় উঠে গেল । ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শুনে ওরা বুঝল সেন্‌কাও ওপরে উঠছে । কালা হলে কী হয়, না বললেও সেনকা কিন্তু সমস্তই ধরতে পারে ।

দোতলায় দেয়াল গাঁথার কাজ সবে শুরু হয়েছে । পুরোটা তিন থাক্ করে তো হয়েছেই, কোথাও কোথাও আরো একটু বেশী । আজ ওরা সবচেয়ে সহজ অংশটা গাঁথবে —হাঁটু থেকে বুক অবধি । তার জন্যে ভারা বাঁধার দরকার হবে না ।

আগেকার ভারা আর তক্তাগুলো অন্য সব কয়েদীরা হয় অন্যান্য বাড়িতে নিয়ে গেছে, নয় জ্বালানী হিসেবে কাজে লাগাবার জন্য চেলা করে ফেলেছে—যাতে অন্য ব্রিগেডের লোকেরা ওগুলো নিয়ে নিতে না পারে । এখন ওদের কিছু তক্তা লাগিয়ে নিতে হবে, তবে ওরা পরের দিন হাত চালিয়ে কাজ করতে পারবে—নইলে কাজকর্ম সব ঠেকে থাকবে ।

বিজলী স্টেশনের ছাদ থেকে শুখভ অনেক দূর অবধি দেখতে পাচ্ছিল । পুরো এলাকাটা বরফে সাদা হয়ে আছে ; চারিদিক খাঁ খাঁ করছে । কয়েদীরা যেখানে পেরেছে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে ; বাঁশী বাজার আগে পর্যন্ত যতটা পারে শরীরটা গরম

করে নেবে। কালো কালো গুম্‌টিঘর আর কাঁটাতার-জড়ানো ছুঁচলো খুঁটিগুলো তাকালেই চোখে পড়ছে। রোদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে তবেই তারগুলো দেখা যাচ্ছে—পেছন ফিরলে নয়। এমন ঝকমকে রোদ যে, চোখ খুলে তাকানো যায় না।

একটু দূরে বিদ্যুৎবাহী ট্রেন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশটাকে নোংরা করে ফেলছে। গল্‌গলিয়ে হুস্ করে ধোঁয়া ছাড়ছে ; সিটি বাজবার আগে সমস্ত সময় এইরকমের ঘ্যান্‌ঘেনে ধরাগলায় সাঁই সাঁই শব্দ হয়। ঐ। সিটি বাজল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, খুব আগে ওরা কাজে হাত দেয়নি।

—ওহে, স্তাখানভপন্থী! ওলনটা নিয়ে হাত চালাও। কিল্‌গাস এই বলে তাড়া দিল।

শুখভও পেছনে লাগতে ছাড়ল না। বলল,—তোমার দেয়ালটা দেখ—কতখানি বরফ জমে রয়েছে। সাফ করতে করতে তো রাত্তির হয়ে যাবে। কর্নিকটা বৃথাই সঙ্গে এনেছ।

মধ্যাহ্নভোজের আগেই ওদের দুজনকে বলেই দেওয়া হয়েছিল কোন কোন্ দেয়াল গাঁথতে হবে। কিন্তু ঠিক তক্ষুণি নীচে থেকে ফোরম্যানের গলা শোনা গেল,—ওহে, ছোকরার দল! আমরা দুজন দুজন করে কাজে হাত দেব। তাহলে আর সুরকিগুলো ঠাণ্ডায় জমে যেতে পারবে না। শুখভ! তোমার দেয়ালে কাজ করার জন্যে তুমি ক্লেভ্‌শিনকে সঙ্গে নাও আর আমি থাকব কিল্‌গাসের সঙ্গে। অমি যতক্ষণ গিয়ে না পড়ছি, গপ্‌চিক কিল্‌গাসের সঙ্গে গিয়ে দেয়ালের ওপর থেকে বরফগুলো সরিয়ে ফেলুক।

শুখভ আর কিলগাস পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ঠিক। ওতেই তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

ওরা যে যার কুড়ুল হাতে তুলে নিল।

দূরে বরফের গায়ে চোখ-ধাঁধানো রোদ্দুর ; এদিক ওদিক মাথা গুঁজবার ঠাঁইগুলো থেকে কয়েদীরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে কেউ সকালের ছোট ছোট অসমাপ্ত গর্তগুলোতে খোন্তা চালাচ্ছে, কেউ লোহার জালি বেঁধে দিচ্ছে, কেউ-বা ওয়ার্কশপের ইমারতে কড়িবরগা লাগাচ্ছে। কিন্তু এসব কিছুই আর তখন শুখভের চোখে পড়ছে না। শুখভ তখন একমাত্র তার নিজের দেয়ালটুকুই দেখছে—বাঁদিকে যেখানে চাঙড়গুলো তার কোমর ছাড়িয়ে উঠেছে, সেই সন্ধিস্থল থেকে ডানদিকে যেখানে তার আর কিল্‌গাসের দেয়াল এক জায়গায় এসে মিলেছে। শুখভ সেনকাকে দেখিয়ে দিল কোন্ কোন্ জায়গা থেকে বরফ ছাড়াতে হবে ; তারপর নিজে দমাদ্দম করে কখনো কুড়ুলের ধারালো দিক কখনো ভোঁতা দিক দিয়ে এমনভাবে বরফের ওপর ঘা দিতে লাগল যে, চটাস্ চটাস্ করে বরফের টুকরোগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, কখনও-বা সটান তার মুখে এসে লাগতে লাগল। শুখভের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই ; দেয়াল ছাড়া দ্বিতীয় কোনো চিন্তাও নেই তার মাথায়। সে শুধু একদৃষ্টে বরফ কুঁদে কুঁদে কল্পনার জোরে বার করে আনছে বিজলী স্টেশনের দু' চাঙড়ে গাঁথা মোটা দেয়ালের মূর্তিটা। দেয়ালের

এই অংশটা যে রাজমিস্ত্রি করেছিল, হয় সে একদম আনাড়ি—নয়, একেবারেই মন দিয়ে করেনি। কিন্তু শুখভ এখন এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে দেখছে যেন দেয়ালটা তার নিজেরই। ও-ই, ঐ জায়গাটায় একটা খোঁদল হয়ে আছে। একটা থাকে ওটা সমান করা যাবে না। তিনটে থাক লেগে যাবে। প্রত্যেকবারই ঐ জায়গাটায় এসে চুনবালি একটু মোটা করে লাগাতে হবে। ইস্, এক জায়গায় দেখছি বাইরের দেয়ালটা একটু ঢিবিমত হয়ে আছে। দু' থাক পরে ওটা টেনে সমান করে দিতে হবে। শুখভ মনে মনে দেয়ালটা দুটো ভাগে ভাগ করে নিল ; জোড়ের মুখ থেকে বাঁদিকে ধাপে ধাপে চাঙড়গুলো যেখানে উঠেছে, সেটা হবে তার ভাগ ; কিলগাসের দেয়াল পর্যন্ত বাকি ভাগটা হবে সেন্‌কার। শুখভ মনে মনে এঁচে নিল : কোণটাতে কিল্‌গাস কিছু চাঙড় সেনকাব জন্যে রেখে না দিযে পারবে না, কেননা সেটাই তার পক্ষে সুবিধের হবে। ওরা দুজনে যখন কোণের কাছে জট পাকাবে, সেই ফাঁকে শুখভের অর্ধেক দেয়াল তোলা হয়ে যাবে ; ফলে শুখভদের জুটিব পিছিয়ে পড়বার আর ভয় থাকবে না। শুখভ মনে মনে এঁচে নিল কোথায় কোথায় সিমেন্টের চাঙড়গুলো বসাবে। চাঙড়গুলো ছাদের ওপর তোলা হয়েছে দেখামাত্র শুখভ চেঁচিয়ে আলিওশাকে ডাকল,—নিয়ে এসো আমার এখানে। রাখো এখানে। হ্যাঁ, আর এই যে এইখানে।

সেনকা তখনও বরফ চাঁচছে। শুখভ দুহাতে তারেব বুরুশটা চেপে ধরে দেয়াল-বরাবর একবার এদিক একবার ওদিক করে সিমেন্টের চাঙড়ের ওপর ঘষতে লাগল। ষোলআনা পরিষ্কার না হলেও মোটামুটিভাবে বরফ চাঁছা গেল। জোড়ের মুখগুলোতে ফিনফিনে একটা ছোপ তখনও লেগে রইল।

হড়বড় করে তিউরিনও ওপরে উঠে এল। শুখভ তখনও বুরুশ ঘষছে। তিউরিন তার মাপের কাঠিটা দেয়ালের কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে দিল। শুখভ আর কিলগাস আগেই নিজেদের মাপের কাঠিগুলো দেয়ালের ধারে রেখে দিয়েছিল।

নীচে থেকে পাভ্‌লো চেঁচাল,—বেঁচে কে আছ হে, মটকায় ? মশলাগুলো ধরো।

শুখভ ঘামতে শুরু করেছে ; এখনও তার ওলনসুতো টেনে লাগানো হয়নি। এবাব সে তাড়া লাগাল। ঠিক করল, এখুনি তিন থাকের মত করে সুতো টেনে দেবে —পরে মেলাবার জন্যে একটু একটু করে ফাঁক রেখে যাবে। তাছাড়া ঠিক করল, সেন্‌কার খাটুনি কমাবার জন্যে বাইরের দিকের আরও অংশ সে নিজেব ভাগে নেবে ; সেই সঙ্গে ভেতরের থাকেরও খানিকটা অংশ গাঁথার ব্যাপাবে সেনকাকে সে সাহায্য করবে।

একদম ওপরে ধার বরাবর ওলনসুতো লাগিয়ে শুখভ মুখে কথা বলে আর হাতের ইশারা করে সেনকাকে বুঝিয়ে দিল কোথায় কোথায় চাঙড় বসাতে হবে। কালা হলেও সেন্‌কা সব বুঝল। ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে, আড়চোখে তিউরিনের দেয়ালের দিকে চেয়ে ঘাড়টা নাড়ল। মনে হল ও বলতে চাইছে,—দেব নাকি ওদের ঘোল খাইয়ে ? কী বলো ? আমরা তাই বলে পিছিয়ে থাকব না। শুখভ হাসল।

ভারা বেয়ে আগেই মশলা আসতে শুরু করেছে। আটজন লোককে এই কাজে

লাগানো হয়েছে । ফোরম্যান ঠিক করেছে মশলার বাক্সগুলো যেন রাজমিস্ত্রিদের কাছে রাখা না হয়—তাহলে মাঝের থেকে কেবল ঠাণ্ডায় জমে যাবে । তার বদলে ঠেলাগুলো কাছাকাছি রাখা হয়েছে যাতে দুজনে সোজাসুজি ঠেলার ভেতর থেকে মশলা তুলে নিয়ে দেয়ালে চটাস্ চটাস্ করে লাগিয়ে তারপর চাঙড়গুলো বসাতে পারে । ঠেলা বওয়ার লোকেরা ততক্ষণে চাঙড় বইবার কাজ করতে পারে—তাহলে আর তাদের ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাণ্ডায় জমে যেতে হবে না । মশলা ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন একদল ঠেলা বওয়ার লোকেরা এসে মশলা পৌঁছে দিয়ে যাবে এবং আগেব লোকেরা খালি বাক্সগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে । নীচেকার লোকেরা ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মশলাগুলো চুল্লীতে গলিয়ে নেবার সময় নিজেরাও একটু হাতপাগুলো সেঁকে নিচ্ছে ।

একসঙ্গে দুটো করে মশলার বাক্স—একটা কিল্‌গাসেব দেয়ালের জন্যে, অন্যটা শুখভের দেয়ালের জন্যে । ঠাণ্ডার মধ্যে মশলাগুলো থেকে ভাপ উঠছে—তবু সেই ধূমন্ত জিনিসটাতে তাপ মোটে নামমাত্র । কর্নিক দিয়ে তোলো আর চটাপট দেয়ালে সাঁটো । হাঁই তুলতে গিয়ে একটু থেমেছো কি সঙ্গে সঙ্গে জমে যাবে । একবার জমে গেলে আর কর্নিক দিয়ে তুলতে পারবে না । তখন কুড়ুলের উল্টোমুখ দিয়ে মেরে খসাতে হবে । চাঙডটা যদি একটু বেলাইনে বসাও, সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা জায়গাটার মশলা জমে যাবে । তখন তোমাকে কুড়ুলের উল্টোমুখ দিয়ে চাঙড়টা খসিয়ে নিয়ে তারপর মশলাগুলো তুলে ফেলতে হবে ।

কিন্তু শুখভের কোনো ভুল হল না । চাঙড়গুলো সব অবিকল সমান মাপের নয় । কোনোটার কোণের দিকটা চটাওঠা, কোনোটার ধারের দিকে ভাঙা, কোনোটার বা আছে অন্য কোনো খুঁত । শুখভ একবার দেখেই সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিচ্ছিল কোনটাতে কোন পাশ দিয়ে দেয়ালের ঠিক কোনখানটাতে লাগসই করে বসাবে ।

শুখভ তার কর্নিকে ধুঁইয়ে-ওঠা মশলা তুলে ঠিক সেই সেই জায়গায় ফেলছিল । তলার জোড়টা কোন্ জায়গায় আছে, এটা তাকে মনে করে রাখতে হচ্ছিল—কারণ ওপরের চাঙড়টার নীচে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় জোড়টা থাকা চাই । একটা চাঙড়ের উপযোগী মশলা নিয়ে শুখভ আগাগোড়া সমান করে লেপে দিচ্ছিল । সিমেন্টের চাঙড়ে একটুতেই বড্ড কেটে-ছড়ে যায় বলে মশলা লেপে দেবার পর শুখভ খুব সাবধানে একটা করে চাঙড় তুলছিল, যাতে তার হাতমোজাটা ছিঁড়ে না যায় । তারপর আবাব কর্নিকটা দিয়ে মশলার ওপর সমান করে বুলিয়ে সিমেন্টের চাঙড়টা তার ওপর ঝপ্ করে বসিয়ে দিচ্ছিল । আর যদি ঠিকভাবে না বসে থাকে তাহলে তখন তখনি এপাশে ওপাশে কর্নিক ঠুকে চাঙড়টা ঠিকঠাক করে নিতে হবে । দেয়ালের বাইরেটা যেন ওলনসুতোর সঙ্গে নিখুঁতভাবে সোজাসুজি হয়, চাঙড়গুলো যেন আড়ে আর লম্বায় ঠিক সমান হয়ে বসে । দেখতে দেখতে কিন্তু মশলা থিতিয়ে যাবে । ঠাণ্ডায় একদম জমে যাবে ।

খানিকটা মশলা যদি চাপ খেয়ে পাশের দিকে চলে আসে, তাহলে তৎক্ষণাৎ

কর্নিকের ধারটা দিয়ে ঘা মেরে সেই মশলা খসিয়ে দিয়ে দেয়াল টপকে বাইরে ফেলে দিতে হবে। গরমকাল হলে সেই মশলা পরের চাঙড়টা বসাবার কাজে লেগে যেত। কিন্তু এখন তো সেসব মনেও স্থান দেওয়া যায় না। নীচের জোড়ের মুখটা একটু নজর করে দেখা দরকার। চাঙড়টা হয়ত ভেঙেচুরে গিয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আবার হয়ত বাঁদিকে একটু পুরু করে তলায় মশলা দিতে হতে পারে। তখন আর চাঙড়টা জায়গায় শুধু বসিয়ে দিলেই চলবে না; ডানদিক থেকে বাঁদিকে আস্তে আস্তে ধরে ধরে বসাতে হবে, নইলে বাড়তি মশলাটা বাঁদিকের চাঙড়ের চাপে পড়ে বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসবে। সুতোর দিকে চোখ রাখো। সমান হচ্ছে কিনা দেখ। ব্যস্, ঠিক বসেছে। এবার আর একটা।

এইভাবে সমানে চলতে থাকল। দু' থাক্ বসানো হয়ে গেলে পর আগেকার ভুলগুলো শোধরানো যাবে। তারপর আর কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু এখন—একটু ভাল করে নজর দাও।

শুখভ বাইরের থাক্-বরাবর দেয়াল গাঁথতে গাঁথতে সেন্‌কার দিকে জোর্‌সে এগিয়ে চলল। আর এক কোণে সেনকা তিউরিনের কাছ থেকে সরে সরে শুখভের দিকে আসতে লাগল।

যারা মশলা বয়ে আনছিল, শুখভ তাদের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল। মশলা চাই, মশলা। জল্‌দি করো। এত তাড়াতাড়ি তার হাত চলছে যে, নাক মুছবারও সে সময় পাচ্ছে না। শুখভ আর সেন্‌কা এগোতে এগোতে এক জায়গায় এসে পড়ল। দুজনে তখন একই জায়গা থেকে মশলা নিচ্ছে। দেখতে দেখতে মশলা তলায় এসে ঠেকল।

শুখভ দেয়ালের এপাশ থেকে চিৎকার করে বলল,—মশলা কই?

পাভ্‌লো চেঁচিয়ে উত্তর দিল,—যাচ্ছে।

এক ঠেলা মশলা এল। তাতে যেটুকু টলটলে অবস্থায় ছিল, দু'হাতে খানিকক্ষণের মধ্যে ফুরিয়ে গেল। পাশগুলো জমাট বেঁধে গিয়েছিল। তোমরা এনেছ তোমরাই চেঁছে-চেঁছে তুলবে। জমে যেতে দিয়েছ যখন, তোমাদের দুবার করে ওঠাতে নামাতে হবে। যাও যাও। নতুন মশলা আনো।

শুখভ এবং আর যারা রাজমিস্ত্রির কাজ করছিল, তাদের কেউই আর ঠাণ্ডা অনুভব করছিল না। দ্রুত কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে গোড়ায় তারা একটা গরমের ঢেউ অনুভব করল—এমন গরম যাতে ওভারকোটের তলায়, জ্যাকেটের নীচে, শার্ট আর গেঞ্জির তলায় ভিজে ভিজে ঠেকে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও তারা কাজ বন্ধ করল না। ক্রমাগত দেয়াল গেঁথে চলল। একঘণ্টা পরে তারা আবার একটা গরমের ঢেউ অনুভব করল—এমন গরম যাতে ঘাম মরে যায়। পা দুটোতে আর ঠাণ্ডা লাগছে না, সেটাই বড় কথা। আর কিছুতেই কিছু যায় আসে না। এমন কি অল্পস্বল্প কন্‌কনে হাওয়া দিলেও কাজের মন নষ্ট হয় না। একমাত্র ক্লেভশিন পায়ে পা ঘষছিল—বেচারার পায়ের সাইজ

৪৬—ওকে এমন বেয়াড়া একজোড়া ভালেঙ্কি দিয়েছে যে পায়ে বেজায় ছোট হয়।
মাঝে মাঝে তিউরিনের গলা পাওয়া যাচ্ছে,—মশ্-ল্-লা ! শুখভও হাঁক দিচ্ছে, —ম-শ্-লা ! দলের কেউ যদি খুব গতর দিয়ে কাজ করে, তার আশপাশের লোকদের কাছে সে খানিকটা ফোরম্যান-পদবাচ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিল্‌গাস আর তিউরিনের জুটির সঙ্গে শুখভকে পাল্লা দিতে হবে। মায়ের পেটের ভাই হলেও তাকে শুখভ এখন ঠেলা নিয়ে ভারা বেয়ে ওপর নীচে এমন দৌড় করাত যে গা দিয়ে তার কালঘাম ছুটত।
দুপুরের খাওয়ার পর বুইনভস্কি ফেতিউকভের সঙ্গে সুরকি বইছিল। সিঁড়িটা এমন খাড়া হয়ে উঠেছে যে, বেয়ে ওঠা বেশ শক্ত। গোড়ায় গোড়ায় ক্যাপ্টেন বুইনভস্কি মাল টানার ব্যাপারে তেমন গা' লাগায়নি। শুখভ মিহি গলায় তাকে একটু জোরে হাত চালাতে বলল।
—ক্যাপ্টেন, আরেকটু জলদি করো। ক্যাপ্টেন, আরো চাঙড় আনো।
একবার করে যেই ওপরে ঠেলা বয়ে আনে, ক্যাপ্টেনের মধ্য চটপটে ভাব বেড়ে যায়। আর ফেতিউকভের বেলায় হয় তার ঠিক উল্টো। প্রত্যেকবারই ফেতিউকভ ক্রমশ বেশী বেশী এলিয়ে পড়ে। ঠেলাটা কাত করে ধরে শালা শুয়োরের বাচ্চা ফেতিউকভ এমনভাবে চলছিল যাতে ভেতরের মশলাগুলো টুপটাপ মাটিতে পড়ে ভারটা হালকা হয়।
শুখভ তার পিঠে খোঁচা মারল।
বলল,—এই উল্লুক কাঁহাকা ! ফেতিউকভ, তুমি না কারখানায় ম্যানেজারি করতে ? বাজি রেখে বলতে পারি, মজুরদের তুমি নাকে দড়ি দিয়ে খাটাতে।
ক্যাপ্টেন বুইনভস্কি চেঁচিয়ে ফোরম্যানের কাছে দরবার জানাল,—আমাকে একজন কাজের মানুষ দাও, তিউরিন। আমি ঐ শুখেকোর বেটার সঙ্গে আর মশলা বইছি না।
তিউরিন লোকজনদের সরিয়ে নড়িয়ে নতুনভাবে কাজ ভাগ করে দিল। ফেতিউকভকে নীচে পাঠিয়ে দেওয়া হল ; ওকে সিমেন্টের চাঙড়গুলো ভারার ওপর তুলে দিতে হবে। ক'টা করে চাঙড় তুলছে তার আবার আলাদা আলাদা হিসেব হবে। তিউরিন আলিওশাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যুতে দিল। আলিওশা শান্ত নিরীহ মানুষ। যে কেউ ওকে হুকুম করুক, ও সেই হুকুম তামিল করবে।
—দমকলে খাড়া হয়ে যাও সব, ঢেঁকির দল ! চেয়ে দেখ, যারা দেয়াল গাঁথছে —কিরকম সাঁই সাঁই করে তাদের হাত চলছে।
আলিওশা বিনীতভাবে হাসল,—হাত চালিয়ে করতে হলে হাত চালিয়েই করা হবে। যেমন তুমি বলবে তেমনি হবে।
বলেই সে তরতর করে নীচে নেমে গেল।
দলে কেউ ভালমানুষ থাকলে সে হয় রত্ন।
নীচে থেকে কে একজন তিউরিনকে ডাকল। সিমেন্টের চাঙড় নিয়ে আরেকটা ট্রাক এসে হাজির। ছ'টি মাস কারো টিকি দেখা যায়নি, এখন সব আসছে বানের জলের

মত । ওরা চাঙড় বয়ে আনলে তবেই কাজের মরশুম পড়ে । পয়লা দিন । তারপর আবার আঠারো মাসে বছর । তখন আর হাত চালিয়ে কিছু করবার থাকবে না ।

তিউরিন বাপান্ত করছে । কপিকলটা না চলায় ও খেপেছে । হাতে সময় নেই, নইলে কী হয়েছে একবার খোঁজ নিত । দেয়ালটা এখন ও সমান করতে ব্যস্ত । ঠেলাওয়ালারা এসে ওকে জানাল যে, কপিকলের মোটরটা ঠিক করবার জন্যে একজন সারাবার-মিস্ত্রি এসেছে ; তার সঙ্গে আছে ইলেকট্রিক মেরামতের কাজ দেখার জন্যে বন্দীশালার বাইরের একজন বেসামরিক তদারককারী লোক । মিস্ত্রি এটা ওটা নেড়ে-চেড়ে বেড়াচ্ছে আর তদারককারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ।

শাস্ত্রে আছে : একজন খাটবে, একজন দেখবে ।

কপিকলটা এখন সারিয়ে ফেললে বাঁচা যায় । তাহলে চাঙড় আর মশলা দুইই ওপরে তোলা যাবে ।

শুখভ তৃতীয় থাক্ দেয়াল গাঁথছে আর কিলগাস তৃতীয় থাকে সবে হাত দিয়েছে, এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল আরেক ওপরওয়ালা, পাজীর পা-ঝাড়া—ছোট তদারককাবী দের । দেরের বাড়ি নাকি মস্কো শহরে ; আগে কোন একটা মন্ত্রণালয়ে কাজ করত ।

শুখভ তখন ছিল কিলগাসের কাছাকাছি । শুখভ ইশারা কবে কিল্‌গাসকে দেরের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিল ।

কিলগাস কোনোরকম কেয়ার না করে বলল,—ধুত্তোর ! নিকুচি করেছে তোমাব ওপরওয়ালার ! সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলে আমাকে ডেকো ।

এইবার দের ব্যাটা এসে রাজমিস্ত্রিদের পেছনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের ওপর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে । এই লোকগুলো শুখভের দুচক্ষের বিষ । দের এমন ভাব দেখায় —শালা যেন ইঞ্জিনিয়াব ! একবার শুখভকে ও শেখাতে এসেছিল দেয়াল কী করে গাঁথতে হয়—শুখভ তো হেসেই বাঁচে না । আগে নিজে হাতে বাড়ি বানাও, তবে তোমাকে কারিগর বলতে পারি—শুখভের এই হল কথা ।

ওদের দেশে তেম্‌গেনিয়েভোতে কোনো কোঠাবাড়ি ছিল না—না ইঁটের, না কংক্রিটের । সবই কাঠের গুঁড়ির ঘরবাড়ি । ইস্কুলবাড়িও তাই । সংরক্ষিত বন থেকে চল্লিশ ফুট লম্বা লম্বা গাছের গুঁড়ি কেটে আনা হত । ক্যাম্পে এসে শুখভকে হতে হয়েছে রাজমিস্ত্রি । চাইল যখন, কী করা যায়—রাজমিস্ত্রিই সে হল । হাতের কাজ দুটো জানা থাকলে আরও দশটা কাজ সহজেই তার রপ্ত হতে পারে ।

দের পড়েনি । তবে একবার শুধু একটু হোঁচট খেয়েছিল। প্রায় লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে উঠে এল । এসেই চেঁচিযে উঠল,—তিউরিন ! তিউরিন ! তার চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে ।

বেলচা হাতে পাভ্‌লোও তার পিছু পিছু এসে হাজির ।

দের যে ওভারকোট পরেছিল সেটা বন্দীশালাতেই পাওয়া । কিন্তু ঝকমকে নতুন ।

মাথায় চামড়ার টুপিটা খুব শৌখীন হলেও অন্য সকলের মতই তাতে দাগানো রয়েছে নম্বর—ব-৭৩১ ।

—কী মনে করে ? তিউরিন হাতে কর্নিক নিয়ে ওর সামনাসামনি এল ; টুপিটা বেঁকে গিয়ে ওর একটা চোখ ঢাকা পড়েছে ।

একটা অসাধারণ কিছু ঘটবে বলে মনে হচ্ছে । মশলা জুড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শুখভ এ ব্যাপারে ঠিক নির্লিপ্ত থাকতে পারল না । দেয়াল গাঁথতে লাগল বটে, কিন্তু কানদুটো খাড়া করে রাখল ।

—বড্ড বাড় বেড়েছে দেখছি ? চিৎকার করে বলতে গিয়ে দের থুথু ছিটোতে লাগল ।—শুধু সেলে বন্ধ হওয়ার ব্যাপার নয় । এ একেবারে ফৌজদারি-সোপর্দ হওয়ার ব্যাপার । তিউরিন, এর জন্যে তোমাকে তৃতীয় দফায় মেযাদ খাটতে হবে ।

একমাত্র তখনই শুখভ ব্যাপারটা ধরতে পারল । শুখভ কিল্‌গাসের দিকে তাকাল । কিল্‌গাসও বুঝেছে । চাল-ছাওয়ার কাগজ । জান্‌লায় টাঙানো হয়েছে ব্যাটারা দেখে ফেলেছে ।

নিজের জন্যে শুখভের মোটেই ভাবনা হয়নি । কারণ, তাকে ধরিয়ে দেবে ফোরম্যান তেমন লোকই নয় । তার ভয় হচ্ছিল ফোরম্যানের কথা ভেবে । ফোরম্যান হল আমাদের কাছে মা-বাপ । ওদের কাছে দাবার বড়ে মাত্র । ওরা হেসে খেলে ফোরম্যানের সাজার সঙ্গে আরও কিছুদিনের ঘানি টানার মেয়াদ জুড়ে দিতে পারে ।

তিউরিনের মুখটা কিরকম খিঁচিয়ে উঠেছে । হাতের কর্নিকটা কিভাবে আছাড় দিয়ে নীচে ফেলে দিল । দেরের দিকে এক পা এগিয়ে গেল । দের পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল—পাভলো বেল্‌চাটা হাতে করে উঁচিয়ে ধরছে ।

পাভ্‌লো তার বেলচাটা ওপরে টেনে এনেছে এমনি এমনি নয় ।

সেন্‌কা কানে কালা হলেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কোমরে হাত দিয়ে এগিয়ে এসেছে । সেন্‌কাকে দেখতে বেশ ষণ্ডামার্কা ।

দের চোখ পিট্ পিট্ করে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ইঁদুরের গর্ত খুঁজতে লাগল ।

তিউরিন ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে খুব নীচু গলা করে বলল,—তোরা সাজা দিবি, সে-দিন শেষ হয়ে গেছে, উল্লুক ! আর যদি একটাও ট্যাঁ ফোঁ করিস, তাহলে জান সাবাড় করে দেব । ভুলে যাসনে । কথাগুলো এত স্পষ্ট যে, সকলেই শুনতে পেল ।

তিউরিন রাগে কাঁপছিল । নিজেকে কিছুতেই সে ধরে রাখতে পারছিল না ।

মুখটা তীক্ষ্ণ করে পাভলো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেরের দিকে তাকাল । দুচোখে তার যেন সত্যিই আগুন জ্বলছে ।

—হয়েছে, বাপু, হয়েছে—থাক । দেরের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে । সিঁড়িটার কাছ থেকে সে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেল ।

তিউরিন আর একটাও কথা বলল না । মাথার টুপিটা ঠিক করে নিয়ে নীচু হয়ে কর্নিকটা তুলে সে আবার তার দেয়াল গাঁথার কাজে ফিরে গেল ।

হাতে বেল্চা নিয়ে পাভ্‌লো নীচে নেমে গেল আস্তে আস্তে।

আ...স্তে! আ...স্তে!

দের এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, না পারছিল থাকতে—না পারছিল যেতে। কিল্‌গাসের পেছনে ঘাপ্‌টি মেরে থেকে দের সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

কিল্‌গাস সমানে গেঁথে যেতে লাগল। ডাক্তারখানায় ওষুধপত্তর যেভাবে মাপে, ঠিক সেইভাবে ধরে ধরে। কিল্‌গাসের অবস্থাটা দাঁড়াল ঠিক একজন কম্পাউণ্ডারের মত—যে কখনই ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে কাজ করে না। দেরের দিকে পেছন ফিরে কিল্‌গাস দাঁড়িয়ে রইল—দেরকে যেন সে দেখতেই পায়নি।

দের তখন থোঁতা মুখ ভোঁতা করে তিউরিনের কাছে এগিয়ে গেল।

—তদারককারী অফিসারের কাছে আমি এখন কী বলি, বলো তো?

তিউরিন যেমন চাঙড় বসাচ্ছিল তেমনি চাঙড় বসিয়ে যেতে লাগল।

—তুমি ব'লো; ওটা ঐভাবেই ছিল, আমরা এসে দেখি ওটা ঐভাবেই রয়েছে।

দের আরও খানিকক্ষণ থাকল। ও দেখল, ওকে কেউ সাবাড় করে ফেলছে না। হাতদুটো পকেটে পুরে দের তখন দু' চার পা চলে ফিরে বেড়াল।

তারপর ঠোঁট চেপে বলল,—ওহে, শ-৮৫৪! অত পাতলা করে মশলা লাগাচ্ছ কেন?

একজনকে তার দরকার হল গায়ের ঝাল ঝাড়বার জন্যে। গাঁথনির জোড় কিংবা সমান করার দিক দিয়ে শুখভের কাজের কোনো খুঁত পেল না সে। কাজেই মশলার ধুয়োটা তুলল।

শুখভ একটু হেসে ঠেস দিয়ে বলল,—আজ্ঞে, মশাই! কিছু যদি মনে না করেন তবে বলি: এখন যদি মোটা করে মশলা লাগাই, শীতের পর সারা বিজলী স্টেশনই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

দের চোখ কুঁচকে স্বভাবসুলভভাবে গাল ফুলিয়ে বলল,—তুমি কাজ করো রাজমিস্ত্রির—ওপরওয়ালার কথা শুনে তোমাকে চলতে হবে।

এটা ঠিক যে, কোথাও কোথাও মশলা আরেকটু মোটা করে দেওয়া উচিত ছিল — একটু পাতলা হয়ে গেছে। তবে এখানকার অবস্থাটা যদি ভদ্রগোছের হত, তাহলে না হয় কথা ছিল। যা শীত, বাপরে বাপ! কথা বলে দিলেই হল না, লোকজনদের ওপর একটু দরদ থাকা উচিত। এখানে কতটা কাজ হল, সেটাই বড় কথা। বিচার হবে শুধু ফল দিয়ে। অবশ্য যে নিজে বোঝে না, তাকে এসব কথা বলেই বা কী লাভ?

দের চুপচাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

তিউরিন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে ওকে যেতে দেখে চেঁচিয়ে বলল,—কপিকল যেন সারাবার ব্যবস্থা হয়। কী পেয়েছে আমাদের? ধোপার গাধা? সিমেন্টের চাঙড়গুলো আমরা ঘাড়ে করে দোতলায় তুলব?

সিঁড়ির ওপর থেকে দের কাঁচুমাচু হয়ে বলল,—মাল বওয়ার জন্যে তোমরা অবশ্যই

পয়সা পাবে ।

—কী, ঠেলাগাড়ির রেটে ? যাও না, চাঁদ—ভারা বেয়ে ঠেলাগাড়ি নিয়ে গড়গড় করে ওপরে তোলো না দেখি ! দিতে হবে হাত-ঠেলার রেটে ।

—আমাকে যদি বলো, আমি বলব : ঐ রেটেই দেওয়া উচিত । কিন্তু খাতাঞ্চি-আপিসে হাত-ঠেলার রেটে দিতে রাজী হবে না ।

—খাতাঞ্চি-আপিস দেখাচ্ছ ! এদিকে চারজন রাজমিস্ত্রিকে যোগাড় দিতে আমার গোটা দলটাকে হিমসিম খেতে হচ্ছে । ওভাবে আমাদের আর কতই বা রোজগার হবে ?

তিউরিন গাঁক গাঁক করে চেঁচালেও একদণ্ডও সে তার হাত থামায়নি ।

নীচের দলটাকে তিউরিন হেঁকে বলল,—মশলা !

শুখভও সেইসঙ্গে চেঁচাল,—মশলা ! তৃতীয় থাকটা একদম সমান হয়ে গেলে পর এবার তারা চতুর্থ থাকে হাত দেবার জন্যে তৈরি হল । ওলন-সুতোটা এক থাক উঁচু করে বেঁধে নিতে হবে—যাক ঠিক আছে, একটা থাক্ বিনা সুতোতেই সে চালিয়ে নিতে পারবে ।

দের নিজে থেকেই চলে গেল । মাঠের ভেতর দিয়ে যাবার সময় কেমন যেন কেঁচোর মত ওকে দেখাচ্ছিল । দের চলেছিল অফিসঘরের দিকে একটু গরম হয়ে নিতে । ওর তেমন যুত লাগছিল না বোধহয় । তবে তিউরিনের মত বাঘা লোকের পেছনে লাগতে যাবার আগে দ্বিতীয়বার ওর ভাবা উচিত ছিল । তিউবিনের মত ফোরম্যানদের সঙ্গে ভাব রাখতে পারলে ওর আর কোনোই ভাবনা থাকত না । এমনিতে ওকে হাড়ভাঙা খাটনি খাটতে হয় না, মোটারকমের রুটির বরাদ্দ জোটে ; থাকবার জন্যে ওর আলাদা খোপ আছে । আর কী চাই ? ও যদি ঐভাবে ঝামেলা এড়াতে পারে, তাহলে সেটা হবে ওর তুখোড় বুদ্ধির পরিচয় ।

জনকয়েক কয়েদী ওপরে এসে খবর দিল—ইলেকট্রিক মেবামতের তদারককারী আর সারাই-মিস্ত্রি দুজনেই চলে গেছে । কপিকল সারানো যায়নি ।

অতএব গাধার খাটুনি খাটো । উপায় কী ।

শুখভ এ য়াবৎ কাজ করতে গিয়ে যা দেখে এসেছে, তাতে কলকব্জাগুলো হয় আপনিই ভেঙে পড়েছে—নয়ত কয়েদীরা ইচ্ছে করে সেগুলো ভেঙেছে । শুখভ একবার একটা লগকনভেয়ার ভাঙতে দেখেছিল—চেনের তলায় একদল কয়েদী একটা প্রকাণ্ড লাঠি ঢুকিয়ে জোরে চাড় দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত সেটাকে ভেঙে ফেলে । ওরা চেয়েছিল দুদণ্ড জিরিয়ে নিতে । ক্রমাগত একটার পর একটা কাঠের গুঁড়ি এনে ওদের জমা করতে হচ্ছিল । ওরা আর পেরে উঠছিল না ।

তিউরিন বিরক্ত হয়ে হাঁক ছাড়ছিল,—কই, সিমেন্টের চাঙড় কী হল ? যারা মশলা বয়ে আনছিল আর যারা সিমেন্টের চাঙড় টেনে তুলছিল, সবাইকে তিউরিন গালাগালি দিয়ে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছেড়ে দিল ।

নীচে থেকে একজন গলা উঁচু করে বলল,—পাভলো জিজ্ঞেস করছে মশলা আর

বানানো হবে কিনা ।

—হ্যাঁ, হবে ।

—আধ বাক্স কিন্তু তৈরি আছে !

—তাহলে আরও এক বাক্স করো ।

ঝড়ের বেগে ওরা কাজ করে চলেছে । এইবার ওরা পঞ্চম থাক্ গাঁথছে । গোড়ায় যখন দেয়াল গাঁথতে শুরু করে, তখন ওদের হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাজ কবতে হয়েছিল ; আর এখন দেখ, বুক অবধি দেয়াল উঠেছে । আরে, ঠেলে এগিয়ে গেলেই তো হয় —জান্‌লা দরজা ফোটাবার জায়গা রাখার ভাবনা নেই, ভারি তো দুটো ফাঁকা দেয়াল জোড়া দেবাব মামলা, সিমেন্টের চাঙড় আছে এন্তার । ওলন-সুতোটা আরও উঁচু করে বাঁধা উচিত ছিল ; কিন্তু তার আর এখন সময় নেই ।

গপচিক এসে জানাল,—বিরাশী নম্বর ব্রিগেড যন্তরপাতি জমা দিতে চলে গেছে ।

তিউরিন শুধু তার দিকে একবার চোখ পাকিয়ে তাকাল ।

—নিজের চরকায় তেল দাওগে যাও । আরও চাঙড় আনো ।

শুখভ বাইরে তাকাল । সত্যিই, সূর্য ডুবছে । লাল আভার মধ্যে অস্তোন্মুখ সূর্যের কেমন যেন একটা পাংশু ভাব । ওরা সত্যিই তেড়ে ফুঁড়ে এগিয়ে গেছে—এর বেশী আশাই করা যায় না । ওরা এর মধ্যে পঞ্চম থাক্ শুরু করে ফেলেছে । পঞ্চম থাক্‌টা শেষ করে তবে ছাড়বে । সেইসঙ্গে আগাগোড়া সমান করে দেবে ।

যারা মশলা বইছিল, তারা জান-পরেশান ঘোড়ার মত বেদম হাঁপাচ্ছিল । বুইনভ্‌স্কির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ক্লান্তিতে । ক্যাপ্টেনমশাই আর যাই হোক ছোকরা তো নয় । বয়স চল্লিশ । পুরো চল্লিশ না হলেও কাছাকাছি ।

একটু একটু করে ঠাণ্ডা জেঁকে বসছে । হাত চললেও ফিনফিনে হাতমোজায় আঙুলগুলো কনকন্ করছে, বাঁ পায়ের ভালেঙ্কির ভেতরে ঠাণ্ডা কোন্ ফাঁকে যেন ঢুকে পড়েছে । শুখভ থপ্ থপ্ করে মাটিতে পা ফেলছে ।

আর তাদের নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে কাজ করতে হচ্ছে না—কিন্তু তাহলেও কোমর ধরে যাওয়ায় প্রত্যেকবার নীচু হয়ে চাঙড় তুলতে গিয়ে এবং মশলা নিতে গিয়ে ওদের বেশ কষ্ট পেতে হচ্ছে ।

যারা চাঙড় বয়ে আনছিল, শুখভ পই পই করে তাদের বলে দিচ্ছিল,—বাপসকল, চাঙড়গুলো এনে রেখো দেয়ালের কাছ বরাবর । একেবারে দেয়াল অবধি ।

ক্যাপ্টেনের ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার ক্ষমতায় কুলোচ্ছিল না । খাটতে খাটতে জিভ বেরিয়ে যাওয়ার এমন অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও তার হয়নি ।

কিন্তু আলিওশা বলল—ঠিক আছে, ইভান দেনিসিচ । কোথায় রাখতে হবে আমাকে শুধু দেখিয়ে দাও ।

আলিওশাকে যাই বলা যাক, সে হাসিমুখে করবে ! দুনিয়ার সব মানুষই যদি অমন হত, শুখভও অমনি হত । কেউ যদি তোমার কাছ থেকে সাহায্য চায়, কেন তুমি সাহায্য

করবে না ? এমন ধারাই তো হওয়া উচিত ।

সমস্ত সীমাসরহদ্দ জুড়ে ঢং ঢং করে পরিষ্কার ঘণ্টা বাজার আওয়াজ বিজলী স্টেশন থেকেও শোনা গেল ।

কাজ চুকিয়ে এবার ফেরবার পালা । ইস্, এখনও ওদের টাটকা আনা হাতেব মশলাগুলো হাতেই রয়ে গেল ।

ওঃ কী চেষ্টাটাই না তারা করেছিল ।

ফোরম্যান হাঁকতে লাগল,—মশলা, আবো মশলা !

নীচে ওরা সবে এক বাক্স নতুন মশলা বানিয়েছে । এখন আর দেয়াল গেঁথে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই । মশলার বাক্সটা যদি খালি করে ফেলা না যায়, তাহলে কাল এমনিতেই লোকজনেরা এসে হয়ত জ্বালানী করবার জন্যে বাক্সটা চেলা করে ফেলবে । মশলাগুলো জমে এমন শক্ত পাথর হয়ে যাবে যে, তখন আর কুড়ুল দিয়ে ঘা মেরেও তাকে কোনোরকম কায়দা করা যাবে না ।

শুখভ চেঁচিয়ে ডাকল সবাইকে,—চলে এসো ভাই, কাজে ঢিল দিও না ।

শুখভ চটে গেছে । এইরকম পেটের-ছেলে-পড়ে-যাওয়া হাঁ-হাঁ-করা ভাব দেখলে তার গা জ্বালা করে । কিন্তু সেও তালে তাল দিয়ে হাত চালিয়ে যাচ্ছে । তা যদি বলো, এছাড়া করবেই বা কী ?

পাভ্‌লো কোমরে কর্নিক গুঁজে একটা ঠেলাগাড়ি টেনে নিয়ে এক দৌড়ে মই বেয়ে ওপরে উঠল । ওপরে উঠেই চাঙড় বসাতে লেগে গেল । পাঁচ পাঁচটা কর্নিক বাঁই বাঁই করে ছুটছে ।

এবার দুই দেয়ালের জোড়ের কাজটা সেরে ফেলো । শুখভ একবার তাকিয়ে দেখে নিল কোন্ চাঙড়টা ওখানে বসবে । তারপর আলিওশার হাতে হাতুড়িটা এগিয়ে দিয়ে বলল,—একটু পাশগুলো মেরে দাও তো হে !

তাড়াতাড়ির কাজ কখনও ভাল হয় না । এখন যখন সবাই তাড়াহুড়ো করছে, শুখভ তখন সময় নিয়ে আস্তে আস্তে দেয়ালটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল । সেন্‌কাকে বাঁদিকে সরিয়ে দিয়ে শুখভ নিজে ডানদিকে দুই দেয়ালের আদত জোড়টার দিকে সরে গেল । কোণটা এখন যদি জবরজং হয়, তাহলে সব মাটি । কাল তাহলে পুরো আধবেলা যাবে ওটা শোধরাতে ।

—র'সো ! ব'লে পাভ্‌লোকে একটা চাঙড়ের কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শুখভ সেটা নিজে হাতে বসিয়ে দিল । ওদিকে সেন্‌কার কাণ্ডটা দেখ ! লাইন এঁকে বেঁকে গেছে । শুখভ ছুটে গিয়ে দুটো সিমেন্টের চাঙড় বসিয়ে সেনকার ভুল শুধরে দিল ।

বুইনভ্‌স্কি ভাল ঘোড়ার মত আরেক ঠেলা মশলা নিয়ে এল । এনে বলল,—আরও দু ঠেলা মাল আসছে ।

বুইনভ্‌স্কির পা টলছিল, কিন্তু তবু সে মাল বওয়া ছাড়েনি । এককালে ঐ ক্যাপ্টেনের মত একটা ভাল ঘোড়া ছিল শুখভের । তাকে সে খুব যত্নও করত । কিন্তু শেষ পর্যন্ত

ঘোড়াটাকে কেটে ফেলতে হয়েছিল। তার ছালটা ছাড়িয়ে শুখভ রেখে দিয়েছিল।

দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গপ্‌চিক এসে ওদের চোখে আঙুল দিয়ে আর দেখাচ্ছে না বটে—কিন্তু ওরা এখন নিজেরাই দেখতে পাচ্ছে : সব ব্রিগেডের লোকজনেরাই যন্তরপাতি জমা দিয়ে এসে এখন গুমটিঘরের দিকে পিল্ পিল্ করে চলেছে। কেউ অত বোকা নয় যে ঘণ্টা বাজবার পর অমনি বাইরে বেরোবে। বাইরে দাঁড়াতে হলে তো সব ঠাণ্ডায় জমে যাবে। সব্বাই যে যার মাথা গুঁজবার জায়গায় বসে থাকবে। তারপর একটা সময় আসবে যখন ফোরম্যানেরা সবাই এ বিষয়ে একমত হবে যে, হ্যাঁ—এইবার বেরিয়ে পড়া যায়—তখন হুড়মুড় করে সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। ফোরম্যানেরা যদি সবাই একমত না হয়, তাহলে কয়েদীর দল যে যার জায়গায় কে কতক্ষণ বসে থাকতে পারে তাই নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দেবে—যদি রাত দুপুর অবধি বসে থাকতে হয় তাও ভি আচ্ছা। লোকগুলো এমনি ইতর, এমনি ওদের শুয়োরের গোঁ।

অবশেষে তিউরিনের হুঁশ হল—না, এতটা দেরি করা তার উচিত হয়নি। যে ঘরে যন্তর জমা নেয়, সে ঘরের মুন্সী এতক্ষণে হয়ত তিউরিনকে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছে।

তিউরিন গলা বার করে বলল,—ওহে, ওইটুকুর জন্যে আর মায়া করে লাভ নেই। যারা বওয়াবওয়ি করছে, তারা চলে যাও নীচেয়। মশলা মেশানোর বড় বাক্সটা চেঁছে যা পাও উঠোনের গর্তটার মধ্যে ঢেলে ফেলো। ওপরে বরফ চাপা দিয়ে দিও, তাহলে আর কেউ দেখতে পাবে না। আর শোনো, পাভ্‌লো। সঙ্গে দুজন লোক নিয়ে যন্তরপাতিগুলো যোগাড় করে তুমি মালখানায় জমা দিয়ে এসো। হাতের এই মশলাটা শেষ হয়ে গেলেই গপ্‌চিককে দিয়ে এই কর্নিক তিনটে আমি পাঠিয়ে দেব।

হুটপাট করে সবাই ছুটল। শুখভের হাতুড়ি আর ওলন-সুতো তারা নিয়ে গেল। যারা মশলা বইছিল এবং ঠেলাগাড়ি টানছিল, তারা সবাই ছুটে মেশিনঘরে চলে গেল—কেননা তাদের তো আর করবার কিছু নেই। শুধু তিনজন রাজমিস্ত্রি থেকে গেল নিজেদের জায়গায়—কিল্‌গাস, ক্লেভ্‌শিন আর শুখভ। তিউরিন দেখে বেড়াতে লাগল কতটা কাজ হয়েছে। কাজ দেখে খুব খুশী হল সে।

—কাজ দেখছি মন্দ হয়নি আধ বেলায়। তাও তো শালার কপিকল ছিল না, কিছুই ছিল না।

শুখভ দেখতে পেল কিল্‌গাসের মশলা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কর্নিকগুলো দিতে দেরি হবার জন্যে যন্তরপাতির ঘরে তিউরিনকে গাল দেবে—এই ভেবে শুখভের বিশ্রী লাগছিল।

শুখভ বলল,—ওহে, শোনো—তোমাদের কর্নিকদুটো গপ্‌চিককে দিয়ে পাঠিয়ে দাও। আমার কর্নিকটা হিসেবের বাইরে ; ওটা জমা করতে হবে না। বাকি কাজটা আমি একাই সেরে ফেলব।

ফোরম্যান হো হো করে হাসল ।—এখান থেকে যখন তুমি খালাস পাবে, কোন্ প্রাণে তোমাকে আমরা বিদায় দেব ? সারা জেলখানা যে কেঁদে ভাসাবে !

শুখভও হো হো করে হেসে উঠে দেয়াল গাঁথতে লাগল ।

কিল্‌গাস কর্নিকগুলো নিয়ে চলে গেল । সেন্‌কা সিমেন্টের চাঙড়গুলো শুখভের দিকে ঠেলে কিলগাসের বাকি মশলাটুকু এদিককার ঠেলার ভেতর ঢেলে দিল ।

পাভ্‌লোকে ধরবার জন্যে যন্তরপাতির ঘর অবধি গপ্‌চিক গোটা রাস্তা ছুটতে ছুটতে গেল । ১০৪নং ব্রিগেড মাঠ পেরিয়ে গেটের দিকে চলল । সঙ্গে তিউরিন নেই । ফোরম্যান থাকলে জোর হয় । কিন্তু কনভয়-গার্ডের ক্ষমতা আরও বেশী । যারা দেরিতে আসে, ওরা তাদের নাম টুকে নেয়—তারপর তাদের সেল-হাজতে সাজা খাটায় ।

বেরোবার মুখে দু দফায় গুন্‌তি হয় । গেট যখন বন্ধ থাকে, তখন একবার এলাকার মধ্যে গুন্‌তি হয় ; তারপর দ্বিতীয় দফায় গুন্‌তি হয় খোলা গেট দিয়ে বেরোবার সময় । যদি ওরা মনে করে গুনতে গিযে কোনোরকম ভুল হয়েছে,তাহলে গেটের বাইরে গিয়ে আরেক দফা গোনা হয় ।

তিউরিন আর ত্বরা সইতে না পেরে বলল,—নিকুচি করেছে মশলার । দাও দেয়াল টপ্‌কে ফেলে ।

ফোরম্যান, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না, চলে যাও । গেটে তোমাকে দরকার হবে ।

সাধারণত শুখভ ফোরম্যানকে সমীহ্ করে আন্দ্রেই প্রোকোফিয়েভিচ বলেই ডাকত । কিন্তু এখন কাজ করার গুণে সে ফোরম্যানের সঙ্গে এক পর্যায়ে উঠে এসেছে । শুখভ অবশ্য মনে মনে স্পষ্ট করে একথা বলেনি যে, 'দেখ হে, আমি তোমার সমান', তাহলেও তার অমনি মনে হয়েছে । তিউরিন যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে, শুখভ একটু ইয়ার্কি মেরে বলল,—কাজের দিনটাকে ছেঁটে ওরা এত ছোট করে দেয় কেন ? হাত যখন সবে খুলতে আরম্ভ করে, তখনই দেখি দিন কাবার ।

কালা লোকটার সঙ্গে শুখভ একা পড়ে গেল । ওর সঙ্গে বেশী কথা বলা যায় না । আর তাছাড়া, এমন কিছুই নেই যা ওকে শোনানো যায় ; ওদের সকলের চেয়েই ও বেশী সেয়ানা ! সব কথাই ও বুঝে নেয়—মুখ ফুটে ওকে বলবাব দরকার হয় না ।

চটপট মশলা পড়ছে । ফটাফট চাঙড় বসছে । ঠেসেঠুসে দাও । দেখ ঠিক সমান হল কিনা । ঠিক হ্যায় । আচ্ছা, এবার মশলা । তারপর চাঙড় । মশলা । চাঙড় ।

তিউরিন বলে গিয়েছিল মশলার জন্যে মায়া করে লাভ নেই—বলেছিল দেয়াল টপ্‌কে ফেলে দিতে । ওরা সবাই দৌড় মেরেছে শুখভকে একা রেখে । কিন্তু আট বছর ক্যাম্পে কাটিয়েও শুখভ যে গর্দভ সেই গর্দভই রয়ে গেছে । চোখের ওপর কোনো জিনিস, কোনো কাজ এতটুকু অপচয় নষ্ট হয়ে যেতে দেখলে তার আর সহ্য হয় না ।

মশলা । চাঙড় । মশলা । চাঙড় ।

সেন্‌কা চেঁচিয়ে উঠল,—ব্যস, কাজ ফতে । মার কেল্লা ! চলো, এবার ছুট দিই ।

দুজনে ঠেলাগাড়িটা বাগিয়ে ধরল । তারপর সিঁড়ি বেয়ে সটান নীচে ।

কিন্তু কেমন কাজ হয়েছে দেখবার জন্যে শুখভও আরেকবার দৌড়ে চলে গেল। পাহারাওয়ালা সেপাইরা ওর পেছনে যদি কুকুর লেলিয়ে দিত, তাহলেও ওকে নিরস্ত করতে পারত না । মন্দ হয়নি তো । এবার একছুটে দেয়ালের কাছে গিয়ে ডান থেকে বাঁয়ে একদফা তাকাল । ওর চোখ অনেকটা রাজমিস্ত্রিদের লেভেল ঠিক করার যন্ত্রের মত । সব একদম সিধে । এখনও ওর হাত খুব পাকা ।

শুখভ মই বেয়ে তর তর করে নেমে এল ।

সেনকা মেশিনঘর থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে ছুটছিল ।

পেছন ফিরে সেন্‌কা হাঁক দিল,—পা চালিয়ে এসো ভাই, পা চালিয়ে.।

শুখভ তাকে হাতের ইশারা করে বলল,—তুমি এগোও । আমি এই এলাম ব'লে । এই ব'লে শুখভ মেশিনঘরে ঢুকল । কর্নিকটা তো আর যেখানে সেখানে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না । কাল সে নাও কাজে আসতে পারে । শেষ পর্যন্ত 'সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন' নগবে ওদের যে ঠেলে পাঠাবে না, তাই বা কে বলতে পারে ? তাহলে তো ছ'মাসের ধাক্কা । তার আগে সে আর এমুখো হবে না । সুতরাং কর্নিকটা খুইয়ে কী লাভ ? একবার যখন জিনিসটা সে হাত করেছে, তখন হাতে রাখাই ভাল ।

মেশিনরুমের সব চুল্লীই নেভানো । ভেতরে ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার । শুখভের ভয় করতে লাগল । ভয় অন্ধকারের জন্যে নয়—ভয় লাগছে একা পড়ে যাওয়ার জন্যে ; ভয়—গুমটিঘরে গন্‌তির সময় একা শুখভই বাদ পড়ে যাবে ব'লে ; ভয়—কন্‌ভয়-গার্ডরা শুখভকে ধরে ধোলাই দেবে ব'লে ।

সে যাই হোক, অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে শুখভ ঘরের কোণে একটা বড় পাথর দেখতে পেল । পাথরটা সরিয়ে তার নীচে কর্নিকটা লুকিয়ে রেখে পাথরটা আবার টেনে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিল । এখন সব ঠিকঠাক !

এইবার ছুটে গিয়ে সেনকাকে ধরে ফেলতে হবে । কিন্তু সেনকা সামান্য একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুখভের জন্যে অপেক্ষা করছিল । সেনকা কখনও কাউকে একা মুশকিলে ফেলে পালায় না । যদি বিপদ দেখা দেয়, দুজনে একসঙ্গে মিলে তার মহড়া নেবে ।

দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটতে লাগল । একজন ঢ্যাঙা, একজন মাথায় খাটো । সেন্‌কার তুলনায় শুখভ নেহাৎই বেঁটে ।

ফ্যা-ফ্যা-করে-বেড়ানো কিছু লোক আছে, যারা নিজেরা সাধ করে স্টেডিয়ামের মাঠে দৌড়োদৌড়ি করে । শুখভের একবার দেখতে ইচ্ছে করে সারাদিন খাটুনির পর, পিঠ যখন এলিয়ে পড়ে, তখন ভিজে হাতমোজা আর তালি-মারা জুতো পরে ছুটুক তো দেখি দস্যিগুলো । হ্যাঁ, আর এইরকম ঠাণ্ডার মধ্যে !

দুজনে দৌড়োচ্ছে ঠিক হন্যে কুকুরের মত । নিজেদের নিশ্বাস ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজই তাদের কানে যাচ্ছে না—নিশ্বাস নিচ্ছে, ছাড়ছে—নিচ্ছে, ছাড়ছে ।

যত যাই হোক, তিউরিন তো গুমটিঘরে আছে । তিউরিনই ওদের হয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে দেবে ।

এবার ওরা সোজা ছুটে চলেছে যেদিকে গাদা গাদা লোক ভিড় করে আছে সেইদিকে । দেখলে ভয় ধরে যায় ।

হঠাৎ একসঙ্গে শত শত গলা সমস্বরে ওদের দুজনকে লক্ষ্য কবে ধিক্কার দিয়ে উঠল । দুজনকে তারা বাপ-মা তুলে, নাক-মুখ-কলজের কথা বলে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব খিস্তি খেউড় করতে শুরু করে দিল । পাঁচশো লোক যখন একসঙ্গে কাবো ওপর ক্ষেপে ওঠে, তখন তার কী সাংঘাতিক অবস্থা হয় !

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, কনভয়-গার্ডদের কী অবস্থা ? কী মতিগতি তাদের ?

না । ওরা এ-সবের মধ্যে নেই । তিউরিন হাজির আছে । শেষ সারিতে । তিউরিন আগেভাগেই ব্যাপারটা খোলসা করে বলে দিয়েছে । দোষটা সে নিজের ঘাড়েই নিয়েছে ।

কিন্তু কয়েদীরা ছাড়ছে না । তারা হৈ চৈ করছে আর কেবল গাল দিচ্ছে । ওদের চেঁচানি এমন কি সেনকা পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছে । হঠাৎ লম্বা-চওড়া চেহারা নিয়ে বুক ফুলিয়ে সেনকা ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল । সেনকা বরাবরকার শান্ত নিবীহ মানুষ । এবার হঠাৎ সে গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল । ঘুসি পাকিয়ে সে লড়বার জন্যে তৈবি হল । তক্ষুণি কয়েদীর দল একদম চুপ । একজন হেসে উঠল,—ওহে, একশো চার ! তোমাদেব উনি তাহলে কালা নন । অন্যেরা চেঁচিয়ে উঠল,—ধবা পড়ে গেছে । ধরা পড়ে গেছে ।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল । এমন কি কনভয়-গার্ডরাও হাসি চেপে রাখতে পারল না ।

—পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়িয়ে যাও !

কিন্তু পাহারাওয়ালারা গেট খুলল না । নিজেদেব ওপরও ওদের বিশ্বাস নেই । গেট থেকে ওরা লোকজনদের ঠেলে পেছনে সরিযে দিল । লোকে গেটের কাছে ভিড় করেছিল ; মনে করছিল তাহলেই বুঝি আগে আগে বেবোতে পারবে—বোকা আর বলেছে কাকে ।

—দাঁড়িয়ে যাও, পাঁচজন পাঁচজন । এক ! দুই ! তিন...

ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-পাঁচজনের এককেটি দল হাতকয়েক সামনে এগিয়ে গেল ।

শুখভ দাঁড়িযে থেকে দম নিতে নিতে চারদিকে তাকাচ্ছিল । চাঁদমামাকে আগে আগেই মুখ লাল করে চোখ রাঙাতে দেখা গেল । কৃষ্ণপক্ষ নিশ্চয় শুরু হয়েছে । কাল রাত্রে চাঁদ ছিল আরেকটু ওপরে ।

সুভালাভালি সব দিক রক্ষা হয়ে যাওয়ায় শুখভের মেজাজ খুব ভাল । শুখভ কনুই দিয়ে ক্যাপ্টেনকে খোঁচা মারল ।

—আচ্ছা, ক্যাপ্টেনসাহেব ! তোমাদের বিজ্ঞান কী বলে গো—চাঁদমামা যায় কোথায় ?

—যায় কোথায়, মানে ? কী গর্দভ ! দেখা যায় না, ব্যস্‌ এই

শুখভ মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল ।

—দেখা যদি না যায় তো জানলে কী করে যে আছে ?

ক্যাপ্টেন হাল্‌ ছেড়ে দিয়ে বলল,—তোমার কী ধারণা ? প্রত্যেক মাসে নতুন নতুন চাঁদ হয় ?

—কেন ? হলে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে ? বছরভর রোজ মানুষ জন্মাচ্ছে, তার বেলায় ! চার হপ্তা পর পর চাঁদ জন্মাতে পারে না ?

ক্যাপ্টেন ঠোঁট উল্টে বলল,—ফূঃ ! এমন একজন খালাসীও দেখিনি যে তোমার মত বোকা । চাঁদমামা কোথায় যায় বলে তোমার মনে হয় ?

শুখভ কান এঁটো করে হেসে বলল,—সেই কথাই তো জিজ্ঞেস করছি । কোথায় যায় ?

—আমাকে বলো তুমি, কোথায় যায় ?

শুখভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরনো কথা মনে করল ।

—গাঁয়ের লোকে বলত, ভগবান নাকি চাঁদমামাকে ভেঙেচুরে আকাশের তারা গড়েন ।

ক্যাপ্টেন হেসে বলল,—একেবারেই জংলী ব্যাপার । এমন কথা এই প্রথম শুনছি । তুমি কি ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করো, শুখভ ?

শুখভ তো অবাক । বলল,—করি বৈকি, কেন করব না ! আকাশে গুড় গুড় করে যখন দেবতা ডাকে, বিশ্বাস না করে পারা যায় ?

—ভগবান কিসের জন্যে ওসব করবে ?

—কী করবে ?

—ঐসব, চাঁদ ভেঙে তারা করা—কেন করবে ?

শুখভ ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে বলল,—কি গো, এও বোঝো না ? তারাগুলোর সময় ফুরোলেই একে একে খসে পড়ে যায় । তাদের জায়গায় তখন নতুন নতুন তারা বসানোর দরকার হয় ।

একজন কনভয়-গার্ড বিশ্রী গাল দিয়ে উঠে বলল,—ঘুরে দাঁড়া ! লাইন ঠিক কর !

ওরা এবার গন্‌তির পাল্লায় এসে পড়েছে । পঞ্চম শতকের কোঠায় পাঁচ বারোং লোক গোণা হয়ে গেছে । পেছনে আছে দুজন—বুইনভ্‌স্কি আর শুখভ ।

কন্‌ভয়-গার্ডেরা ভারি সমস্যায় পড়ে গেছে । হন্তদন্ত হয়ে ওরা নম্বর লেখার বোর্ডগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চালাচ্ছে । গন্‌তিতে কম হয়েছে ! এবারও একজন কম পড়ছে ! ভাল করে ওদের গুনতে শেখানো হয় না কেন ?

গুনেটুনে ওদের ৪৬২ হচ্ছে । ওরা বলছে, হওয়া উচিত ৪৬৩ ।

আবার ওরা সবাইকে ঠেলেঠুলে গেট থেকে হটিয়ে দিল । কয়েদীরা আবার গেটে ভিড় করেছিল । তারপর আবার একবার,—পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়াও । এক ! দুই !

একজন একজন করে এগিয়ে-পেছিয়ে হাঁটছে—যার যা-কিছু ছিল সব নিঃশেষে তারা একটাব পব একটা গায়ে চড়িয়েছে । পায়ে পায়ে যাতে জড়িয়ে না যায় তার জন্যে মাঝখানে খানিকটা কবে জায়গা ছেড়ে বাখা হয়েছে । এইভাবে লাইনবন্দী হয়ে তাবা হাজিবা দেবাব মাঠে এসে পড়ল । পায়েব নীচে মুচ মুচ কবে ববফ ভাঙাব শব্দ ছাড়া চলতে চলতে তাদেব আর কোনো আওয়াজ নেই ।

আকাশেব পূবদিকটা সবুজাভ আব ফিকে হলেও অন্ধকাব তখনও কাটেনি । তাব ওপব পূবদিক থেকে শন শন কবে বিশ্রী একটু হাওয়াও বইছিল ।

দিনেব মধ্যে এটাই সবচেয়ে জঘন্য সময়—সাতসকালে এই অন্ধকাবে, এই ঠাণ্ডাব মধ্যে ঘবেব বাইবে গিয়ে সাবাদিনেব মত পেটে খিদে নিয়ে এই লাইনে দাঁড়ানো । জিভগুলো যেন কেউ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়েছে । কাবো সঙ্গে কথা বলবাব প্রবৃত্তি নেই ।

হাজিবা দেবাব মাঠে একজন নিম্নপদস্থ তদারকী অফিসাব ছুটোছুটি কবছিল । বেগেমেগে সে বলল,—ওহে তিউবিন, আব আমবা কত দেবি কবব ? তোমাব দেখছি আবাব সেই গয়ংগচ্ছ ভাব শুরু হয়েছে ।

হেঁজিপেঁজি অফিসাবকেও ভয় কবে শুখভ । তিউবিন তাকেও গ্রাহ্য কবল না । তিউবিনেব ভাবি দায় পড়েছে এই ঠাণ্ডায় ওব সঙ্গে কথা বলতে । বিনা বাক্যব্যয়ে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগল । আব তাব পেছন পেছন গোটা ব্রিগেড খচব-মচব চিড়িকমিড়িক কবে এগোতে লাগল ।

এক সেব শুয়োবেব মাংস ঘুষ দিয়ে দেখাই যাচ্ছে বেশ কাজ হয়েছে ; কেননা, ১৪০ নম্বব ব্রিগেড তাদেব সেই পুবনো জায়গাতেই এখনও বহাল আছে ; ওদেব চেয়েও যাদেব হীন অবস্থা, যাবা একটু হাঁদা গঙ্গারাম—তাদেবই সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন নগবে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে । ইস, কিন্তু কী সাংঘাতিক দশা হবে আজ ওদেব—মাইনাস সতেবো, কনকনে বাতাস, তাব ওপব একটু কোনো আশ্রয় নেই, আগুন নেই ।

ব্রিগেডেব ফোবম্যানেব অনেকটা কবে নধব শুয়োবেব মাংস লাগে । খানিকটা লাগে পবিকল্পনা আব উৎপাদন বিভাগে নিয়ে যাবাব জন্যে আব খানিকটা লাগে তাব নিজেব ভোগে । নিজেব বাড়ি থেকে না এলেও ফোবম্যানেব কখনও ও-জিনিসেব অভাব হয় না । ব্রিগেডেব যাবই বাড়ি থেকে পার্সেল আসুক, তক্ষুণি সে ফোবম্যানকে খানিকটা ভেট দিয়ে আসবে ।

নইলে তুমি বাঁচতে পাববে না ।

উপরওয়ালা অফিসাব একটা কার্ডেব গায়ে টুকে নিচ্ছিল : তোমাব দলে, তাহলে তিউবিন, একজন আজ অসুখ কবে ছুটিতে আছে । বাকি তেইশ জন উপস্থিত ?

কাকে পাওয়া যাচ্ছে না ? পান্তেলেয়েভকে পাওয়া যাচ্ছে না । ওব আবাব কখন অসুখ কবল ? সঙ্গে সঙ্গে ব্রিগেডসুদ্ধ লোক কানে কানে কথা বলতে শুরু কবে দিল । পান্তেলেয়েভ—কুত্তাটা আবাব ব্যাবাকে থেকে গেছে । অসুখ-টসুখ বাজে কথা । নিবাপত্তা বিভাগই ওকে আসতে দেয়নি । ও নিশ্চয় এখন কাবো নামে লাগানো ভজানো কবছে ।

১০৪ নম্বরের ডাক পড়ল সকলের শেষে। শুখভ দেখল দলের সবাই এসেছে খালি হাতে। সবাইকে এত বেশী খাটতে হয়েছে যে চুল্লীর জন্যে কাঠকুটো যোগাড় করবার আর সময় পায়নি। একমাত্র দুজনের কাছে কিছু কাঠকুটোর বাণ্ডিল আছে।

রোজ এই এক খেলা। ছুটির ঠিক আগে কয়েদীর দল এখান ওখান থেকে টুকরো-টাকরা কাঠ, কাঠি আর ভাঙা বাতা কুড়িয়ে ন্যাকড়ায় পুঁটলি করে কিংবা সুতো দিয়ে বেঁধে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। কিন্তু তার আবার নানান ফ্যাচাং। প্রথম তো গুমটিঘরে। ইমারত বিভাগের তদারককারী আর তার সঙ্গে কোনো একজন ছোটবাবু যদি থাকে, তাহলে বাণ্ডিলগুলো হাত থেকে ফেলে দেবার হুকুম হবে। অফিসারের দল বাজে খরচ করে লক্ষ লক্ষ টাকা ফুঁকে দিল তাতে কিছু হল না — এখন কয়েদীদের সামান্য কাঠকুটো থেকে বঞ্চিত করে ওঁরা খরচ কমাচ্ছেন।

কিন্তু কয়েদীদের আবার নিজেদের আলাদা হিসেব। ব্রিগেডেব প্রত্যেকে যদি কয়েকটা করে কাঠি জুটিয়ে আনে তাহলে ব্যারাকে ওরা একটু আগুন পোহাতে পারে। নইলে ব্যারাকের ফালতুদের দৈনিক মোটে পাঁচ সেব করে কয়লার গুঁড়ো বরাদ্দ। ওতে ঠাণ্ডার হাত থেকে আর কতটুকু বাঁচা যায়। সেইজন্যেই ব্রিগেডের লোকেরা কাঠিগুলো ভেঙে বা ছোট করে কেটে নিয়ে ওভারকোটেব নীচে লুকিয়ে বাখে—যাতে তদারককারী অফিসাব কাঠের বাণ্ডিলগুলো দেখে না ফেলে।

সঙ্গে যে কনভয়-গার্ডরা থাকে, তারা কক্ষনো কাজের এলাকায় বাণ্ডিলগুলো ফেলে দেবার কথা বলে না। জ্বালানী কাঠ তাদেরও দবকার। কিন্তু তারা নিজেরা কখনও বয়ে নিয়ে যাবে না। এক তো, চাকরির দিক থেকে তাতে ইজ্জতে বাধে। অন্যদিকে, হাতের সাব-মেশিনগানও একটা বাধা বটে—যদি গুলি ছুঁড়তে হয়। অবশ্য ক্যাম্পের গেটে পৌঁছুনোমাত্র কনভয়-গার্ডরা হুকুম করবে,—অমুক সারি থেকে তমুক সারি, কাঠ-কুটোগুলো এখানে নামিয়ে রাখো। কিন্তু তারা রয়ে সয়ে নেয়—ক্যাম্পের গার্ডবা পায় কিছু, আব কিছু পায় কয়েদীবা। তা না হলে তো কয়েদীবা কাঠকুটো আর আনবেই না।

ফলে, এই ব্যবস্থা: প্রত্যেকটি কয়েদী প্রত্যেকদিন কাঠ বযে নিয়ে যাবে। কোনদিন কে নিয়ে যেতে পারবে, কোনদিন কারটা বেহাত হবে—আগে থেকে কেউই বলতে পারে না।

শুখভ পায়ের কাছে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছিল কোথাও কোনো কাঠকুটো পড়ে আছে কিনা। ইতিমধ্যে তিউরিন তার দলের লোক গনতি করে গার্ডদের কর্তাকে জানিয়ে দিল।

—একশো চার—সবাই হাজিব।

অফিসকর্মীদের দল থেকে ঠিক তখনই ৎসেজার নিজের ব্রিগেডে ফিরে এসেছে। জ্বলন্ত পাইপটা থেকে হুসহুস করে সে ধোঁয়া ছাড়ছিল। তার কালো গোঁফে বরফ পড়ে সাদা হয়ে আছে।

ৎসেজার জিজ্ঞেস করল,—তারপর ? আছ কেমন, ক্যাপ্টেন ?

যার শরীর গরম রয়েছে সে কখনও ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া লোকের দুঃখ বুঝবে না। কেমন আছ—এ প্রশ্নের কোনো মানে হয় না।

ক্যাপ্টেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,—কেমন আছি জিজ্ঞেস করছ ? আর বলো না। এমন হাড়ভাঙা খাটনি গেছে যে, কোমর সোজা কবতে পারছি না।

অন্তত এ থেকেও বোঝা উচিত ক্যাপ্টেনকে একটা সিগাবেট খাওয়ানো দরকার।

ৎসেজাব ক্যাপ্টেনকে সিগারেট খাওয়াল। দলের মধ্যে একমাত্র ক্যাপ্টেনের সঙ্গেই ৎসেজার যা একটু মেলামেশা কবে। দ্বিতীয় আর কেউ নেই যার সঙ্গে সে কথাবার্তা বলতে পারে।

সবাই ফিসফিস গুজগুজ করছে,—৩২ নম্বর থেকে একজন কেটেছে! ৩২ নম্বর থেকে।

৩২ নম্বব ব্রিগেডেব সহকাবী ফোবম্যান এবং তার সঙ্গে আরেক ছোকরা মোটর মেরামতী কারখানায় ছুটে গেল নিখোঁজ লোকটির সন্ধান করতে। ভিড়ের মধ্যে সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস কবতে লাগল,—কে-কী-কেন-কোথায ? সকলেই জানতে চায়। লোকপরম্পরায় শুখভের কানে এল : ছোটখাটো শ্যামবর্ণ মোলদাভিয়াব লোকটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। মোলদাভিয়ার কোন লোক ? যাকে রুমানিযার গুপ্তচর বলা হত —সত্যিকার যে স্পাই সে নিশ্চয় নয় ?

প্রত্যেক ব্রিগেডেই খুঁজলে গুটি পাঁচেক করে স্পাই মিলবে। তবে তারা বানানো স্পাই. সত্যিকাবেব নয়। ওদের বিরুদ্ধে এমনভাবে কাগজপত্র সাজানো হয়েছে, যাতে ওদের খাঁটি স্পাই বলে মনে হবে। আসলে ওরা সবাই ছিল প্রাক্তন যুদ্ধবন্দী। শুখভ নিজেও ছিল ঐ পদের স্পাই।

কিন্তু মোলদাভিয়ার লোকটি ছিল যথার্থই একজন স্পাই।

গার্ড বাহিনীর কর্তা কয়েদীদের তালিকাটা দেখল। দেখে তার মুখ কালো হয়ে গেল। স্পাই হয়ে কেউ যদি পালায় তাহলে কনভয়-কর্তার কী দশা হবে ?

লোকজনেরা সবাই, মায় শুখভ পর্যন্ত রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল। মড়াখেকো, কালকেউটে, ছুঁচো, পাজী, শুয়োর স্পাইটার জন্যে এ কী পেড়ার বলো তো ? সন্ধেব ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারে একটুখানি যা চাঁদের আলো। আকাশে মিটমিট করছে তারা; বাত্রে ঠাণ্ডা বেশ জাঁকিয়ে পড়বে, তার তোড়জোড় চলেছে। এইসময় শালার বেটা শালা বেপাত্তা হয়ে গেল। কেন ? খেটে খেটে তোর বুঝি আশ মিটছিল না ? সরকারী কাজের যা সময় —উদয়াস্ত এগারো ঘণ্টা—তাতে বুঝি শানাচ্ছিল না ? দাঁড়া, দাঁড়া—ঘানি টানাব মেয়াদ আদালত আরও খানিকটা বাড়িয়ে দেবে।

কাজে কেউ এতটা মত্ত হতে পারে যে, ছুটির ঘণ্টা বাজলেও শুনতে পায় না — শুখভের কাছে এটা অদ্ভুত ঠেকল। শুখভ নিজেই একটু আগে ঐরকমভাবে কাজ করছিল, সাত-তাড়াতাড়ি কাজ ফেলে উঠে আসতে হয়েছিল বলে তার তখন কী মন

খারাপ—এখন আর সেসব কথা তার মনেও নেই। কিন্তু এখন আর সকলের মত তাকেও ঠাণ্ডায় জমে যেতে হচ্ছে। মোল্‌দাভিয়ার সেই লোকটির জন্যে তাদের বোধহয় আরও আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কন্‌ভয়-গার্ডরা লোকটাকে ধরে এনে কয়েদীদের এই বিরাট দঙ্গলের হাতে যদি একবার ছেড়ে দেয়, তাহলে নেকড়ের হাতে ছাগলছানা পড়লে তার যে দশা হয়—সেইভাবে এরা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

ঠাণ্ডা এইবার বেশ জবরভাবেই পড়তে আরম্ভ করল। স্থির হয়ে কেউ আর দাঁড়াতে পারছে না। হয় ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে মাটিতে তাল ঠুকছে, নয় দু-পা সামনে এগিয়ে আবার দু-পা পিছিয়ে আসছে।

মোল্‌দাভিয়ার লোকটা প্যালিয়েও তো যেতে পারে! জোর আলোচনা চলেছে এই নিয়ে। ও যদি দিনের আলো থাকতে কেটে পড়ে থাকে, তাহলে এক কথা। কিন্তু ও যদি এই ভেবে এখন ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে যে, গুমটির সেপাইরা বেরিয়ে চলে গেলে তারপর পালাবে—তাহলে অপেক্ষা করাটাই ওর কাল হবে। কাঁটাতারের নীচে যদি এমন কোনো চিহ্ন দেখতে না পাওয়া যায় যা থেকে বোঝা যাবে সে পালিয়েছে, তাহলে যতদিন না লোকটাকে পাওয়া যাচ্ছে ততদিন গুমটিতেই পাহারাওয়ালাদের থাকতে হবে—তিন দিন, চার দিন, এমনকি এক হপ্তা পর্যন্ত থাকতে হতে পারে। এটাই নিয়ম। এ নিয়মের কথা পুরনো কয়েদীরা সকলেই জানে। সাধারণত কেউ এখান থেকে পালালে কনভয়-গার্ডদের হাড়ে দুব্বো গজায়—না খেয়ে, না ঘুমিয়ে সারা দিন সারা রাত তাদের ডিউটি দিতে হয়। কখনও কখনও তাদের এত বেশী খাটানো হয় যে, রাগে ওরা পাগলা ক্ষ্যাপা হয়ে যায়। যে পালায়, তাকে আব তখন জ্যান্ত অবস্থায় তারা ফিরিয়ে আনে না।

ৎসেজার চেষ্টা করছিল ক্যাপ্টেনকে বোঝাতে,—যেমন ধরো, জাহাজের দড়ির গায়ে পাঁস্‌নেটা যখন পড়ো-পড়ো হয়ে ঝুলছিল—মনে আছে?

পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ক্যাপ্টেন বুইনভস্কি বলল,—হুঁ...উঁ।

—কিংবা সেই বাচ্চার পেরাম্বুলেটারটা। লম্বা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

—হ্যাঁ।... তবে ও-ছবিতে জাহাজের যেসব দৃশ্য দেখানো হয়েছে, সেগুলো কিরকম যেন সাজানো—পুতুল-পুতুল ভাব।

—আমাদের স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে মুভি ক্যামেরার একেলে সব কেরামতি দেখে দেখে।

—মাংসের পোকাগুলো দেখিয়েছে যেন একেকটা ধাড়ী কেঁচোর মতন। তা কি কখনও হতে পারে?

—কিন্তু সিনেমায় তো তুমি ওর চেয়ে ছোট দেখাতেই পারো না।

—বুঝলে, আমার তো মনে হয়—যে মাছ এখানে আমরা পাই, তার বদলে ঐ মাংস ওরা যদি ক্যাম্পে এনে একেবারে আধোয়া অবস্থায় উনুনে চাপিয়ে দেয়, তাহলে

আমরা তো...

হঠাৎ কয়েদীর দলে হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে একটা চিৎকার। ওরা তিন মূর্তিকে মোটর মেরামতী কারখানা থেকে হুড়মুড় করে বেরোতে দেখেছে। তার মানে, মোলদাভিয়ার লোকটাকে ওরা খুঁজে পেয়েছে।

গেটে দাঁড়িয়ে লোকে সুর করে সমস্বরে আওয়াজ দিতে লাগল।

তিন মূর্তিকে ছুটে এগিয়ে আসতে দেখে পরিত্রাহি চিৎকার উঠল,—শালা! ছুঁচো! নেড়ীকুত্তার বাচ্চা! গুখেকোর বেটা! শয়তানের ডিম!

শুখভ সুদ্ধু চেঁচাতে লাগল,—পাজী! ছুঁচো কোথাকার।

পাঁচশো লোকের কাছ থেকে আধঘণ্টারও বেশী সময় কেড়ে নেওয়া—যে সে ব্যাপার নয়—

মোল্‌দাভিয়ার লোকটা মাথা হেঁট করে নেংটে ইঁদুরের মত ছুটছিল।

পাহারাদার সেপাই চেঁচিয়ে উঠল,—এই! থাম! ওর নম্বর লিখে নিতে নিতে বলল—ক-৪৬০! ছিলি কোথায়?

বলে লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে রাইফেলের কুঁদোটা উঁচিয়ে ধরল।

ভিড়ের মধ্যে তখনও কেউ কেউ চেঁচাচ্ছিল,—পাজী বদমাশ! নচ্ছার! শুয়োর!

পাহারাদার সেপাইকে রাইফেলের কুঁদো তুলে ধরতে দেখে বাকি সবাই চুপ হয়ে গেল।

মোলদাভিয়ার লোকটি কোনো কথা বলল না। মাথা নীচু করে পেছনে শুধু একটু সবে দাঁড়াল।

৩২ নম্বর ব্রিগেডের সহকারী ফোরম্যান সামনে এগিয়ে এল: কলি ফেরানোর ভারার ওপর কোন ফাঁকে উঠে বসে হতভাগা গরমে আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ব'লে লোকটার মুখে আচমকা একটা ঘুসি মেরে বসল। তারপর ঘাড়ে এক রদ্দা। মেরে মেরে লোকটাকে সেপাইয়ের কাছ থেকে সরিয়ে আনল।

মোলদাভিয়ার লোকটা চোখে সর্ষের ফুল দেখতে লাগল। ৩২ নম্বর ব্রিগেডেরই আবেকজন—এক হাঙ্গেরিয়ান—পেছন থেকে এসে তাকে পর পর কয়েকটা লাথি মারল।

এ তোমার স্পাইগিরি পাওনি। বোকা গবেটরাও স্পাই হতে পারে। স্পাই হলে ঝুটঝামেলা নেই, তোফা মজার জীবন। কিন্তু জেলখানায় দশ বছর ঘানি টানার পর বেঁচে থাকো তো দেখি, চাঁদ!

পাহারাদার তার রাইফেলটা নামাল।

কনভয়-গার্ডদের কর্তা হাঁক দিল,—গেট থেকে পিছিয়ে এসো। পাঁচজন করে দাঁড়িয়ে যাও।

কুকুরগুলো আবার গুনতে লেগেছে। সবই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে, আবার এখন গোনাগুনি কেন? কয়েদীরা গাঁইগুঁই করতে লাগল। মোলদাভিয়ার লোকটার ওপর থেকে রাগ পড়ে সব রাগ গিয়ে পড়ল এখন কনভয়-গার্ডের ওপর। ওরা জায়গা থেকে

না নড়ে নানারকম আওয়াজ দিতে লাগল ।

গার্ডদের কর্তা গজরাতে লাগল,—কী ? দেখবে, বরফের ওপর তোমাদের বসিয়ে রাখব ? বড় তেল হয়েছে, না ! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি । রাতভোর এখানে আমি তোমাদের ফেলে রাখব ।

ওর কিন্তু যে কথা সেই কাজ—এ বিষয়ে দুবার ভাববে না । করে তবে ছাড়বে । গার্ডদের হুকুমে কতবার ওদের বসে থাকতে হয়েছে । এমন কি শুতেও হয়েছে । শুয়ে পড়ো সব ! নইলে গুলি চলবে । এসব কথা কয়েদীদের জানা আছে ।

তাই ওরা সুড় সুড় করে গেট থেকে সরে দাঁড়াল ।

—হটো ! আরও হটো ! কনভয়-গার্ড ওদের ঠেলতে লাগল ।

চাপ পড়ায় পেছনের লোকেরা রেগে গিয়ে সামনের লোকদের বলল,—কেন গেটের গায়ে ঠেলছ ? এই আহাম্মকের দল !—পাঁচজন পাঁচজন করে গুনে নাও । এক ! দুই ! তিন !

চাঁদ এবার ঢলো ঢলো রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে । আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে । লাল রঙের ছোপ আর নেই । আকাশে তার সিকিভাগ রাস্তা পাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে । পুরো সন্ধেটাই মাটি । মোলদাভিয়ার ঐ হতচ্ছাড়া লোকটা ! ঐ হতচ্ছাড়া কনভয়-গার্ড । এই হতচ্ছাড়া জীবন !

সামনে যাদের গনতি হয়ে গেছে তারা ঘাড় ঘুরিয়ে ডিঙি মেরে মেরে দেখছে —শেষ সারিতে লোক আছে দুজন না তিনজন । এই মুহূর্তে ওদের জীবনমরণ এর ওপর নির্ভর করছে ।

এক মুহূর্ত শুখভের মনে হয়েছিল শেষ সারিতে সে যেন চারজন লোক দেখেছে; সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তার হাত-পা হিম হয়ে গিয়েছিল । লোক বেড়ে গেছে । আবার গোনো ! পরে বোঝা গেল ফেরুপাল ফেতিউকভ গিয়েছিল ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আধপোড়া সিগারেট ভিক্ষে করতে ; পরে ঠিক সময়মত নিজের গ্রুপে ফিরে আসতে না পারায় ওকে ফালতু হিসেবে সকলের শেষে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল ।

কনভয়-গার্ডের ছোটকর্তা চটে গিয়ে ফেতিউকভের ঘাড়ে জোরসে এক রদ্দা মারল ।

মেরেছে বেশ করেছে । মারাই উচিত ।

শেষ সারিতে হল তিনজন । হায় ভগবান ! হিসেব তাহলে মিলল ।

—গেট থেকে সরো! কনভয়-গার্ডরা আবার ঠেলা লাগাল ।

কিন্তু এবার আর কয়েদীরা গাঁইগুঁই করল না । ওরা দেখতে পেল, গুমটিঘর থেকে সেপাইরা বেরিয়ে গেটের দুপাশে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়াল ।

তার মানে, এবার ওদের বেরোতে দেওয়া হবে ।

তদারকী বিভাগের না বড়বাবু, না ছোটবাবু—কাউকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না । কাঠকুটোগুলো কয়েদীদের কাছেই এখনও আছে ।

গেট খুলে গেল । ওপাশে কাঠের বেড়ার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কনভয়-গার্ডের কর্তা আর তার সঙ্গে একজন গোনবার লোক ।

—এক ! দুই ! তিন !

গুনতি মিলে গেলে গুমটিঘর থেকে পাহাবাওয়ালাদের ওরা ডেকে নামিয়ে আনবে ।

সেই কোন দূরে দূরে গুমটিঘর । সেখান থেকে এলাকার ধার দিয়ে ধার দিয়ে আসতে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে যাবার অবস্থা হয় । নিঃশেষে সমস্ত কয়েদী এলাকা থেকে বেরিয়ে যাবার পর যখন দেখা গেল গুনতি মিলে গেছে, তখন গুমটিতে গুমটিতে টেলিফোন করে বলে দেওয়া হবে ; চলে এসো । কনভয়-গার্ডদেব কর্তা যদি চালাক লোক হয়, তাহলে সে তক্ষুনি ক্যাম্পের দিকে রওনা দেবে—কেননা সে জানে কয়েদীরা কোথাও পালাতে পাববে না এবং পাহাবাদার সেপাইরা পরে বেরোলেও বাস্তায় পা চালিয়ে ঠিক ওদের ধরে ফেলবে । কিন্তু কখনও কখনও গার্ডদের কর্তাটি হয গবেট ; সে ভয় পায়, পাছে একা তাব সশস্ত্র শান্ত্রীবা কয়েদীদের ঠিকমত সামলাতে না পাবে । তার জন্যে ওরা যতক্ষণ এসে না পৌঁছোয়, কয়েদীদেব দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ।

আজ সন্ধেয় গার্ডদের যে কর্তাটি ডিউটিতে এসেছে, সে অমনি এক মাথামোটা লোক । গুমটির সেপাইরা এসে না পড়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে লাগল ।

কয়েদীরা দিনভর বাইরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় জমে গেছে । এ যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু । আবার কাজ শেষ করাব পবও আরও এক ঘণ্টা হাড়-কাঁপানো শীতে বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে । কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে শীতের কষ্টের চেয়েও বেশী হচ্ছে তাদেব রাগ । গোটা সন্ধেটা বববাদ হয়ে গেল । এখন আর ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে কিস্যু করা যাবে না ।

শুখভ শুনতে পেল—তাব পেছনে যে পাঁচজন, তাদেব একজন বলছে,—ব্রিটিশ নৌবহরেব এত কথা তুমি কী করে জানলে ?

কেন জানব না ! এক ব্রিটিশ ক্রুজারে আমি যে মাসখানেক ছিলাম । সেখানে আমার নিজেব কেবিন ছিল । নৌবহরের সঙ্গে আমি ঘুরেছি । আমি ছিলাম লিযাজঁ অফিসার । তাবপর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইংরেজ অ্যাডমিবালের মাথায় কী যে ভূত চাপল—আমাকে সে হঠাৎ একটা উপহার পাঠিয়ে বসল । তার ওপর লেখা : কৃতজ্ঞচিত্তে । ব্যস, সেই উপহাবই কাল হল । অন্য সকলের সঙ্গে এখানে আমাকে ঠুসে দেওয়া হল । যুক্রেনী বেন্দেরভের লোকদের সঙ্গে এক বন্দীশালায় থাকতে—সত্যি, কী বিচ্ছিরি যে লাগে !

অদ্ভুত । চারিদিকে ধূ ধূ করছে মাঠ, খাঁ খাঁ করছে গোটা তল্লাট, চাঁদের আলোয় বরফ ঝলমল কবছে । অদ্ভুত দেখাচ্ছে সব । সামনে পেছনে দশ পা ছেড়ে ছেড়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে গেছে কনভয় । বন্দুক হাতে সেপাইরা তৈরি । কালো কালো একপাল কয়েদী । আর তার মধ্যে, অবিকল এক-ছাঁচেব ওভাবকোট গায়ে দিযে একজন লোক —কাঁধে সোনার তকমা ছাড়া জীবনের কথা একদিন যার কাছে অভাবনীয় ছিল, ইংরেজ অ্যাডমিরালের সঙ্গে যে লোক ওঠাবসা করত, আজ যাকে ফেতিউকভের সঙ্গে মিলে

ঠেলাগাড়িতে মাল বইতে হচ্ছে । শ্চ-৩১১ ।

হয় এস্পার, নয় ওস্পার—কার ভাগ্যে কখন কী ঘটে বলা যায় না...

কন্‌ভয়-গার্ডরা যে যার জায়গায় মোতায়েন হচ্ছে । চলে চলো, আর—'ভজনা-টজনা' নয় ।

—আগে বাড়ো ! জল্‌দি জল্‌দি !

আরে, রাখো তোমার জল্‌দি জল্‌দি । আর সব জায়গার কয়েদীরা অনেক আগেই রওনা দিয়ে বসে আছে । এখন আর তাড়াহুড়ো করে কী হবে । কয়েদীরা নিজেদের মধ্যে কোনো যুক্তিপরামর্শ করেনি—কিন্তু সকলেই ঠিক করে নিয়েছে তাদের কর্তব্য । আমাদের তোমরা ধরে রেখেছিলে, এবার আমরাও তোমাদের ধরে রেখে দেব । তোমরাও নিশ্চয় ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে হেদিয়ে উঠেছ ।

গার্ডদের কর্তা হাঁক দিল,—লম্বা লম্বা পা ফেলো । সামনেওয়ালা, জলদি চলো ।

রাখো তোমার 'লম্বা পা' । কয়েদীরা শ্মশানযাত্রীদের মত পা ঘষটাতে ঘষটাতে ঠায় চলতে লাগল । আর আমাদের কিছুতেই কিছু যায় আসে না । ক্যাম্পে তো সেই সকলের শেষেই আমরা পৌঁছুব । তোমরা তো আমাদের মানুষ বলে গণ্য করতে চাওনি । এখন যতই চেঁচিয়ে গলা ফাটাও না কেন ।

গার্ডদের কর্তা সামনে চেঁচাচ্ছে,—লম্বা লম্বা পা ফেলো । শেষকালে ও বুঝতে পারল কয়েদীরা কিছুতেই তেড়েফুঁড়ে এগোবে না । এদিকে সে গুলিও চালাতে পারে না । ওরা ঠিক লাইন বেঁধে পরের পর পাঁচজন পাঁচজন করে চলেছে । ওর বাপের সাধ্যি নেই কয়েদীদের এর চেয়ে জোরে জোরে হাঁটায় । সকালবেলায় ওরা যখন কাজে যায় তখন ওদের পা ঘষটানির জোরেই ওরা ধড়ে প্রাণটুকু জীইয়ে রাখে । যারা তাড়াতাড়ি ছোটে, তারা জেলখানায় তাদের মেয়াদ পুরো করবার সময় পায় না । দম ফুরিয়ে গিয়ে তারা পড়ে আর মরে ।

কাজেই তারা সাফ সাফ ঠায় একভাবে চলতে লাগল । বরফে ওদের বুটের মচ্‌ মচ্‌ শব্দ শোনা গেল । কেউ কেউ নীচু গলায় ফিস ফিস করে কথা বলছিল, কেউ কেউ একেবারে চুপ । শুখভ মনে করার চেষ্টা করছিল সেদিন সকালে ক্যাম্পে কোন্‌ জিনিসটা তার করা হয়নি । ও, মনে পড়েছে—হাসপাতালে যাওয়া ! যাই বলো, সত্যি আশ্চর্য কাণ্ড ! কাজে গিয়ে হাসপাতালের কথাটা শুখভ একেবারে বেমালুম ভুলে বসে আছে ।

হাসপাতালে লোক নেবার ঠিক এখনই হল সময় । ও যদি খাওয়াটা বাদ দেয়, তাহলে এখনও যেতে পারে । কিন্তু ওর গায়ের ব্যথাটা মরে গিয়েছে। ওর গা এখন এত ঠাণ্ডা যে, ওরা হয়ত টেম্পাবেচারটাও নেবে না । মিছিমিছি সময় নষ্ট । বিনা ডাক্তারেই শুখভ সেরে উঠেছে । এসব ডাক্তার তো রুগীকে টাঁসিয়ে দিয়ে রুগীর রোগ সারায় ।

এখন শুখভের কাছে হাসপাতালের আর তেমন আকর্ষণ নেই । এখন তার একমাত্র

চিন্তা রাত্রে খাবারের পরিমাণটা কিভাবে একটু বাড়ানো যায় । ৎসেজারেব পার্সেল পাওযার ওপরই এখন তার যা কিছু আশা ভরসা । অনেকদিন হয়ে গেল ৎসেজারেব কোনো পার্সেল আসেনি ।

হঠাৎ কয়েদীদের দলটার মধ্যে কেমন যেন ভাবান্তর দেখা গেল । একটা নড়েচড়ে ওঠার ভাব । আর আস্তে আস্তে পা মেপে মেপে চলা নয় । গোটা দলটা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে হুড়মুড় করে এগোতে শুরু করে দিল । শেষের পাঁচজন—তার মধ্যে ছিল শুখভ —হঠাৎ চেয়ে দেখে যারা সামনে ছিল তাদের চেয়ে তারা অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে । সামনের লোকদের ধরবার জন্যে তাদের ছুটতে হল । সামনের লোকদের ধরা গেল বটে, কিন্তু খানিকটা হেঁটে যাবার পর আবার তাদের ছুটতে হল ।

দলের শেষপ্রান্ত যখন পাহাড়ের মাথায়, তখন শুখভ ডানদিকে বহু দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে কয়েদীদের ছায়া-ছায়া আরেকটি দল দেখতে পেল । তারা কোণাকুণি রাস্তা ধরে হন্‌হনিয়ে এগোচ্ছে ।

যারা যন্ত্রপাতির ঘরে কাজ করতে যায় নিশ্চয় সেই দলটা ! ওদের দলে লোক আছে তিনশো । ওরাও নিশ্চয় বরাতদোষে আট্‌কে পড়েছিল । তা তো বুঝলাম, কিন্তু হয়েছিলটা কী ? প্রায়ই ওদের ছুটি হয় দেরিতে—হাতে একটা না একটা যন্ত্রপাতি থাকেই ; মেরামত শেষ না হলে তারা আসতে পারে না । অবশ্য তাতে ওদের খুব কিছু লোকসান নেই ; কারণ, সারাদিন কারখানার ভেতরে থাকে বলে ঠাণ্ডাটা লাগে না ।

এবার প্রশ্ন দাঁড়াল, কারা আগে পৌঁছুবে—ওরা, না এরা ! কয়েদীরা পাঁই পাঁই করে ছুটতে শুরু করে দিল । ছোটা যাকে বলে । কন্‌ভয়-গার্ডরাও দৌড়ুতে লাগল ।

এদিকে গার্ডদের কর্তা চেঁচাতে লাগল,—মাঝখানে ফাঁকা পড়ে না যায় । পেছনের লোক, এগিয়ে ! আরও ঘন হয়ে ।

—ওরে আমার তুমি রে ! যাও, যাও — অত চেঁচাতে হবে না । ঠাস করে চাঁটি মারব । চোখের মাথা খেয়েছ ? দেখছ না, আমরা ছুটছি ?

যেসব লোক এতক্ষণ ধরে চলতে চলতে ভাবছিল, কথা বলছিল—তাদের সেসব ভাবনাচিন্তা কথাবার্তা মাথায় উঠেছে । সারা দলের এখন একটাই চিন্তা—ওদের দলটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাও ! এগিয়ে যাও !

সব কিছু এমন তালগোল পাকিয়ে গেছে যে, এখন আর কনভয়-গার্ডরা কয়েদীদের যেন শত্রু নয়—বন্ধু । অন্য দলটা এখন শত্রু ।

মেজাজ ভাল হয়ে গেছে সকলের । এখন আর কারো রাগ নেই ।

পেছনের লোকেরা সামনের লোকদের ডেকে বলতে লাগল,—জোরে জোরে চলো, পা চালিয়ে চলো ।

মেশিন কারখানার লোকেরা যখন একসার বাড়ির আড়ালে পড়ে গেছে, সেই সময় আমরা এসে পড়েছি রাস্তায় । অন্ধকারে দুটো দল পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে ।

এখন আমাদের পক্ষে ছোটা সহজ, কেননা আমরা চলেছি রাস্তার মাঝখান দিয়ে। দুপাশে সেপাইদেরও এখন ছুটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়ার ভয় নেই। এইখানটাতেই আমরা ওদের মেরে বেরিয়ে যাব।

আগে গিয়ে পৌঁছুনো আরও এই কারণে দরকার যে, মেশিন-কারখানার দলের লোকদের অনেকক্ষণ ধরে তন্ন তন্ন করে গা-তল্লাসি করা হয়। ক্যাম্পে ছুরি মারার প্রথম ঘটনাটা ঘটবার পর থেকেই অফিসাররা মনে করছে—মেশিন-কারখানায় তৈরি হয়ে ছুরিগুলো ক্যাম্পে এসেছে। কাজেই ক্যাম্পে ঢুকবার মুখে মেশিন কারখানার লোকদের এখন একটু বেশিরকম তল্লাসি করা হয়।

শীত যে সময়ে পডব-পড়ব করছে, মাটি যখন কনকনে হতে শুরু করেছে, তখনই পাহারাঅলা সেপাইরা হাঁক দিত,—যাবা মেশিন-কারখানাওয়ালা, জুতো খুলে ফেলো! জুতোগুলো হাতে নাও।

আর তারপর খালি পা করে ওদের তল্লাসি করত।

আর এখন তো ভবা শীত। এই ঠাণ্ডার মধ্যে এখনও তারা এলোপাথাড়ি লোক ধরে ধরে খোঁচায়,—ওহে, শুনছ—খুলে ফেলো তোমার ডান পায়ের বুটটা। আর এই যে, খোলো তো বাছাধন তোমার বাঁ পায়ের বুটটা।

যাকে বলা হয়, সে তাব ফেল্টের বুটটা খুলে ফেলে, এক পায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বুটটা উপুড় কবে আর পাটিব কাপড়টা ঝেড়েঝুড়ে দেখায়। এই দেখ, এর মধ্যে কোনো ছুরিছোরা লুকোনো নেই।

মেশিন কারখানার লোকেরা গতবার গ্রীষ্মের সময় ভলিবলের দুটো খুঁটি নিয়ে এসেছিল ক্যাম্পে; সেই খুঁটিব ভেতব নাকি ওরা ছোরাছুবি লুকিয়ে এনেছিল—এটা শুখভের শোনা কথা; সত্যি কি মিথ্যে শুখভ জানে না। দশটা করে বড় বড় ছোরা ছিল একেকটা খুঁটির মধ্যে। আজও বেশ কিছুদিন পর পর সেইসব ছোরা এখানে সেখানে নানা জায়গায় হঠাৎ হঠাৎ একেকটা পাওয়া যায়।

নতুন ক্লাবঘর আর সার সার বসতবাড়ি তারা হন্ হন্ করে পেরিয়ে এল। তারপর পড়ল কাঠ-খোদাইয়ের ফ্যাক্টরি। এরপর হুড় হুড় করে তারা মোড় ঘুরে এসে পড়ল সটান ক্যাম্পের গুমটিঘর বরাবর রাস্তায়।

লোকজনের সেই বিরাট দঙ্গলটা সমস্বরে হৈ হৈ করে উঠল।

এই মোড়টাতে আসা নিয়েই এতক্ষণ এত লোকের এই হানফানানি। মেশিন-কারখানাওয়ালার দল ডানদিকে—দেড়শো গজ পিছিয়ে পড়ে আছে।

এবার দলের আগুপিছু সকলেই ধীরেসুস্থে যেতে পারবে। খুব খুশী সবাই। যাক, কিছু লোককে ওরা দুয়ো দিতে পেরেছে। অনেকটা সেই গল্পের খরগোশের মত; খরগোশ খুশী হয়েছিল এই ভেবে—যাক, অন্তত ব্যাঙেরা আমাকে ভয় করে!

সামনে ছায়া-ছায়া দেখা যাচ্ছে ক্যাম্প। সকালে রওনা হওয়ার সময় যতখানি আলো ছিল, এখনও ততখানিই আলো। ঠাসা পুরু কাঠের বেড়ার ওপর এলাকার নৈশ

বাতিগুলো জ্বল জ্বল করছে। গুমটিঘরের সামনেটা আলোয় আলো হয়ে আছে। গা-তল্লাসি করার পুরো জায়গাটা জুড়ে রাতকে দিন করছে জোরালো আলো। যাতে দেখেশুনে ওরা পোঁচ দিতে পারে।

তখনও গেট পর্যন্ত পৌঁছোয়নি।

গার্ডবাহিনীর ছোটকর্তার চিৎকার শোনা গেল,—থামো। সাব-মেশিনগানটি একজন সেপাইকে ধরতে বলে ছোটকর্তা সটান কয়েদীদের দলেব কাছে চলে গেল। সাব-মেশিনগান হাতে নিয়ে কয়েদীদের বেশী কাছে যাওযাব নিয়ম নেই।—যারা যারা ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছ—তারা তাদের ডানদিকে জ্বালানী কাঠকুটোগুলো ফেলে দাও।

বাইরের সারিতে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের জ্বালানীগুলো দেখা যাচ্ছিল—ঢাকবার কোনো চেষ্টাই তারা করেনি। একটা...দুটো...তিনটে...ঝুপঝাপ কবে বাণ্ডিল পড়তে লাগল। কেউ কেউ তাদেব জ্বালানীগুলো ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা কবায় আশপাশের লোকজনেরা আপত্তি জানাল।

—দিতে বলছে যখন দিয়ে দাও না। নইলে তোমাদের দোষে মাঝেব থেকে আমাদেবগুলোও ওরা নিয়ে নেবে।

কয়েদীরাই কয়েদীদের বড শত্রু। ওরা যদি সবসময় একজন আবেকজনকে ডোবাবার চেষ্টা না করত, তাহলে আর আজ ওদের এই হাল হত না।

গার্ডদের ছোটকর্তা হাঁক দিল,—আগে বাড়ো, আগে!

এবার তারা গুমটিঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

গুমটিঘরের সামনে এসে মিশেছে পাঁচ-পাঁচটা রাস্তা। এক ঘণ্টা আগে কাজের নানা জায়গা থেকে এসে কয়েদীদের অন্যান্য দলগুলো এখানেই জমায়েত হয়েছিল। যদি কোনোদিন এই রাস্তাগুলো বাঁধানো সড়ক হয়ে ওঠে, তাহলে তখন এই গুমটিঘব আর গা-তল্লাসির জায়গার বদলে এখানে দেখা দেবে ময়দান। আর আজ যেমন বিভিন্ন কাজের জায়গা থেকে একটার পর একটা কয়েদীর দঙ্গল এসে এখানে জড়ো হয়, ভবিষ্যতের সেই মহানগরে তেমনি মিছিলের পর মিছিল এক জায়গায় এসে মিলবে।

যে সেপাইদের কাজ তল্লাসি করা, তারা ঘরে বসে আগেই শরীরগুলো কোনোরকমে গরম করে নিয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে তারা এবার রাস্তার ওপারে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওভারকোট আর কোটের বোতামগুলো খুলে ফেলার জন্যে তারা কয়েদীদেব হুকুম কবল।

তারপর দুহাত বাড়িয়ে তারা কোল পেতে দিল। গা-তল্লাসির সময় এবা কয়েদীদের সঙ্গে কোলাকুলি করবে। দুটো পাশ চাপড়ে চাপড়ে দেখবে। বলতে গেলে, অবিকল সকালবেলারই মত। আর বাড়িতে যখন এসেই পড়েছে, তখন আর জামার বোতাম খুলতে তত ভয় নেই।

বলবার সময় ওরা সবাই বলত,—বাড়ি যাচ্ছি।

তারা দিনের বেলায় অন্য কোনো বাড়ির কথা ভাববার সময় পেত না।

লাইনের ও-মুড়োয় যারা ছিল, তাদের তল্লাসি হয়ে যেতেই শুখভ তাড়াতাড়ি ৎসেজারের কাছে গিয়ে বলল,—ৎসেজার মার্কোভিচ! এখান থেকে এক ছুটে আমি পার্সেল-ঘরে চলে যাব। লাইনে তোমার হয়ে জায়গা রাখব।

ৎসেজারের গোঁফজোড়া যেন কালো পাথরে খোদাই করা ; ওপরের দিকটা সাদা সাদা হয়ে এসেছে। ৎসেজার শুখভের দিকে ফিরে বলল,—তুমি আবার জায়গা রাখতে যাবে কেন, ইভান দেনিসিচ ? হয়ত দেখব কোনো পার্সেলই আসেনি।

—যদি না আসে—তাতেই বা কী ? আমি দশ মিনিট দাঁড়াব, তার মধ্যে তুমি এলে তো ভাল—নইলে আমি ব্যারাকে চলে যাব।

শুখভ মনে মনে এঁচে নিল—ৎসেজার যদি এসে না পৌঁছোয়, শেষ পর্যন্ত লাইনে তার জায়গাটা হয়ত সে আব কাউকে বেচে দিতে পারবে।

মনে হল ৎসেজার তার পার্সেলের জন্যে মুখিয়ে আছে।

—আচ্ছা, সেই ভাল—ইভান দেনিসিচ! তুমি ছুটে চলে গিয়ে লাইনে জায়গা রেখো। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হবে না, দশ মিনিট।

তল্লাসি সামনে থেকে হয়ে হয়ে আসছে। এর পরেই শুখভের পালা পড়বে। আজ শুখভ একেবারে ঝাড়া হাত-পা—আজ আর ওর লুকনো-চুরনো কোনো ব্যাপার নেই। কাজেই শুখভ বুক ঠুকে এগিয়ে যেতে পারবে। শুখভ আস্তে আস্তে ওভারকোটের বোতাম খুলল, তারপর নীচের জামাটা থেকে ক্যানভাসের কষিটা আলগা করল।

শুখভ জানে তার কাছে কোনোরকম নিষিদ্ধ জিনিস নেই। কিন্তু তা হলেও এই আট বছরে সাবধান হওয়াটা তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। প্যাণ্টের হাঁটুর পকেটে যে কিছু নেই, এটা জেনেশুনে প্রমাণ করবার জন্যেই শুখভ তার হাতটা পকেটেব ভেতর চালিয়ে দিল।

কী সর্বনাশ! ঠক্ করে তার হাতে লাগল ছোট্ট একটা ইস্পাতের ফলা। সেই যে সেই ইস্পাতের ভাঙা ফলাটা, যেটা সে কাজের জায়গায় কুড়িয়ে পেয়েছিল। কোনো জিনিস ফেলে না দিয়ে জমানো তার স্বভাব। তাই বলে ওটাকে ক্যাম্পে আনবার কোনো ইচ্ছে আদৌ তার ছিল না।

আনবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এনে যখন ফেলেছে তখন আর ওটা ফেলে দিতে ওর মন উঠল না। এটাও ঠিক, ভাল করে ধার দিয়ে নিতে পারলে ওটা দিয়ে জুতো সেলাইয়ের কাজ কিংবা দর্জির কাজ করা যাবে।

ক্যাম্পে নিয়ে আসার মতলবটা ও যদি আগে থেকে করত, তাহলে লুকোবারও একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করে ফেলতে পারত। কিন্তু এখন আর তার সময় নেই। এখন শুখভের সামনে আর মাত্র দু-সার লোক। তার মধ্যে প্রথমটার ডাক পড়েছে ; তারা আলাদা হয়ে গিয়ে এগিয়েও গেছে।

শুখভ কী করবে না করবে এক নিমেষে ঠিক করে ফেলতে হবে। দুটোর একটা

সে করতে পারে। সামনের লোকেরা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। এই বেলা বরফের ওপর জিনিসটা সে ফেলে দিতে পারে ; পরে একসময় কুড়িয়ে নিলেই হবে—কেউ জানবেও না কার জিনিস। অথবা জিনিসটা নিজের কাছে রেখে কপাল ঠুকে একবার সে দেখতে পারে।

ওটাকে ওরা ছুরি বলে ধরলে শুখভের দশ দিনের সেল-সাজা হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু মুচির বাটালি হলে রোজগার হবে, রুটি মিলবে।

লোহার ফলাটা ফেলে দিতে সে চায় না।

অতএব শুখভ ওটাকে ওর সুতির হাতমোজার মধ্যে চালান করে দিল।

আর ঠিক তৎক্ষণাৎ তল্লাসির জন্যে পরের পাঁচজনের ডাক পড়ল।

এবার সোজাসুজি আলোর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল তিনজন : সেনকা, শুখভ আর ৩২নং ব্রিগেডের সেই ছোকরাটি, মোলদাভিয়ার লোকটাকে খুঁজে আনার জন্যে যাকে পাঠানো হয়েছিল।

শুখভদের সারিতে লোক মোটে তিনজন আর পাহারাদার আছে পাঁচজন, কাজেই শুখভ একটা চাল চেলে দেখতে পারে—কোন পাহারাদারের কাছে গেলে শুখভ ধরা পড়বে না, এটা সে ঠিক করে নিতে পারে। লালমুখো ছোকরা সেপাইটার চেয়ে বরং পাকা গোঁফঅলা বুড়োটাই ভাল। বুড়োটা অবশ্য পাকা ঝানু ; ইচ্ছে করলে অতি সহজেই খ্যাঁক করে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু ওর বয়েস হয়ে গেছে : চোখ বুঁজে বলে দেওয়া যায়, নিজের পেশার ওপর ওর ঘেন্না ধরে গেছে—চাকরিটা ওর কাছে এখন নরকভোগের সামিল।

ততক্ষণে শুখভ তার হাতমোজা দুটো খুলে ফেলেছে। একটাতে লোহার ফলা, আরেকটা খালি। দুটোই সে এক হাতে ধরে রাখল। খালি হাতমোজাটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে সেই হাতেই দড়ির বেল্টটা ধরে নীচের জামাটা পুরোপুরিভাবে আলগা করে ফেলল। তারপর যো-হুকুম ভাব করে ওভারকোট আর কোট দুটোই উঁচু করে তুলে ধরল। আগে কোনোদিনই তল্লাসির ব্যাপারে শুখভের অতটা অনুগত ভাব দেখা যায়নি। কিন্তু আজ সে দেখাতে চাইছে—বহুৎ আচ্ছা! তল্লাশি করতে চাও, করো! শুখভের মধ্যে কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই। তল্লাসির ডাক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুখভ পাকা গোঁফঅলা লোকটার কাছে চলে গেল।

বুড়ো সেপাই শুখভের দুটো পাশ একবার চাপড়ে নিল, তারপর থাবড়া মেরে হাঁটুর পকেটটা দেখে নিল। নেই কিছু। ভেতরের জামা আর ওভারকোটের পাশগুলো টিপে টিপে দেখল। নেই কিছু। শুখভকে ছেড়ে দেবার আগে ভাল করে দেখে নেবার জন্যে সামনে এগিয়ে দেওয়া একটা হাতমোজা বুড়ো সেপাই টিপে টিপে দেখতে লাগল। বাড়ানো হাতমোজাটা ছিল খালি।

বুড়ো সেপাই এমনভাবে হাতমোজাটা চেপে ধরল যে, শুখভের মনে হল যেন সাঁড়াশি দিয়ে কেউ তার কলজেটা মুচড়ে দিচ্ছে। দ্বিতীয় হাতমোজাটা অমনিভাবে ধরলে

আর শুখভকে দেখতে হবে না । কেউ আটকাতে পারবে না নির্জন কারাবাস । দিনে পাঁচ ছটাক খোরাক । গরম গরম মিলবে দুদিন ছেড়ে একদিন । সঙ্গে সঙ্গে শুখভ মনশ্চক্ষে দেখতে পেল কিরকম কাহিল হয়ে পড়েছে সে, ক্ষিধেয় পেট পিঠ এক হয়ে গেছে, আর এখনকার না-আহার না-অনাহার অবস্থায় ফিরে আসতে তাকে কী কষ্টই না করতে হচ্ছে ।

তখন ঠিক সেই মুহূর্তে সত্যিকার আবেগে তার অন্তরে উচ্চারিত হল প্রার্থনা : হে দয়াময়, আমাকে রক্ষা করো । তুমি দেখো, যেন আমাকে নির্জন কারাবাসে যেতে না হয় ।

বুড়ো সেপাইয়ের প্রথম হাতমোজাটা স্পর্শ করা আর তারপর দ্বিতীয় হাতমোজাটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া—এই এক মুহূর্ত সময়ের মধ্যে এতগুলো কথা হুড়মুড় করে শুখভের মনের ভেতর খেলে গেল । শুখভ যদি হাতমোজাদুটো একসঙ্গে বাড়িয়ে না দিত, যদি সে একটা একটা করে সামনে রাখত—তাহলে বুড়ো সেপাই দুটো মোজাই একসঙ্গে চেপে ধরত । কিন্তু ঠিক সেইসময় উচ্চগ্রামে একজনের গলা পাওয়া গেল । গা-তল্লাসির ব্যাপারে যে কর্তাব্যক্তি, সে কন্‌ভয়-গার্ডদের ডেকে বলছিল,—কই, দেরি করছ কেন ? মেশিন-কারখানার লোকদের আনো ।

শুখভের দ্বিতীয় হাতমোজাটা শেষ পর্যন্ত আর দেখা হল না । পাকা গোঁফঅলা সেপাই এমনভাবে হাত নাড়ল, যার মানে হচ্ছে,—কেটে পড়ো, ভাগো হিঁয়াসে । ওর হাত থেকে শুখভ ছাড়া পেল ।

দলের লোকদের ধরে ফেলার জন্যে শুখভকে ছুটতে হল । ওরা সব পাঁচজন-পাঁচজন করে ইতিমধ্যেই খুঁটির বেড়া-দেওয়া গোহাটা গোছের লম্বালম্বি দুটো ঘেরা জায়গায় লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে—জায়গাটা যেন কয়েদী রাখার খোঁয়াড় । শুখভ এত জোরে ছুটল যে, তার মনে হল না তার পায়ের নীচে মাটি আছে । দাঁড়িয়ে ভগবানকে যে একটু ধন্যবাদ দিয়ে নেবে, সে সময়টুকুও শুখভ পেল না । আর তাছাড়া এখন ধন্যবাদ দেবার ঠেকাটাই বা কী !

যে কন্‌ভয়-গার্ডরা শুখভদের পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছে, তাবা একপাশে সরে দাঁড়াল—মেশিন-কারখানার লোকদের নিয়ে যে গার্ডরা এসেছে তারা যাতে এগিয়ে আসতে পারে । যারা একপাশে সরে গেল, তারা তাদের দলপতির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল । তল্লাসির আগে কাঠকুটোর যে বাণ্ডিলগুলো তারা ফেলে দিয়েছিল, নিজেদের ব্যবহারের জন্যে সেগুলো মাটি থেকে কুড়িয়ে হাতে নিল । তল্লাসির সময় যে কাঠকুটোগুলো নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলো গুমটিঘরের কাছে স্তূপাকার করে রেখে দেওয়া হল ।

চাঁদ গুটি গুটি করে আরও উঁচুতে উঠল । বাত্তিরটা ধবধবে সাদা — আর তেমনি কন্‌কনে ঠাণ্ডা ।

কন্‌ভয়-গার্ডদের কর্তা গুমটিঘরে গেল ৪৬৩-র হিসেব মেলানো জমার রসিদ

আনতে। সেখানে ভল্‌কোভোইয়ের সহকারী গ্রীয়াখভের সঙ্গে তার কী কথা হল।

গ্রীয়াখভ হাঁকল,—ক-৪৬০ !

মোল্‌দাভিয়ার সেই লোকটি দঙ্গলের ভেতর নিজেকে এতক্ষণ আড়াল করে রেখেছিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ডানদিকের বেড়ার ধারে চলে এল। তখনও সে তেমনি মাথা হেঁট করে ঘাড় গুঁজে রয়েছে।

গ্রীয়াখভ ওকে হাত দিয়ে দেখিয়ে ঘুরে আসবার ইশারা করে বলল,—চলে এসো এখানে।

মোল্‌দাভিয়ার লোকটি বেড়া-দেওয়া গণ্ডী ঘুরে সেখানে গেল। তার ওপর হুকুম হল হাতদুটো পিছমোড়া করে ধরে দাঁড়াবার। তাব মানে, পালাবার চেষ্টার অভিযোগে ওকে সোপর্দ করা হবে। নির্জন কুঠরিতে এখন ও আটক থাকবে।

খোঁয়াড়টা ছাড়িয়ে ডাইনে-বাঁয়ে দুদিকের গেটে দুজন পাহারাদার। তিন মানুষ সমান উঁচু গেট আস্তে আস্তে ফাঁক হচ্ছিল। এই সময় হুকুম হল,—পাঁচজন পাঁচজন করে গুনে নাও। এখন আর 'গেট থেকে হটো' বলে চিৎকার করাব কোনো প্রয়োজন নেই —কেননা গেট খুললেই এখন ক্যাম্পের অন্দরমহল। ভেতর থেকে কয়েদীরা এখন দল বেঁধে ছেঁকে ধরলেও গেট ভেঙে পালাতে পারবে না।

—এক! দুই! তিন!

ক্যাম্পের গেট দিয়ে ঢুকবার সময় সন্ধেবেলার এই গনতিতেই কযেদীদেব সবচেয়ে বেশী ভোগান্তি ; কনকনে ঠাণ্ডায় হাওয়ার মধ্যে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দিনের এই সময়টাতেই তাদের সবচেয়ে বেশী ক্ষিধেয ভোঁচকানি লাগে। সন্ধের খাওয়া বলতে পাতলা একহাতা বাঁধাকপির গরম সুরুয়া ; কিন্তু তার জন্যে চাতক পাখির মত তারা হাপিত্যেশে চেয়ে থাকে। বাটিটা তারা এক চুমুকে শেষ করে। সেই মুহূর্তে তাদের কাছে ঐ একটি হাতার মূল্য খালাস পাওয়ার চেয়েও বেশী বলে মনে হয ; যে জীবন তারা যাপন করেছে আর যে জীবন তারা যাপন করবে—তাব চেয়েও ঢের বেশী মূল্যবান বলে বোধ হয় ঐ এক হাতা সুরুয়া।

লডাই করে ফেরা সৈন্যসামন্তদের মত কয়েদীরা চড়া গলার চড়া মেজাজে গটমট করে ক্যাম্পে ঢোকে। সামনেওয়ালা ভাগো !

কোতোয়ালি ব্যারাকে যে ভেড়ের ভেড়েরা হালকা কাজ নিয়ে আছে, বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মত কয়েদীদের আসতে দেখে ভয়ে তাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়।

ভোর সাড়ে ছ'টায় ফাইলে দাঁড়াবার ঘণ্টা বাজা থেকে শুরু করে সন্ধেবেলার শেষ গন্‌তি—সারাদিনের এই দীর্ঘ সময়ের পর কয়েদীরা এই প্রথম একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এলাকার বড় গেটগুলো পেরিয়ে মধ্যবর্তী ছোট ছোট গেট, তার ভেতর দিয়ে ঢুকে ফাইলে দাঁড়াবার হাতাটা পার হওয়া। ব্যস, এরপর তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারো।

তুমি যেতে পারো, কিন্তু কর্মবণ্টন বিভাগের মুন্সীরা ফোরম্যানদের খপ করে ধরে ফেলল,—যারা ফোরম্যান, তারা সব উৎপাদন-পরিকল্পনা-দপ্তরে চলে যাও।

সাজা দেবাব জায়গাটা পার হয়ে দুপাশের আস্তানাগুলোর ভেতর দিয়ে শুখভ ছুটতে ছুটতে পার্সেলঘরেব দিকে গেল। আর ৎসেজার গেল উল্টোদিকে যেখানে গিজগিজ করছে লোকের ভিড। ৎসেজারেব চলার মধ্যে ছিল একটা মন্থর রাশভারী ভাব। সেখানে খুঁটির গায়ে পেরেক-মারা একটা প্লাইউডের বোর্ড। তার গায়ে পেন্সিলে লেখা যাদের যাদের পার্সেল এসেছে তাদের নাম—সে লেখা মুছলে ওঠে না।

কাগজে লেখার রেওয়াজ ক্যাম্পে নেই বললেই চলে। প্লাইউডের ওপরই বেশির-ভাগ লেখা হয়। বোর্ডের ওপর লিখলে তবেই সে লেখা ঢের বেশী পাকা এবং ঢেব বেশী মজবুত আর জোরালো হল্ বলে ওরা মনে করে। খাতাঞ্চি আর গার্ডের দল সবসময়ই বোর্ডের ওর হিসেবপত্র লেখাজোখা করে। পরের দিনই চেঁছে তুলে ফেলে তাতে আবাব নতুন করে লেখে। এর নাম পয়সা বাঁচানো।

যে কয়েদীরা দিনের বেলায় ক্যাম্পে থাকে, তারা এইসময় খানিকটা রোজগার করে নিতে পাবে। বোর্ডে কার কার নাম উঠেছে তারা দেখে রাখে; তারপর সন্ধেবেলায় সেই সেই লোক কাজ থেকে ফেরামাত্র গুনতি হওয়ার জাযগায ভিড়ের মধ্যে থেকে খুঁজে বার কবে কার পার্সেলেব কত নম্বব বলে দেয়। তাতে খুব একটা কিছু হয় না। তবে কমসে কম একটা সিগারেট তো পাওয়া যায়।

শুখভ পার্সেলঘরে ছুটে গেল। ঠিক ঘর বলা যায় না, ব্যাবাকেব লাগোয়া বড় দালানবিশেষ—মাথার ওপরটা ছাওয়া। বন্ধ করবার মত দরজা না থাকায়, দালানটাতে অবাধে ঠাণ্ডা ঢোকে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাব চেয়ে বরং দালানে অপেক্ষা করা ভাল। তবু যা হোক মাথার ওপর চাল আছে।

দালানের ভেতর দেয়াল ববাবর লাইন দাঁডিযে গেছে। সেই লাইনে গিয়ে শুখভ দাঁড়াল। শুখভের ঠাঁই হয়েছে পনেরো জনের পর। তার মানে, লাইনে দাঁড়াতে হবে এক ঘণ্টার ওপর—ততক্ষণে আটটাব ঘণ্টা বেজে যাবে। বিজলী স্টেশনের যে লোকগুলো আগে দেখে আসতে গেছে লিস্টিতে তাদের নাম আছে কিনা, তাদের সবাইকেই অবশ্য শুখভেব পেছনে এসে দাঁডাতে হবে—মেশিন-কারখানার লোকদেরও ঐ এক দশা। অনেককেই আজ ফেরত গিয়ে কাল সকালে এসে আবার ফিরে লাইনে দাঁডাতে হবে।

যারা লাইনে দাঁড়িযেছে তাদের সকলেব হাতেই একটা করে ব্যাগ বা থলে। ঐখানে, ঐ দরজার পেছনদিকে (এ ক্যাম্পে শুখভের কখনও কোনো পার্সেল আসেনি, তবে লোকজনদের কথাবার্তা থেকে শুখভ যতটা যা জানতে পেরেছে) ছোট একটা কুড়ুল দিয়ে প্যাকিং বাক্স খোলা হয়; পাহারাদার সেপাই বাক্সের ভেতরকার জিনিসগুলো বাব কবে ফেলে কোনটা কোন জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয়। কখনও তারা বাক্স কাটে, কখনও ভাঙে, কখনও-বা হাত ঢুকিয়ে জিনিস বার করে আনে। যদি তরল পদার্থ হয়, তাহলে গেলাস বা ধাতুর পাত্রে সে জিনিস কোনো কযেদীকে দেওয়া হবে না। গার্ডরা বোতল কাত করে ঢেলে দেবে আর তুমি যদি ভাল বোঝো তো হয় আঁজলা ভরে নেবে,

নয়ত তাতে তোয়ালে বা কাপড় ভিজিয়ে নেবে। মরে গেলেও ওরা তোমাকে ধাতুর তৈরি বাসন দেবে না। বাড়ি থেকে পিঠেপুলি, মিঠাইমণ্ডা, কাবাব কিংবা মাছ—ভালমন্দ কিছু এলে ওরা তা থেকে এক খাবলা নেবে। আপত্তি করেছ কি গেছ। সঙ্গে সঙ্গে ওরা জোর দিয়ে বলবে, পার্সেলেব ও-জিনিস বিধিবহির্ভূত। জিনিসটা ওরা কারো সামনে বারই করবে না। যারই পার্সেল আসুক, তাকে ঐ গার্ড থেকে শুরু করে একের পর এক সমানে কেবল দিয়ে যেতে হবে। পার্সেল পরীক্ষা হয়ে যাবার পব পার্সেলেব বাক্সটা কিন্তু ওরা কয়েদীদের দেবে না। প্রত্যেকটা জিনিস খোলা অবস্থায় হয় থলিতে পোরো, নইলে এমন কি ওভারকোটের কোঁচড়ের মধ্যেও নিয়ে নিতে পারো। যার যার নেওয়া হয়ে গেছে তারা সরে পড়ো। তারপরে কে আছো! তারপর? ওরা এমন তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দেবে যে, কয়েদীদের মধ্যে কেউ কেউ চলে যাবার সময় তাড়াতাড়িতে দুটো-একটা জিনিস ভুলে ফেলে যাবে। পরে গিয়ে আর খোঁজ করার কোনো মানে হয় না। ততক্ষণে সে জিনিস হাওয়া।

উসৎ-ইঝমাতে থাকার সময় বাড়ি থেকে শুখভের খান-দুই পার্সেল এসেছিল। পার্সেল পাওয়ার পর শুখভ তার স্ত্রীকে লিখে জানিয়েছিল ওসব পাঠানোর কোনো মানে হয় না। বলেছিল,—ওসব পাঠিও না আমাকে। সন্তানদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিও না।

যদিও শুখভ দেখেছে যে, বন্দীশালায় কোনোরকমে একার পেট চালানোর চেয়ে বরং বাইরে স্ত্রীপুত্রপরিবারের গ্রাসাচ্ছাদানের ব্যবস্থা করা তার পক্ষে ঢের সহজ ছিল—তাহলেও সে ভালমতই জানত ওসব পার্সেল পাঠাতে কী পরিমাণ খরচ হয়। দশ বছর ধরে সংসারকে শুষে এই খরচ টানা সম্ভব নয়। তার চেয়ে ঢের ভাল বিনা পার্সেলে চালানো।

কিন্তু মনে মনে শুখভ যতই ঠিক করুক, আজও যখনই ব্যারাকে বা ব্রিগেডে আশপাশের কারো পার্সেল আসে—প্রায় রোজই কারো না কারো আসে—শুখভের কোনো পার্সেল আসে না বলে মন খারাপ হয়ে যায়। শুখভ যদিও স্ত্রীকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছে যেন ঈস্টারের সময়ও তাকে কিছু পাঠানো না হয় এবং যদিও ব্রিগেডের কোনো শাঁসালো মক্কেলের পক্ষ থেকে ছাড়া শুখভ কখনও পার্সেল-প্রাপকদের নামের লিস্টি দেখতে যায় না—তাহলেও প্রায়ই শুখভ মনে মনে ভাবে—ইস, কেউ যদি এখন ছুটে এসে তাকে খবর দিত,—একি শুখভ, হাঁ করে এখনও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? ওদিকে তোমার পার্সেল এসে পড়ে আছে।

কিন্তু হায় কপাল, কেউই কোনোদিন ছুটে আসে না।

তেমগেনিযোভোর কথা কিংবা নিজের ভিটেমাটিটা মনে পড়ে যাবার কারণগুলো দিন দিন কমে কমে আসছে। সকাল থেকে রাত্তির অবধি জেলের জীবন শুখভকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বসে বসে স্মৃতির জাবর কাটবার তার সময় কোথায়?

শুখভের আশপাশে যারা, তারা সকলেই এখন লাইনে দাঁড়িয়ে মশগুল হয়ে ভাবছে

কে কিরকম আরামে শুয়োরের মাংসে প্রথম কামড়টা বসাবে, কিংবা রুটির ওপর কে কিভাবে মাখন মাখাবে, কিংবা চায়ের মগে কে কতটা চিনি মেশাবে। আর তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে শুখভের মাথায় তখন একটিমাত্র চিন্তা—ব্রিগেডের লোকজনদের সঙ্গে খাওয়ার জায়গায় গিয়ে কতক্ষণে খেতে পারবে পাতলা সুরুয়া—খেতে হবে গরম গরম। ঠাণ্ডায় আর গরমে তফাত অনেক। যদি জুড়িয়ে যায় তাহলে কিন্তু অর্ধেক স্বাদ চলে যাবে।

শুখভ মনে মনে একবার খতিয়ে নিল : ৎসেজার যদি দেখে থাকে লিস্টিতে তার নাম নেই, তাহলে অনেক আগেই সে হাতমুখ ধোওয়ার জন্যে ব্যারাকে চলে গেছে। আর যদি দেখে থাকে নাম রয়েছে, তাহলে এতক্ষণে থলি, মগ আর এটা-সেটা জোটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শুখভ সেই কারণেই বলেছিল দশ মিনিট অপেক্ষা করবে।

লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শুখভ কতকগুলো খবর শুনতে পেল। এই রবিবার কয়েদীদের কাজে যেতে হবে। তাহলে আবারও একটা রবিবার মাঠে মারা যাচ্ছে। এমন যে হবে শুখভ আগেই ভেবেছিল। ব্যাপারটা কারো কাছেই খুব অপ্রত্যাশিত নয়। মাসে যদি পাঁচটা রবিবার পড়ে, তাহলে কয়েদীদের তিনটে দিয়ে বাকি দুটো রবিবার ওরা কয়েদীদের নাকে দড়ি দিয়ে খাটাতে নিয়ে যায়। কিন্তু যতই ভাবা থাক না কেন, খবরটা কানে যেতেই শুখভের সমস্ত অস্থিমজ্জা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। অমন একটা মধুর দিন হারিয়ে কার না কান্না পায়! লাইনে দাঁড়িয়ে লোকে যেটা বলছিল সেটা অবশ্য ঠিকই। বাইরে যদি যেতে নাও হয়, তাহলেও ক্যাম্পের কর্তারা কয়েদীদের ছুটির দিনটা মাটি করে দিতে পারে। ওরা ভেবে ভেবে কাজ বার করবে। স্নানের ঘর বানাও। নয় দেয়াল তুলে গলিটা বন্ধ করে দাও। নয় উঠোনটা পরিষ্কার করো। আর নয়ত তোশকগুলো পাল্টে নাও, ধুলো ঝেড়ে নাও কিংবা বাঙ্কে ছারপোকা হয়েছে, মারো। নয়ত বলবে সবাই ফাইলে দাঁড়িয়ে যাও, যার যার ফটোর সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে মিলিয়ে গোনা হবে। নয়ত কার কার কাছে কী কী জিনিস আছে তার ফিরিস্তি তৈরি করা। তার মানে, পোঁটলাপুঁটলি ঘাড়ে করে বাইরে যাওয়া আর তারপর দিনের অর্ধেক উঠোনে বসে থাকা।

সকালের খাওয়ার পর কোনো কয়েদী বিছানায় একটু লম্বা হবে, কর্তাদের কাছে এ অসহ্য।

লাইন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। এমন সময় একদল লোক ঢুকে পড়ে কাউকে না বলে-কয়ে নিঃশব্দে কনুই দিয়ে ঠেলে বেমক্কা লাইনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তার মধ্যে একজন ক্ষৌরকার, একজন খাতাঞ্চি আর একজন ছিল শিক্ষাসংস্কৃতি বিভাগের কর্মী। ওরা কেউই নীচেরতলার লোক নয়। ক্যাম্পের ভেতরে খুচখাচ কাজ করা যতসব বাস্তুঘুঘু। পয়লানম্বরের হারামী। মেহনত-করা কয়েদীদের কাছে ওরা ছিল গুয়েরও অধম। তেমনি ওরাও এইসব কয়েদীদের হুবহু অমনি চোখে দেখত। কিন্তু ওদের সঙ্গে কোঁদল করা বৃথা। বাস্তুঘুঘুদের নিজস্ব একটা ঘোঁট আছে আর সেইসঙ্গে পাহারাদারদের সঙ্গেও ওদের খুব খাতির।

শুখভের সামনে এখন দশজন লোক আর পেছনে আছে সাতজন । ঠিক সেই সময় দরজা দিয়ে ৎসেজারকে ঢুকতে দেখা গেল—মাথায় তার নতুন একটা ফারের টুপি । টুপিটা জেলের বাইরে থেকে কেউ পাঠিয়েছে ।

দেখ, কী একখানা টুপি । চকচকে ঝকঝকে একদম আনকোরা শহুরে । ৎসেজার কি আর অমনি অমনি ওটা পেয়েছে ? একজন না একজনকে ঘুষ দিতে হয়েছে । অন্যদের তো বেশিরভাগের কাছ থেকেই ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো ফৌজী টুপি পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে তার বদলে ওরা দিয়েছে শুয়োরের চামড়ায় তৈরি জেলখানার টুপি ।

শুখভের দিকে তাকিয়ে ৎসেজার মৃদু হাসল । চশমা-পরা একজন অদ্ভুত ধরনের লোক লাইনে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল ।

ৎসেজার তাকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল,—আরে, পীতর মিখালিচ যে ! কী খবর !

একেবারে দুই মানিকজোড় । মিলেছে ভাল । সেই অদ্ভুত ধরনের লোকটা বলল, —কী পেয়েছি দেখ ! টাটকা নতুন একটা সান্ধ্য মস্কো পত্রিকা । ডাকে এসেছে ।

—আরে, সত্যিই তো । বলে ৎসেজারও কাগজটা নাকের কাছে ধরল । মিটমিট করছে সিলিঙে ঝোলানো বাতি । এত কম আলোয় অমন ক্ষুদে ক্ষুদে হরফ ওরা পড়ছে কী করে ?

—জাভাদ্স্কির উদ্বোধন-রজনী সম্পর্কে চমৎকার একটা লেখা বেরিয়েছে ।

মস্কোর লোকদের সব কুকুরের মত নাক । দূর থেকে পরস্পরেব গন্ধ পায় । যখন কারো সঙ্গে কারো দেখা হয় অমনি শুরু হয়ে যায় ওদের ঐ একধরনের গা-শোঁকাশুঁকি । আর এক নিশ্বাসে হড়বড় হড়বড় করে কে কত কথা বলে যেতে পারে —এই নিয়ে ওরা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দেয় । আর যখন ওরা বকবক করতে শুরু করে দেয় তখন খুব কম খাঁটি রুশ কথা কানে আসে । শুনে মনে হবে ওরা যেন লাতভিয়ান বা রুমানী ভাষায় কথা বলছে ।

যাই হোক, ৎসেজার থলিটলি জুটিয়ে এনেছে ।

শুখভ ফোকলা দাঁতে অস্পষ্ট উচ্চারণে বলল,—তাহলে আমি...ৎসেজার মার্কোভিচ...এখন আমি যেতে পারি ?

ৎসেজার খবরের কাগজের আড়াল থেকে কালো গোঁফজোড়া বার করে বলল, —হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয় । আচ্ছা, একটু বলে দাও তো কে আমার আগে আর কে আমার পরে ।

কে আগে এসেছে, কে পরে এসেছে সব বুঝিয়ে-টুঝিয়ে দেবার পব শুখভ রাতের খাবারের কথা আপনা থেকে মনে পড়বার আগেই ৎসেজারকে মনে করিয়ে দিল,—তোমার খাবারটা কি পৌঁছে দেব ?

তার মানে, মেসের টিনের পাত্রে করে মেসবাড়ি থেকে ব্যারাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া । খাওয়ার জায়গা থেকে বাইরে খাবার নিয়ে যাওয়া নিয়মবিরুদ্ধ—এ বিষয়ে আইনের আরও অনেকরকম ফ্যাচাং আছে । নিয়ে যেতে গিয়ে যদি ধরা পড়ো, তাহলে খাবারটা মাটিতে

ফেলে দেওয়া হবে এবং নির্জন কারাবাস ভোগ করতে হবে। কিন্তু হলে কি হবে, কয়েদীরা বাইরে ঠিক খাবার নিয়ে যায় এবং নিয়েও যাবেও—কারণ, কারো যদি কোনো দরকার পড়ে তাহলে তার পক্ষে নিজের ব্রিগেডের সঙ্গে খাওয়ার জায়গায় গিয়ে পৌঁছুনো সম্ভব হয়ে ওঠে না।

শুখভ খাবার আনার ব্যাপারে মুখে জিজ্ঞেস করল বটে, কিন্তু মনে মনে বলল: তুমি কি বাবা, এতই কঞ্জুস হবে ? তোমার রাতের খাবারটা আমাকে দেবে না ? খাবার তো ভারি ! লপসিও নয়, সুদ্ধু জলের মত পাতলা সুরুয়া।

ৎসেজার ঠোঁটের কোণে হেসে বলল,—না, না ! ও তুমিই খেয়ে নিও, ইভান দেনিসিচ।

শুখভও এতক্ষণ তাই চাইছিল। খাঁচাখোলা পাখির মত শুখভ সাঁ করে দালানটা থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল—ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল।

কয়েদীরা চতুর্দিক থেকে আসছিল। ক্যাম্পের কর্তা এই বলে একবাব এক ফতোয়া দিয়েছিল যে, কোনো কয়েদী কোনোসময় ক্যাম্পেব মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়াবে না। যেখানে যেখানে সম্ভব পুরো ব্রিগেড সাব বেঁধে একসঙ্গে যাবে। যেখানে সকলের একসঙ্গে একই সময়ে যাওয়া সম্ভব নয়—যেমন হাসপাতালে বা পায়খানায়—সেখানে যাবে ভারপ্রাপ্ত একজন লোকের অধীনে চার-পাঁচজনের একটি করে দল ! সার বেঁধে তাদের নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসা হবে।

ক্যাম্পের কর্তার এটা ছিল ভাবি জবরদস্ত হুকুম। কারো ঘাড়ে এত মাথা ছিল না যে, তাব কথার ওপর কথা বলে। পাহারাঅলারা কয়েদীদের একা পেলেই ধরত; ধরে নম্বব লিখে নিয়ে সেলে চালান করে দিত। তবু কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ভেস্তে গেল। আগেকার এমনি হৈচৈ করে চালু করা অনেক হুকুমের মতই এ হুকুমটাও নিঃসাড়ে অকেজো হয়ে পড়ল। যেমন মনে করো, একজনকে তলব করা হল নিরাপত্তা বিভাগে —তখন তো আব তুমি চার-পাঁচজনের পুরো একটা দল পাঠাবে না ! কিংবা ধরো, তুমি পার্সেলঘরে যাবে তোমার খাবারদাবার আনতে—আমার কী দায় পড়েছে যে আমি তোমার সঙ্গে যাব ! যে লোকটা শিক্ষাসংস্কৃতি দপ্তরে কাগজ পড়তে যাবে, অন্য কাব এমন ভূতে ধরেছে যে তার সঙ্গে যাবে ? কিংবা এ যাবে জুতো সারাতে, ও যাবে শুখা-ঘরে, আরেকজন হয়ত যাবে শুধু এ ব্যাবাক থেকে ও-ব্যারাকে—যদিও এক ব্যারাক থেকে অন্য ব্যারাকে যাওয়া তার চেয়েও বেশীরকম বেআইনী। তাহলেও, এত লোককে কী করে তুমি আটকাচ্ছ ?

ঐ এক হুকুমে ক্যাম্পের কর্তা চেয়েছিল কয়েদীদের শেষ একফোঁটা স্বাধীনতাও কেড়ে নিতে। কিন্তু এঁটে উঠতে পারেনি শালার বেটা শালা ঐ বুড়ো পেটমোটা।

ব্যারাকের দিকে যাবার পথে একজন সেপাইকে দেখে শুখভ টুপিটা তুলে খাতির করল। কিছু তো বলা যায় না, করে রাখা ভাল। তারপর সোজা ব্যারাকে। একটা হল্লা চলছিল। কে একজন সকালে তার বরাদ্দ রুটি রেখে গিয়েছিল, সন্ধেবেলায় ফিরে

এসে আর পাচ্ছে না। কয়েদীরা ফালতুদের ওপব চোটপাট করছে আর ফালতুরাও কয়েদীদের ওপর চোটপাট করছে। কোণে ১০৪নং ব্রিগেডের আস্তানাটা খালি।

যেদিন ফিরে এসে দেখা যায় তোশকগুলো হ্যাড্ডাব্যাড্ডা হয়ে উলটে নেই, ব্যারাকে খানাতল্লাসি-টল্লাসিও হয়নি—শুখভ সেদিন ভাবে আজ কাব মুখ দেখে উঠেছি!

শুখভ ছুটে নিজের বাঙ্কের দিকে গেল। যেতে যেতেই গায়ের ওভারকোটটা খুলে ফেলেছিল। ওভারকোটটা সোজা বাঙ্কের ওপর ছুঁড়ে দিল। তারপর তোশকে হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে নিল তার পাঁউরুটির টুকরোটা আছে কিনা। যাক, আছে তাহলে। ভাগ্যিস, সেলাই করে রেখে গিয়েছিল!

তারপর বাইরে বেরিয়ে দে ছুট। সোজা মেসবাড়ির দিকে।

বাস্তায় সেপাইদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক এড়িয়ে শুখভ মেসবাড়িতে পৌঁছুল। পথে শুধু জনাকয়েক কয়েদীর সঙ্গে তার দেখা হল। রেশনের ব্যাপাবটা নিযে তাদের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি হচ্ছিল।

উঠোনে সব কিছু জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হচ্ছিল। বাতিগুলো কেমন যেন ম্লান। ব্যারাকবাড়িগুলো কালো কালো ছাযা ফেলে দাঁড়িযে আছে। একটা চওড়া বারান্দায় উঠবার চারটে পৈঁঠেযুক্ত সিঁড়ি। বারান্দাটা পেরোলেই খাবাব ঘব। ওপব থেকে একটা ঝোলানো বাতি দুলতে থাকায় বাবান্দাটা ঠিক এই মুহূর্তে আবছা হযে আছে। বাতি থেকে যে আলো বেরোচ্ছে, সেটা কতকটা রামধনু রঙের—বাল্বে হয ববফ পড়েছে বলে, নয় বড বেশী ধুলোমযলা পড়েছে বলে!

আরও একটা ব্যাপাবে ক্যাম্পের কর্তার কড়া হুকুম ছিল। মেসবাড়িতে কয়েদীবা যেন দুজন দুজন হযে সাব বেঁধে ঢোকে। হুকুমনামাতে আবও বলা হয়েছিল : মেসবাড়িতে পৌঁছে ব্রিগেডেব লোকজনেরা সোজা বাবান্দায় উঠে না গিযে সিঁড়ির ঠিক নীচে গিযে পাঁচজন পাঁচজন কবে দাঁড়াবে। মেসবাড়িব ফালতু এসে না ডেকে নিযে যাওয়া অবধি তাদেব অপেক্ষা কবতে হবে।

মেসবাড়ির ফালতুব পদ অধিকার করে গ্যাঁট হযে বসে আছে ল্যাংড়া খ্রোমোই। খোঁড়া হওয়ার অজুহাতে ও দিব্যি পঙ্গু বলে নিজেকে চালিযে দিযেছে। শালা মহা হারামজাদা, একেবারে পাজীব পা-ঝাড়া। হাতে বার্চগাছেব একটা চাবুক নিয়ে দাঁড়িযে থাকে; ওর বিনা হুকুমে কেউ বারান্দায় উঠতে গেলেই সপাং সপাং করে চাবুক বসিযে দেবে। তাই বলে সবাইকে নয়। সেদিক থেকে খুব সেয়ানা; হাড়ে হাড়ে লোক চেনে। এমন কি অন্ধকারে, এমন কি পেছন না ফিরেও ও দেখতে পায়। যারা ঠিক কিল খেয়ে কিল চুবি কবার পাত্র নয়, তাদের ও ঘাঁটায় না। যারা পড়ে পড়ে মাব খায়, তাদেরই ও মারে। একদিন শুখভকেও শালা মেরে পাট কবে দিযেছিল।

ওকে বলা হত 'ফালতু'। কিন্তু একটু যদি খতিয়ে দেখ তো দেখবে, ও হল সত্যিকার লবাবপুত্তুর। যারা বসুই পাকায় তাদের সঙ্গে ওব হলায-গলায ভাব।

আজ হয় সব ব্রিগেডই একসঙ্গে এসে পড়েছে, নয় সব জিনিস গুছিয়ে-গাছিয়ে

নিতে একটু বেশী সময় লেগে গেছে। কিন্তু বারান্দাটায় বেজায় ভিড়। তার মধ্যে রয়েছে খ্রোমোই, তার এক সাকরেদ আর মেসবাড়ির কর্তা। কোনো সেপাইশাস্ত্রীর সাহায্য না নিয়ে হারামীরা নিজেরাই ভিড় সামলাচ্ছে।

মেসবাড়ির কর্তা হল এক হৃষ্টপুষ্ট আঁটকুড়োর বেটা। মাথাটা কুমড়োপটাসের মত। বিশাল বৃষস্কন্ধ চেহারা। হাত-পাগুলোতে যেন স্প্রিং লাগানো ; তিড়িং তিড়িং করে এমনভাবে হাঁটে যেন গায়ে অসুরের মত শক্তি ফেটে পড়ছে। মাথায় নম্বরবিহীন সাদা ফারের টুপি। আর কারো অমন টুপি নেই—বাইরের যেসব বেসামরিক লোক এখানে কাজ করে, তাদেরও কারো অমন টুপি নেই। গায়ে মেষশাবকের চামড়ার তৈরি আঙরাখা। তাতে অবশ্য নম্বর দাগা—তবে ডাকটিকিটের মত তার সাইজ। সেটাও রাখা ভলকোভোইয়ের খাতিরে। কিন্তু তার পিঠে কোনো নম্বরের বালাই নেই। মেসবাড়ির কর্তা কারো কাছে মাথা নোয়ায় না এবং কয়েদীদের কাছে সে হল সাক্ষাৎ যম। হাজার হাজার লোকের জীবনমরণ তার হাতে। একবার ওরা ওকে পেটাবার উপক্রম করেছিল। কিন্তু রসুই-পাকানেওয়ালারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ওকে বাঁচায়—ও-লোকগুলোও কম গুণ্ডাবদ্‌মায়েশ নয়।

১০৪নং ব্রিগেড আগে ঢুকে পড়ে থাকলেই তো চিত্তির। ক্যাম্পে খ্রোমোই চেনে না এমন লোক নেই। মেসবাড়ির কর্তা সঙ্গে থাকাতে কাউকে যে নিয়মবিরুদ্ধভাবে ঢুকতে দেবে, সে আশা নেই। এমনিতেই মানুষকে কষ্ট দিয়ে ও আনন্দ পায়।

কখনও কখনও খ্রোমোইয়ের পেছনদিক দিয়ে বারান্দার রেলিং টপকানো যায়। শুখভ নিজেই কতবার টপকেছে। কিন্তু আজ তা সম্ভব নয়—খোদ্ মেসবাড়ির কর্তা দাঁড়িয়ে। ওর হাতে একবার পড়লে শেষে চ্যাংদোলা করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

চটপট, চটপট উঠে যাও। বারান্দায় উঠে একবার দেখে নাও—দূর ছাই, সকলের গায়েই একছাঁচে ঢালা কালো ওভারকোট—দেখ তো ১০৪ নম্বর ব্রিগেডের লোকেরা আছে কিনা!

ঠিক তক্ষুণি ব্রিগেডগুলো হুড়োহুড়ি করে সামনে এগোতে শুরু করেছে। রাতের ঘণ্টা পড়বার সময় হয়ে এল। কেল্লা দখল করবার ভাব নিয়ে বাঁই বাঁই করে পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা ধাপ পেরিয়ে গাদাখানেক লোক বারান্দার ওপর উঠে পড়ল।

খ্রোমোই তার হাতের চাবুকটা উঁচিয়ে চিৎকার করে সামনের লোকদের বলল, —খবর্দার, খবর্দার! আঁটকুড়োর বেটারা! পিছিয়ে যা বলছি। নইলে মাথার খুলি ফাটিয়ে দেব।

সামনের লোকেরা চিৎকার করে বলল,—আমাদের কী দোষ! পেছন থেকে ঠেলছে যে।

পেছন থেকে ঠেলছিল ঠিকই। কিন্তু তাই বলে সামনের লোকেরাও যে খুব জোরের সঙ্গে ঠেকাবার চেষ্টা করছিল এমন নয়। কোনোরকমে সাঁ করে খাবারঘরে ঢুকে পড়বার

তালেই তারা ছিল ।

খ্রোমোই তখন রেলের গেট বন্ধ করার ভঙ্গিতে বেতটা বুকের ওপর আড় করে ধরে সামনের লোকদের সজোরে ঠেলতে লাগল । লম্বা বেতের আরেকটা দিক ধরল খ্রোমোইয়ের সাকরেদ । মেসবাড়ির কর্তাটিরও হাত লাগানোর ব্যাপারে কোনোরকম কুণ্ঠা দেখা গেল না ।

ওরা দুড়দাড় করে ঠেলে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিল । গায়ে ওদের শক্তি আছে । মাংস খায় । কয়েদীরা টলতে টলতে পিছিয়ে গেল। সামনের লোকেরা সপাটে পেছনের লোকদের ঘাড়ে পড়ে যেতে পেছনের লোকেরা কুপোকাৎ হল ।

একদল লোক চিৎকার করে বলে উঠল,—তোমার গুষ্টির...খ্রোমোই ! দেখে নেব তোমাকে । ভিড়ের মধ্যে তাদের দেখা গেল না । বাকি সবাই মুখ বুঁজে পড়ল, তাড়াতাড়ি উঠেও পড়ল মুখ বুঁজেই । আরেকটু হলেই পায়ের তলায় ওরা পিষে যেত ।

সিঁড়িটা ফাঁকা করে ফেলেছে । মেসবাড়ির কর্তা স্বস্থানে ফিরে গেছে । সিঁড়ির একেবারে ওপরের পৈঁঠেয় খ্রোমোই দাঁড়িয়ে ।

পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়িয়ে যা সব, গবেট কোথাকার ! এক কথা রোজ বলতে হবে ? সময় হলেই যেতে পাবি ।

সামনের দিকে এক জায়গায় সেনকা ক্লেভশিনেব মত একজন রয়েছে বলে শুখভের ঠাহর হল । শুখভ তো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কনুই দিয়ে ঠেলেঠুলে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল । খানিকটা এগোবাব পর শুখভের দম নিকলে গেল । ভিড় ঠেলে অত দূর যাওয়া যাবে না ।

খ্রোমোই তারস্বরে চেঁচাল,—সাতাশ নম্বর ! উঠে এস ।

২৭নং ব্রিগেডের লোকেরা লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা দরজার দিকে ছুটল । বাকি লোকেরা আবার ঠেলাঠেলি করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল । শুখভ প্রাণপণে ঠেলতে লাগল । বারান্দাটা থর থর করে কাঁপছে । বারান্দার মাথার ওপর বাতিটা কুঁই কুঁই করছে ।

খ্রোমোই রেগে খুন হল,—আবার ? আবার বজ্জাতি শুরু হয়েছে ? বলে সপাং সপাং করে বেত চালাতে শুরু করে দিল । কারো লাগল মাথায়, কারো পিঠে । ঠেলে ঠেলে লোকদের পিছু হটিয়ে দিল খ্রোমোই । সিঁড়িটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল ।

শুখভ দেখতে পেল খ্রোমোইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পাভলো । ব্রিগেডের লোকদের খাবারঘরে ওই নিয়ে যাবে । এই হৈ-হল্লার মধ্যে এসে তিউরিন নিজের মান খোয়াতে রাজী নয় ।

পাভলো ওপর থেকে হাঁক দিল,—পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়িয়ে যাও, একশো চার । ভাই, তোমরা ওদের একটু জায়গা দাও আসবার ।

হ্যাঁ, দেখই না কেমন জায়গা দেয় বন্ধুরা ।

—আমাকে যেতে দাও। আমি ঐ ব্রিগেডের লোক। শুখভ হাঁচড়-পাঁচড় করতে লাগল।

যারা ওর ঠিক সামনে, তারা ওকে এগিয়ে যেতে দিতে একটুও অরাজী নয়। কিন্তু লোকে চতুর্দিক থেকে ওকে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করে রেখেছে।

ফুলে ফুলে উঠছে ভিড়। বন্ধ হয়ে আসছে নিশ্বাস। সুরুয়ার জন্যে। যে সুরুয়া তাদের ন্যায্য পাওনা।

শুখভ অন্য এক পন্থা ধরল। বাঁদিকের রেলিংটা পাকডাল। বারান্দার খুঁটিটা দুহাত দিয়ে বাগিয়ে ধরে ঝুলে পড়ল। পা দুটো আর তখন মাটিতে নেই। কার যেন হাঁটুতে ক্যাঁৎ করে লাথি মারতেই সে ওকে এক ঘুষি মেরে বাপ-মা তুলে গাল দিয়ে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুখভ এক ঝটকায় নিজেকে ঠিক উঠিয়ে নিল। বারান্দার ওপরকাব কার্নিশে এক পা বাধিয়ে শুখভ অপেক্ষা করতে লাগল। বন্ধুবান্ধবেরা দেখতে পেয়ে ছুটে এসে হাত বাড়িয়ে শুখভকে টেনে তুলল।

মেসবাড়ির কর্তা দরজার বাইরে মুখ বার করে বলল,—আচ্ছা, খ্রোমোই—আরও দুটো ব্রিগেডকে পাঠাও।

—একশো চার! খ্রোমোই হেঁকে উঠল।—আরে, এই উল্লুক! বলি, উঠছিস কোথায়? অন্য একটা ব্রিগেডের লোক ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল তার ঘাড়ে সপাং করে চাবুক পডল।

নিজেব দলের লোকদের খাবারঘরে ঢুকে পড়বার জন্যে পাভলো হাঁক পাড়ল, —একশো চার!

—উ-ফ! সশব্দে হাঁফ ছেড়ে শুখভ খাবারঘরে এল। পাভলোর বলাবলির অপেক্ষায় না থেকে শুখভ খালি ট্রে-র ধান্ধায় ঘুরতে লেগে গেল।

বোজ যেমন হয়, খাবারঘরের দরজা দিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা হাওযা গল গল করে ভেতরে ঢুকছে। কয়েদীরা টেবিলে গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি হয়ে বসেছে। দুপাশের টেবিলেব মাঝখান দিয়ে কয়েদীরা ঘুরছে ফিরছে, এ ওকে ঠেলছে, কেউ-বা ভর্তি ট্রে নিয়ে যাওয়া-আসা করছে। এত বছর হয়ে গেল, শুখভের এখন এসব সড়গড় হয়ে গেছে। শুখভের চোখ আছে বলতে হবে—ঠিক দূর থেকে দেখতে পেয়েছে শচ-২০৮ ট্রের ওপর পাঁচটা বাটি বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; শুখভ দেখেই বুঝে ফেলল ওদের ব্রিগেডেব ওটাই শেষ ট্রে—কেননা তা নাহলে, বাটির সংখ্যা আরও বেশী হত।

ছুটে গিয়ে ওকে ধরে ফেলে কানের কাছে শুখভ ফিসফিস কবে বলল,—ভাই, তোমার হয়ে গেলে ট্রে-টা আমাকে দিও।

—একজনকে যে আগেই কথা দিয়ে ফেলেছি। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে।

—আরে বাখো। একটু দেবি করলে ওর কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

দুজনেব মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল।

লোকটা টেবিলের ওপর বাটিগুলো নামিয়ে রাখল। অমনি শুখভ সাট কবে

ট্রে-টা নিয়ে নিল। যাকে এর আগে দেওয়া হবে বলে কথা দেওয়া হয়েছিল, সে হন্তদন্ত হয়ে এসে ট্রে-র একটা কোণ চেপে ধরল। ট্রে ধরে সে যেই না টান দেওয়া, অমনি শুখভ তার দিকে ট্রে-টা ঠেলে দিতেই সামলাতে না পেরে সে পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আর ট্রে-টা যেই তার হাতছাড়া হওয়া, অমনি সেটাকে বগলদাবা ক'রে শুখভ খাবার নেবার জানলার দিকে ছুটে গেল।

জানলার ধারে পাভলো এতক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েছিল। ট্রে হাতে শুখভকে আসতে দেখে পাভলো মহাখুশী। তার সামনে ছিল ২৭ নম্বর ব্রিগেডের সহকারী ফোরম্যান। পাভলো তাকে ঠেলা দিল,—কই, এগোতে দাও না হে! মিছিমিছি দাঁড়িয়ে কী ভেরেণ্ডা ভাজছ? দেখছ না, আমার হাতে ট্রে রয়েছে!

—হ্যাদে, ঐ দেখ গপচিকও একটা ট্রে জুটিয়ে এনেছে।

গপচিক হেসে উঠে বলল,—ওরা হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল, আমি ছোঁ মেরে নিয়ে চলে এসেছি।

গপচিক এরই মধ্যে হয়ে উঠেছে। পাকা ঝানু হতে ওর আর বছর তিনেক লাগবে। একবার লায়েক হতে পারলেই চড় চড় করে উঠে যাবে। কমসে-কম রুটি-কাটনেওয়ালা তো হবেই।

পাভলো দ্বিতীয় ট্রে-টা ইয়েরমোলায়েভের হাতে দিতে বলল। ইয়েরমোলায়েভের বাড়ি সাইবেরিয়ায়। বেশ ধুমসো চেহারা। জার্মানদের হাতে পড়েছিল বলে ওকেও দশ বছরের সাজা খাটতে হচ্ছে। পাভলো গপচিককে ডেকে এখুনি খালি হয়ে যাবে এমন একটা টেবিল দেখতে বলল। শুখভ তার ট্রে-টা খাবার নেবার জানলায় ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পাভলো জানলার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জানান দিল: ব্রিগেড একশো চার।

দেওয়া-নেওয়া করবার জানলা আছে পাঁচটা। তিনটে আছে খাবার দেওয়ার জন্যে, একটা জানলা আছে রুগীদের বিশেষ রকমের পথ্য যোগানোর জন্যে (যে দশজনের পেটে ঘা, এবং তাছাড়া হিসেবপত্র বিভাগের খাতাঞ্চিরা কলকাঠি নাড়ার গুণে, একই খাবার পায়) আর শেষটাতে হয় এঁটো বাসন চালাচালি। শেষের জানলাটায় এঁটো চাটার জন্যে লোকে কামড়াকামড়ি করে। জানলা বলতে নীচু নীচু ছোট খোঁদল—কোমরের চেয়ে একটু উঁচুতে। রান্নার লোকদের মুখ দেখা যায় না; শুধু ওদের হাত আর হাতাগুলো নড়তে দেখা যায়।

রান্নার এই লোকটার হাতদুটো চিকন-চাকন, ধবধবে সাদা থাবাদুটো বাঘা বাঘা আর লোম বেশী। রান্না করার চেয়ে মুষ্টিযোদ্ধা হলেই মানাত ভাল। পেন্সিল হাতে নিয়ে দেয়ালে টাঙানো একটুকরো কাগজে ও টুকে নিচ্ছিল: একশো চার—২৪।

পান্তেলেয়েভ খোঁড়াতে খোঁড়াতে খাবার ঘরে ঢুকল। ব্যাটা ভান করছে। আসলে ওর কিস্যু হয়নি।

রান্নার লোকটি একটা দু-সেরী হাতা কড়াইয়ে ডুবিয়ে ঘটাং-ঘট ঘটাং-ঘট ঘটাং-

ঘট করে সমানে ঘুঁটে চলেছে। লোকটার সামনে একটা হাঁড়ি সবে কানায় কানায় ভরা হয়েছে; হাঁড়ির মুখ থেকে হুস্ হুস্ করে গরম ভাপ উঠছে। তারপর লোকটি আধ সের তিন পোয়া আঁটে এমন একটা ছোটমত হাতা নিয়ে আলগোছে একটু ডোবাতে না ডোবাতেই তুলে নিয়ে বাটিগুলোতে ঢালতে শুরু করে দিল। মুখে আওড়ে চলল, —রামে রাম দুয়ে দুই, তিনে তিন, চারে চার...

শুখভ ভাল করে দেখে রেখে দিল নীচে থিতিয়ে বসবার আগেই কোন্ কোন্ বাটিতে ঢালা হল আর কোন্ কোন্ বাটিতে পড়ল নিছক পাতলা জলীয় অংশ। দশটা বাটি ট্রে-র ওপর তুলে নিয়ে শুখভ রওনা হল। দ্বিতীয় সারির খুঁটিগুলো যেখানে, সেখান থেকে গপ্চিক হাত নেড়ে শুখভকে ডাকল,—এইখানে, ইভান দেনিসিচ ভায়া—এইখানে!

বাটি নিয়ে যাবার সময় হাত একটু নড়লেই সর্বনাশ। শুখভ তরতর করে হেঁটে যাওয়ায় বাটিগুলো একটুও হেলেনি। শুখভ দিব্যি কথা বলতে বলতে হেঁটে গেল, —ওহে, ও খ-৯২০! একটু দেখে, চাচা—দেখে! আরে হটো না, ভাই—হটো না!

এই ভিড়ের মধ্যে দশটা কেন, একটা বাটিও যদি না-চল্কিয়ে নিয়ে যেতে পারো তো মুরোদ বুঝি! শুখভ কিন্তু খুব হুঁশিয়ার হয়ে টেবিলের একধারে আল্তোভাবে ট্রে-টা রাখল। জায়গাটা গপ্চিক আগেই মুছে রেখেছিল। শুখভ এমন সুন্দরভাবে ট্রে-টা নামাল যে নতুন করে সে-জায়গায় একছিটে দাগ লাগল না। আর ট্রে-টা আগে থেকে ভেবেচিন্তে এমনভাবে ঘুরিয়ে বসাল যাতে পুরু হয়ে জমাট-বাঁধা তার ভাগের দুটো বাটি তার বসার জায়গাটার দিকে থাকে।

ইয়েরমোলায়েভ আরও দশটা বাটি আনল। গপ্চিক ছুটে গিয়ে পাভলোর সঙ্গে ভাগাভাগি করে শেষ চারটে বাটি নিজেরা হাতে করে নিয়ে এল।

কিল্গাস একটা ট্রে-তে করে রুটি নিয়ে এল। আজ ওরা খাবার পাচ্ছে কাজের হিসেবে। কেউ পাচ্ছে সাত, কেউ দশ আর শুখভ পাচ্ছে চোদ্দ আউন্স রুটি। শুখভ নিজের চোদ্দ আউন্সের ভাগটা নিল বাইরের শক্ত ছালের দিক থেকে আর ৎসেজারের সাত আউন্সের ভাগটা নিল রুটির মধ্যেকার নরম ফুল্কো অংশটা থেকে।

এমন সময় ব্রিগেডের লোকজনেরা খাবারের জন্যে চারদিক থেকে এসে হাম্লে পড়ল। যেখানে হোক বসে পড়ে ঢক ঢক করে গলায় ফেলে গিলে নাও। শুখভ হাতে হাতে বাটি এগিয়ে দিচ্ছে, মনে করে রাখছে কার কার নেওয়া হয়ে গেল আর সেইসঙ্গে ট্রে-র এককোণে তার ঘন সুরুয়াওয়ালা বাটিদুটোর ওপর নজর রাখছে। শুখভ তার চামচেটা দুটো বাটির একটাতে ডুবিয়ে রাখল। তার মানে, বাটিটা ইতিমধ্যে একজনের নেওয়া হয়ে গেছে। ফেতিউকভ আগে আগে তার বাটিটা শেষ করে উঠে চলে গেল। ও বুঝল নিজের ব্রিগেডে পাত কুড়োনোর আশায় বসে থেকে আজ কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে ও বরং গোটা ঘর টহল দিয়ে বেড়াবে। কারো পাতে এঁটোকাঁটা পড়ে থাকলে ফেতিউকভ যাতে কুড়িয়ে খেতে পারে। কেউ যদি পুরো না খেয়ে বাটিটা ঠেলে রাখে, সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক বাটির ওপর শকুনের পালের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শুখভ আর পাভ্‌লো গুনে-গেঁথে দেখে নিল। দেখল যা আছে তাতে সকলেরই কুলিয়ে যাবে। শুখভ একটা ঘন সুরুয়াওয়ালা বাটি তিউরিনের জন্যে সরিয়ে রেখে দিল। জার্মানদের কাছ থেকে পাওয়া একটু মুট্‌কিওয়ালা চ্যাপ্টা টিনের কৌটোয় খাবারটা ঢেলে নিল। কৌটোটা সে ওভারকোটের তলায় বুকের সঙ্গে লেপটে নিয়ে যাবে। ট্রেগুলো ওরা খালাস করে দিল। পাভ্‌লো নিজের ডবল ভাগ আর শুখভ একজোড়া বাটি নিয়ে বসে গেল। আর কোনো কথাবার্তা নয়। পূত মুহূর্ত এবার সমাগত।

মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলে শুখভ হাঁটুর ওপর রাখল। তারপর চামচ দিয়ে নেড়ে নেড়ে প্রথমে এ-বাটি থেকে, পরে ও-বাটি থেকে চেখে দেখে নিল। একেবারে খুব খারাপ নয় তো! দু-চারটে চুনোচানা মাছও আছে দেখছি। ওবেলার চেয়ে এবেলার সুরুয়াটা হয়েছে মোটের ওপর ঢের পাতলা। সকালবেলায় কয়েদীদের খেতে দেওয়া হয় যাতে ওরা খাটাখাটনি করতে পারে। সন্ধেবেলায় দেওয়া না দেওয়া সমান—সেই তো ওরা ঘুমোবেই।

শুখভ খেতে শুরু করে দিল। প্রথমে পাতলা ঝোলটা খেয়ে নিল। বেশ একটা গরম ভাব ভেতরে চলে গিয়ে তার সারা শরীরে আনন্দের বান ডেকে আনল। ভেতরের তন্ত্রীগুলো ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে সেই সুরুয়াটাকে অভ্যর্থনা জানাল। খু—ব ভাল। সেই অচিরস্থায়ী মুহূর্তটি এসে গেল, যে মুহূর্তটির পথ চেয়ে কয়েদীরা কত আশা করে বসে থাকে।

এরপর শুখভ বাটির তলায় লেগে থাকা এইটুকু একটু সুরুয়া দিয়ে কচকচ করে বাঁধাকপি খেতে শুরু করে দিল।

এখন ঠিক এই মুহূর্তে কোনোকিছুর ওপর শুখভের রাগ নেই; তার যে এই দীর্ঘমেয়াদী সাজা, দিনমান যে এত দীর্ঘ, রবিবারেও যে তাকে কাজে যেতে হবে—এমন কি এসবের জন্যেও তার আর এখন কোনো নালিশ নেই। এখন সে শুধু ভাবছে; আমরা বেঁচে থাকব। যত যাই হোক, আমরা বাঁচব। আর ভগবান যদি মুখ তুলে চান, একদিন না একদিন এর অবসান হবে।

প্রথম এবং দ্বিতীয়, দুটো বাটি থেকেই পাতলা ঝোলের অংশটা খেয়ে নিয়ে শুখভ দ্বিতীয় বাটির অবশিষ্টাংশ প্রথম বাটিতে ঢেলে নিয়ে চামচে করে গা চেঁছে পরিষ্কার করে বাটিটা উপুড় করে দিল। যাক, এতক্ষণে শুখভ একটু সোয়াস্তি পেল। আর এখন তার দ্বিতীয় বাটিটা নিয়ে কোনো মাথাব্যথার কারণ থাকল না; সবসময় চোখে চোখেও রাখতে হবে না, হাত দিয়ে আগলাতেও হবে না।

শুখভ এবার নির্ভাবনায় আশপাশের বাটিগুলোর দিকে চেয়ে দেখতে পারছে। যে ওর বাঁ পাশে বসেছে তার ভাগে পড়েছে পুরোটাই শুধু পাতলা জল। আপন কয়েদীভাই সব—তাদের সঙ্গেও শালার বেটা শালারা এমনি ছোটলোকের মত ব্যবহার করে।

শুখভ কপিসেদ্ধ আর সুরুয়ার শেষটুকু এবার খেতে শুরু করে দিল। শুখভ

ৎসেজারের বাটি থেকে একটুকরো আলু উদ্ধার করল। ঠাণ্ডাঘরের মাঝারি সাইজের আলু—কিন্তু গলে পাঁক হওয়াও নয় এবং একেবারে মিষ্টত্ববর্জিতও নয়। মাছ নেই বললেই হয়, মাঝে মাঝে হাতে ঠেকে দু-চারটে বা কাঁটা-চোকড়া '। কিন্তু শুখভ বসে বসে প্রত্যেকটা কাঁটা আর পাখনা চিবোতে থাকে, হুস হুস করে কাঁটার ভেতরকার রসটুকু চুষে নিতে থাকে—কেননা ঐ রস শরীরের পক্ষে ভাল। এতসব করতে সময়ও অবশ্য লাগে। কিন্তু শুখভের এখন এমন কিছু তাড়া নেই। আজ ও যে কার মুখ দেখে উঠেছে! বড় শুভদিন আজ। দুপুরেও ডবল খাবার, রাত্তিরেও ডবল। অন্যসব কাজ আজ পড়ে থাকতে পারে!

অবশ্য তামাকের জন্যে লাৎভিয়াব লোকটার কাছে একবার না গেলেই নয়। নইলে হয়ত কাল সকালের আগেই সব উড়ে পুড়ে যাবে।

শুখভ বিনা রুটিতেই তার নৈশভোজন চালিয়ে যাচ্ছিল। একে ডবল বাটি, তার ওপর আবার রুটি খেলে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। রুটিটা কালকের জন্যে তোলা থাক। পেট জিনিসটা হল একের নম্বরের নিমকহারাম—আজ যে এত কিছু পেল সমস্তই ভুলে গিয়ে কালই আবাব খাই-খাই করতে শুরু করে দেবে।

শুখভ নিবিষ্টচিত্তে সুরুয়াটুকু শেষ করল। নিজে আগ্রহ করে ধারে কাছে আর কে আছে না আছে দেখবার তেমন চেষ্টা করল না। আজ শুখভের তেমন কোনো ঠেকা নেই। আজ আব ওকে বাড়তি খাবারের ধান্ধায় থাকতে হচ্ছে না—নিজের যা ন্যায্য পাওনা, তাই সে খাচ্ছে। তবু তার চোখে না পড়ে পারল না: টেবিলের ওধারে একটা জায়গা খালি হওয়ায় ঢ্যাঙামত একজন বুড়োমানুষ—য়ু-৮১—এসে বসল। শুখভ জানত, ও ৬৪ নম্বর ব্রিগেডের লোক। পার্সেল-ঘরের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় শুখভ শুনে এসেছে—১০৪নং ব্রিগেডের জায়গায় ৬৪নং ব্রিগেড আজই গিয়েছিল 'সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন'-এর নগরপত্তনের কাজে, সেখানে তাদের সারাটা দিন খোলা মাঠে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেদেব চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরতে হয়েছে।

শুখভ শুনেছে ঐ বুড়ো লোকটা নাকি অনন্তকাল ধরে জেলখানায় আর ক্যাম্পে পচছে—এতবার এত বন্দীমুক্তি হয়, বুড়োর কেউ নামও করে না। একটা করে দশ-শালা মেয়াদ শেষ হয় আব তক্ষুণি আবার বুড়ো নতুন করে দশ বছরের সাজা পায়।

লোকটাকে শুখভ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ক্যাম্পেব আব যেসব পিঠকুঁজো-হওয়া লোক আছে, তার মধ্যে এই বুড়োর পিঠই সবচেয়ে খাড়া। টেবিলে বসে আছে, কিন্তু এত ঢ্যাঙা যে, দেখে মনে হচ্ছে যেন উঁচু কিছু নীচে পেতে তার ওপর বসেছে! বহু বছর ধরেই ওর আর পরামানিকের প্রয়োজন হয়নি: জেলে যে কী সুখে কাটিয়েছে, সেটা ওর মাথার এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো টাক দেখলেই বোঝা যায়। বুড়ো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে; কিন্তু খাবারঘরে কী ঘটছে না ঘটছে সেসব ও দেখছে না—অন্যমনস্ক হয়ে শুখভের মাথার ওপর একটা জায়গায় ঠায় চেয়ে থেকে আত্মসমাহিত হয়ে কী যেন ভাবছে। ঘষা লেগে লেগে ক্ষয়ে যাওয়া একটা কাঠের চামচ করে বুড়োটা জলের

মত পাতলা সুরুয়াটুকু তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল । ও কিন্তু অন্যাদের মত হেঁট হয়ে বাটির কাছে মুখ নিয়ে যাচ্ছিল না—চামচটা উঁচু করে তুলে মুখের কাছে আনছিল । লোকটা একদম ফোক্‌লা ; শক্ত মাড়ি দিয়ে রুটির টুকরোগুলো চিবোচ্ছিল । ওর জীর্ণশীর্ণ মুখ দেখে কিন্তু জরাগ্রস্ত অথর্ব পঙ্গু বলে বোধ হয় না—মনে হয় কেউ যেন পাথরে ছায়া-ছায়া মূর্তি খোদাই করে রেখেছে । কালি-লাগা, কোঁচকানো হাতের প্রকাণ্ড থাবাদুটো দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় এই দীর্ঘ বন্দীজীবনে যাদুর গাযে হাত বোলানো গোছের কাজের সুযোগ তার ববাতে বিশেষ জোটেনি । কিন্তু ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা এমন গোঁ আছে, কিছুতেই কারো কাছে মাথা নোয়াবে না । আর পাঁচজনের মত ও কিন্তু এঁটো-ছড়ানো নোংরা টেবিলের ওপর ওর পাঁচ-ছ'টাকী রুটিটা রাখেনি । রেখেছে একটা ফর্সা ন্যাকড়ার ওপর ।

কিন্তু হলে কী হবে, লোকটার দিকে এখন হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকার সময় নেই শুখভের । গেলার পালা শেষ করে চামচেটা জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কাব কবে, তারপর ভালেঙ্কির মধ্যে চামচেটা চালান কবে দিয়ে, মাথার টুপিটা কপাল পর্যন্ত টেনে নামিয়ে এনে শুখভ উঠে পড়ল । উঠে তার নিজের আর ৎসেজাবের ভাগের রুটিদুটো হাতে নিয়ে খাবারঘর থেকে বেরিয়ে গেল । খাবাবঘর থেকে বেরোবার রাস্তা অন্য একটা বারান্দা দিয়ে । বেবোবার দরজায় দুজন ফালতু দাঁড়িয়ে । কেউ বেরোবার সময় একবার করে দরজার হুড়কো খোলা আব বেরিয়ে যাবার পর একবার করে হুড়কো লাগানো—এই ওদের একমাত্র কাজ ।

আজ শুখভের খাওয়াটা ভবপেট হয়েছে । তাই ওর বেশ ফূর্তির ভাব । বেবিয়ে ঠিক কবল এক দৌড়ে লাৎভিয়াব সেই লোকটার কাছ থেকে ঘুরে আসবে—যদিও রাতের ঘণ্টা বাজতে বেশী দেরি নেই । নিজেদের ন'নম্বর ব্যারাকে রুটিটা নিয়ে যাওযার বদলে শুখভ সাত নম্বরের দিকে হাঁটা দিল ।

আকাশের অনেকখানি ওপরে চাঁদ—যেন ঝকঝকে সাদা পাথর কুঁদে তৈরি । মেঘহীন টলটলে আকাশ । অন্ধকারের গায়ে ঝিকমিক করছে ফোঁটা ফোঁটা তাবা । কিন্তু শুখভের এখন হাতে সময় নেই আকাশটাকে খুঁটিয়ে দেখবার । একটি জিনিসই শুধু তার মাথায় ঢুকল—ঠাণ্ডা কম পডবার আশা নেই । লোকমুখে শোনা গেছে, বেসামবিকদের একজন নাকি বলেছে রাত্তির নাগাদ তাপমাত্রা কমে নাকি মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি হবে এবং ভোরের দিকে নাকি সেটা আরও কমে গিয়ে মাইনাস চল্লিশে নামবে ।

বহু দূব থেকে এ রাজ্যে গুনগুন করে ভেসে আসছে একটা ট্র্যাক্টবেব আওয়াজ ; আর বড় রাস্তাটার ওদিকে একটা মাটি-কাটার গাড়ি বিশ্রীবকমেব কর্কশ গলায় চিল্লাচ্ছে । ভালেঙ্কি পরে যারাই যেখানে হেঁটে যাচ্ছে বা ছুটছে, তাদেরই পাযেব জুতো থেকে খচর-মচর খটাস খট আওয়াজ হচ্ছে ।

কিন্তু কোথাও হাওয়াব টুঁ শব্দ নেই ।

শুখভ যে তামাক কিনতে যাচ্ছে, সেটা বাড়ি থেকে আনা নিজেদেব চাষের তামাক ।

ছোট এক গেলাস তামাকের দাম পড়বে এক রুবল । ক্যাম্পের বাইরে কিনতে গেলে ওরই দাম লেগে যাবে তিন রুবল এবং একটু ভাল তামাক হলে আরও বেশী । কড়া-খাটুনির ক্যাম্পগুলোতে সব জিনিসেরই দামের একটু বিশেষত্ব আছে, ঠিক অন্যান্য জায়গার মত নয়—কারণ, এ জায়গায় টাকাপয়সার তেমন চলন নেই । টাকা খুব কম লোকেরই আছে এবং যা আছে তাও চোখে বিশেষ দেখা যায় না । এখানে কয়েদীদের সারাদিন খাটিয়ে নিয়ে একটা পয়সাও দেওয়া হয় না । উস্‌ৎ-ইঝ্‌মায় থাকতে শুখভ মাসে কম্‌সে-কম তিরিশ রুবল করে পেত । এখানে কারো আত্মীয়স্বজন টাকা পাঠালে অফিসাররা সে টাকা কাউকে নগদ হাতে তুলে দেয় না—টাকাটা তার নামে খাতায় জমা হয় । সেই টাকা দিয়ে সে গায়ে-মাখা সাবান, বাসি বোদা কেক, প্রাইমা-মার্কা সিগারেট কিনতে পারে । ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত দামে কোন্ কোন জিনিস তুমি চাও, এক-টুকরো কাগজে লিখে দিতে হবে । জিনিস পছন্দ হোক না হোক, ফেরত নেই । যদি তুমি না চাও, তাহলে কিন্তু টাকাটা জলে গেল—কেননা, মনে রেখো, তোমার নামে জমা টাকার অঙ্ক থেকে ঐ টাকাটা কাটা হয়ে গেছে ।

শুখভ এখানে যতটুকু যা রোজগার করে, তার সবটুকুই করে গোপনে এর ওর টুকিটাকি কাজ করে দিয়ে । খদ্দের মালমশলা যোগাবে আর শুখভ চটি বানিয়ে দেবে —তার চার্জ দু' রুবল । ভেতরের জামায় তালি লাগাতে হবে—দু'জনে কথাবার্তা বলে তার দরদস্তুর ঠিক হবে ।

সাত নম্বর ব্যারাকটা ন'নম্বরের মত দু-আধখানা করে ভাগ করে নয় । সাত নম্বরে টানা লম্বা দালান চলে গেছে, তাতে দশটা দরজা ফোটানো ; আর প্রতি কামরায় সাতটা করে বাঙ্কে গুঁতোগুঁতি করে থাকে একটি করে ব্রিগেড । তাছাড়া একচিল্‌তে একটি ঘরে পেচ্ছাপের টুকরি রাখার ব্যবস্থা । আর আছে এ ব্যারাকের বড় ফাল্‌তুর নিজের একটি খুপ্‌রি । যারা শিল্পী, তাদেরও আছে আলাদা ঘর ।

শুখভ সোজা তার সেই লাৎভিয়ার লোকটির ঘরে ঢুকে গেল । একটা বাঙ্কের নীচের দিকে একটা ধারে পা তুলে দিয়ে শুয়ে শুয়ে সে তখন তার পাশের লোকটির সঙ্গে লাৎভিয়ান ভাষায় গালগল্প করছিল ।

শুখভ তার বিছানার পাশে বসে পড়ে বলল,—ইয়ে, কী খবর ?

যেখানকার পা সেখানেই রেখে লোকটা ছোট্ট করে উত্তর দিল,—এই যে, কী খবর । ছোট্ট এতটুকু ঘর । সবাই কান খাড়া করে আছে । কে ? কী মতলবে এসেছে ? বললে এক্ষুণি হাটে হাঁড়ি ভাঙা হয়ে যাবে ।

দুজনেই সেটা বুঝল । বুঝে শুখভ কিছু আর না ভেঙে খেজুরে আলাপ জুড়ে দিল ।

—তারপর, ইয়ে, আছ কেমন ?

—ভাল ।

—আজ বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, না ?

—হ্যাঁ ।

ঘরে অন্যেরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা আবার শুরু না করা পর্যন্ত শুখভ কিছুতেই আর কথাটা পাড়ছে না। কোরিয়া যুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে একটু বাদেই ওরা মেতে উঠল। কোরিয়া যুদ্ধে চীনের মাথা গলানোর ফলে বিশ্বযুদ্ধ বাধবে কি বাধবে না এই নিয়ে জোর তর্ক বেধে গেল । শুখভ সেই ফাঁকে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল,—তামাক নেই তোমার কাছে ?

—আছে ।

—দেখাও তো ।

বাঙ্কের ধারটা থেকে পা দুটো সরিয়ে মেঝেয় নামিয়ে লাৎভিয়ার লোকটি উঠে বসল । অতি তেএঁটে লোক । গেলাসে যখন তামাক ঢালে ওর সবসময় ভয় এই বুঝি এক খামচা বেশী চলে যায় ।

লোকটা শুখভকে তামাকের থলিটা দেখিয়ে থলির মুখটা ফাঁক করল ।

শুখভ থলি থেকে এক খামচা তুলে হাতের চেটোর ওপর রাখল । দেখে বুঝল —হ্যাঁ, এবারও সেই আগেরবারেরই তামাক । যেমনি কটা রং আর তেমনি কড়া । নাকের কাছে ধরে গন্ধ শুঁকল । হ্যাঁ, সেই তামাকই বটে । কিন্তু মুখে বলল,—সে তামাক নয় বলে মনে হচ্ছে !

লোকটি ঝাঁঝালোভাবে বলল,—সেই তামাকই । বলছি, সেই তামাক । আমার কাছে এছাড়া অন্য তামাক থাকে না । আমার তামাক বরাবর এক ।

শুখভ বলল,—ঠিক আছে, আমাকে তুমি পুরো এক গেলাস ঠেসে দাও । খেয়ে দেখি, ভাল হলে পরে আর এক গেলাস নেবখন ।

শুখভ 'ঠেসে দাও' কথাটা ইচ্ছে করেই বলল । কারণ, লোকটার স্বভাবই হল গেলাসে আলগা করে তামাক ভরা ।

লোকটা বালিশের তলা থেকে আরেকটা থলি বার করল । তাতে প্রথমটার চেয়ে তামাকের পরিমাণ একটু বেশী । তারপর নিজের দেরাজটা খুলে একটা ছোট গেলাস বার করল । গেলাসটা প্ল্যাস্টিকের হলেও, শুখভ মেপে দেখেছে, এমনি গেলাসেরই মত একই মাপের ।

লোকটা ঝুরঝুর করে গেলাসে তামাক ঢালতে লাগল ।

—চেপে দাও ! কই, চেপে চেপে দাও—বলে শুখভ নিজেই আঙুল দিয়ে ঠাসতে লেগে গেল ।

—যাও, যাও—মা-র কাছে মাসির গল্প ! বলে ঝাঁঝ দেখিয়ে গেলাসটা হাতে পুরে লোকটা নিজেই আঙুল দিয়ে ঠাসতে লাগল । তবে ওর ঠাসাটা একটু আলতোভাবে হচ্ছিল । এরপর লোকটা গেলাসে আরও খানিকটা তামাক ভরল ।

ইতিমধ্যে শুখভ কোটের বোতাম খুলে ফেলেছে । কোটের আস্তরটা হাতড়াতে হাতড়াতে একজায়গায় হাতে একটা কাগজ ঠেকল । তারপর দুহাত দিয়ে কাপড়টা

টেপাটেপি করে ভেতরের কাগজটা সরিয়ে সরিয়ে অন্য পাশের আস্তরে একটা ছোট ছেঁড়া ফুটোর মুখে নিয়ে এল। ফুটোটা দুটোমাত্র সুতোর ফোঁড় দিয়ে বন্ধ করা ছিল। কাগজটা গর্তের কাছে নিয়ে এসে শুখভ নখ দিয়ে পট্ পট্ করে সুতোদুটো ছিঁড়ে ফেলল। তারপর কাগজটা লম্বালম্বি সরু করে ভাঁজ করে নিয়ে ফুটো গলিয়ে বার করে আনল। দুটো রুবল। এত পুরনো যে, নোটদুটো একদম ন্যাতা হয়ে গেছে।

ঘরের মধ্যে একজন কয়েদী চিৎকার করে বলে উঠল,—তোমাদের দুঃখে গুঁফোদাদার প্রাণ গলবে ভাবছ ? ঐ আশাতেই বসে থাকো। নিজের মা-র পেটের ভাইকেই ও বিশ্বাস করে না, তার আবার তোমবা। আচ্ছা উজবুক সব !

কড়া-খাটুনির ক্যাম্পে একটা সুবিধে এই যে, এখানে নির্ভয়ে রাজাউজির মারা যায় —যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। উস্‌ৎ-ইঝমায় যদি তুমি বললে বাইরে দেশলাইয়ের আকাল পড়েছে, তো তোমার হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে সেলে পাঠিয়ে আরও দশ বচ্ছর ঠুকে দেবে। কিন্তু এখানে তুমি বাঙ্কের মাথায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে যা খুশি তাই অবাধে বলতে পারো—এখানকার টিকটিকিরা পর্যন্ত সেসব কথা শুনে কর্তাদের কান ভারী করতে ছুটবে না ; এমন কি নিরাপত্তা দপ্তরও ওসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

কিন্তু মুস্কিল হল, বলবে কখন ? সময় কোথায় ?

—ওহে, বড্ড আলগা করে ভরছ—শুখভ আপত্তি জানাল।

আচ্ছা বাপু, আচ্ছা—বলে লোকটা আরেক টিপ তামাক গেলাসের মাথায় রাখল।

শুখভ তার কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা থলি বার কবে তার মধ্যে পুরো তামাকটা ঢেলে নিল।

এমন মিঠে সিগারেট হুটপাট কবে খাওয়া ঠিক হবে না। মনে মনে ঠিক করে নিয়ে শুখভ বলল,—ঠিক আছে, আরেক দফা দাও।

আবার খানিকটা কস্তাকস্তি করে থলিতে দ্বিতীয়বার তামাক ভরে নিল। তারপর লোকটার হাতে দুটো রুবল ধরে দিয়ে মাথাটা নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে শুখভ বিদায় নিল।

বাইরে বেরিয়েই শুখভ নিজের ব্যারাকের দিকে ছুট লাগাল—যাতে পার্সেল নিয়ে ফেরামাত্র ৎসেজারকে শুখভ ধরতে পাবে।

কিন্তু ব্যাবাকে ফিরে শুখভ দেখল ৎসেজার নীচের বাঙ্কে বেশ গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। পার্সেল পেয়ে তার বেশ গদগদ ভাব। বিছানার ওপব আর দেরাজে ওর জিনিসপত্রগুলো ছড়িয়ে রয়েছে ; বাতির আলো একে ও-জায়গায় সরাসরি পড়ে না, তার ওপর শুখভেব বাঙ্কের ছায়া পড়েছে—কাজেই জায়গাটা অন্ধকার হয়ে আছে।

ৎসেজার আর ক্যাপ্টেনের বাঙ্ক দুটোব মাঝখানে এসে এ-বেলার বরাদ্দ রুটিটা ৎসেজারকে দেবার জন্যে শুখভ নীচু হল।

—তোমার রুটিটা, ৎসেজার মার্কোভিচ !

শুখভ এও বলতে পারত : আচ্ছা ! পেয়েছ তাহলে ? কিন্তু তা বলল না। কারণ, বললে তার মানে দাঁড়াত এই যে, শুখভ ওর হয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছিল এবং পার্সেলের

জিনিসে শুখভেরও একটা অধিকাব আছে । মুখে না বললেও শুখভ জানে যে, সে অধিকার তাব সত্যিই আছে । কিন্তু এমন কি আট বছর কয়েদী জীবন যাপন কবার পর শুখভ ফেরুপাল হয়ে যায়নি—এবং যত দিন যাচ্ছে ফেরুপাল না হওয়াব সঙ্কল্প তার মনে ক্রমশ দৃঢ়তর হচ্ছে ।

কিন্তু শত হলেও, শুখভ তার চোখদুটোকে কিছুতেই সামলে রাখতে পারছে না । শুখভ হল জেলের বাস্তুঘুঘু ; কিন্তু তার চিলেব মত নজর—বিছানায় আর দেরাজে ছড়ানো পার্সেলের জিনিসগুলো সে একনজরে ধাঁ করে দেখে নিল । যদিও সব জিনিস তখন ঠোঙা আর থলি থেকে পুরো খোলা হয়নি, কিছু কিছু জিনিস তো তখনও বাঁধাছাঁদা অবস্থাতেই ছিল—তাহলেও একনজরে দেখে এবং ঘ্রাণশক্তি দিয়ে সেই দেখাটাকে যাচাই করে শুখভ জানতে পারল : ৎসেজার পেয়েছে সসেজ, জমানো দুধ, ভাপানো পাকা মাছ, চর্বিওলা শুয়োরের নোনা মাংস, মিষ্টি গন্ধওলা পিঠে, নানারকমের সুন্দর মশলাদার ভাজাভুজি, সেরটাক মিছরি—এবং তাছাড়া—মাখন, সিগারেট আব পাইপেব তামাক ; এবং এসব বাদেও আবও যেন কী কী ।

আর শুখভ এত কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে ঐ একটি মুহূর্তের মধ্যে, যখন সে বলেছে : তোমার রুটিটা, ৎসেজার মার্কোভিচ ।

আর ৎসেজার ডগমগ হয়ে কেমন যেন নেশার ঘোরে—খাবারের পার্সেল এলে অমন অবস্থা সকলেরই হয়—হাতের ইশাবা করে শুখভকে রুটিটা নিয়ে নিতে বলল, ওটা তুমি নিয়ে নাও, ইভান দেনিসিচ ।

সুরুয়া এবং তদুপরি পোয়াটেক রুটি ! একেবাবে পুবো ভুরিভোজ ! বোঝাই যাচ্ছে, ৎসেজারের খাবারদাবাব থেকে এটাই হল তাহলে শুখভের মোট পাওনা । মিঠাইমণ্ডার আশায বসে রইলে, পেলে কাঁচকলা—এর চেয়ে বিশ্রী জিনিস আব হয় না ।

একবারের রেশনে শুখভ রুটি পেয়েছে চোদ্দ আউন্স, আরেকবারে সাত আউন্স এবং এছাড়া আবও অন্তত আউন্স সাতেক আছে তোশকের ভেতর । আবার কী চাই ! সাত আউন্স এখনই মেরে দেবে । পাউণ্ডখানেক কিংবা তার হয়ত কিছু বেশীই থাকবে কাল সকালের জন্যে । আর পাউণ্ডটাক সঙ্গে নেবে কাজে যাবার সময় । কাজে যাবার সময় সঙ্গে নেবে—আঃ, এ না হলে জীবন ! তোশকের ভেতবকার রুটিটা আর বের করে কাজ নেই । ভাগ্যিস্, শুখভ সেলাই করে রাখবার সময পেয়েছিল । আজও বন্ধ দেরাজ থেকে রুটি চুরি হয়ে গেছে ৭৫ নম্বর ব্রিগেডে । নালিশ কবে তো কচু ফল হবে ।

কেউ কেউ আছে যারা মনে করে পার্সেল যে পেল, সে বুঝি সাত রাজার ধন হাতে পেল—সুতরাং যে যা পারে তার কাছ থেকে বাগিযে নেয় । কিন্তু মনে মনে একটু যদি খতিয়ে দেখ, তাহলে দেখবে : আসতেও যতক্ষণ যেতেও ততক্ষণ । বাড়ি থেকে নতুন পার্সেল না আসা পর্যন্ত খানিকটা বাড়তি খিচুড়ির আশায় নিজের গরজে কাউকে কাউকে এটা-সেটা করতেই হয এবং সেইসঙ্গে তারা আধপোড়া সিগারেটের তক্কে তক্কে

থাকে । পাহারার লোক, ফোরম্যান, প্যাকিং-এর ঘরে যাদের হাল্কাগোছের কাজ—এদের তুমি কিছু না দিয়ে কী করে পারবে ? যদি দিতে রাজী না হও, ওরা তোমার প্যাকেট গায়েব করে ফেলবে—ফলে, এক হপ্তার মধ্যে লিস্টিতে ও-জিনিসটার নামই উঠবে না । সকালে কাজে যাবার সময় চোর আর টহলদারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে যার যা আছে চেকিং-ঘরের জমাদারের কাছে রেখে যেতে হয় ; ৎসেজারকেও ওর পার্সেলের জিনিসগুলো পুঁটলিতে বেঁধে জমাদারের জিম্মায় রেখে যেতে হবে । ওটা ক্যাম্পের কর্তার হুকুম । চেকিং-ঘরের জমাদারকে যদি তুমি নিজে থেকে খানিকটা ভাগ না দাও, ও তোমাকে না জানিয়ে একটু একটু করে যা নেবে তা তোমার দেওয়ার চেয়ে বেশী হয়ে যাবে । সারাটা দিন ও-বেটা অন্য লোকের খাবার-দাবার নিয়ে একা ঘরে বন্ধ হয়ে আছে —কার সাধ্যি ওকে ধরে ? তাছাড়া অনেকে অনেকভাবে সাহায্য করে—যেমন শুখভ করেছে । তাদেরও তো খুশী করতে হবে । যে লোকটার স্নানের ঘরে ডিউটি, সে যাতে ধোপদুরস্ত কাপড়চোপড় দেয় তার জন্যে তাকেও কিছু দেওয়া চাই—বেশি নয়, তবু কিছু তো বটেই । যে পরামানিক খেউরি করবার সময় তোমার খালি হাঁটুর ওপর না মুছে কাগজের গায়ে ক্ষুর মুছবে—তাকেও কিছু দিতে হবে । খুব বেশি কিছু নয় অবশ্য —নিদেনপক্ষে তিন-চারটে সিগারেট । শিক্ষা-সংস্কৃতি বিভাগেও কিছু ধরে দিতে হবে, যাতে চিঠিপত্রগুলো ঠিকমত পৌঁছোয়—চিঠি যাতে খোয়া না যায় । আর মনে করো, দু-একদিন তুমি চাও হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে—তার জন্যে ডাক্তারকেও কিছু দিয়ে রাখতে হবে । তোমার ঠিক পাশেই যে থাকে, তোমরা যারা একই দেরাজে জিনিস রাখো—যেমন ক্যাপ্টেন বুইনভস্কি আর ৎসেজার—তোমার সেই পাশের লোকটিকে কি তুমি না দিয়ে পারো ? প্রত্যেকটা গ্রাস মুখে তোলবার সময় তোমার পাশের লোক জুল জুল করে চেয়ে থাকবে । যার মন একদম পাষাণ, সেও না দিয়ে পারবে না ।

যারা সবসময় ভাবে আমার মুলোর চেয়ে ওর মুলোটা বড়, কারো পার্সেল আসতে দেখলে তাদের চোখ টাটাতে পারে । কিন্তু জীবন যে কী জিনিস শুখভ জানে ; এবং সে কারো কাছ থেকে খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করে না ।

ততক্ষণে শুখভ পা থেকে বুটজুতো খুলে ফেলে বাঙ্কে চড়ে বসেছে । হাতমোজার ভেতর থেকে ইস্পাতের ফলাটা বার করে উল্টেপাল্টে দেখে মনে মনে ঠিক করে নিল —কাল একটা ভাল পাথর যোগাড় করে ফলাটাতে শাণ দিয়ে নেবে যাতে ওটা দিয়ে জুতো সারানোর বাটালির কাজ হয় । চারটে দিন সকালসন্ধে ও যদি সমানে লেগে থাকতে পারে, তাহলে ইস্পাতের ফলাটা দিয়ে আগার দিকটা সুন্দর ছোট্ট একটা বাটালি বানিয়ে ফেলতে পারবে ।

কিন্তু আপাতত সকাল অবধি জিনিসটা লুকিয়ে রাখতে হবে । দেয়ালের গায় । নীচে ক্যাপ্টেনের বাঙ্কটা খালি থাকতে থাকতে—শুখভ খুব সাবধানে, ক্যাপ্টেনের মুখে-চোখে কিছু যাতে না পড়ে—কাঠগুঁড়োভর্তি ভারী তোশকটা উল্টে ইস্পাতের ফলাটা লুকোবার কাজে লেগে গেল ।

অন্যসব বাঙ্কের ওপরতলার লোকেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল শুখভ কী করছে। পাদ্রী আলিওশা—আর যাতায়াতের রাস্তার ওপারে পাশের বাঙ্কে এস্তোনিয়ার দুই মানিকজোড়। ওরা দেখলে শুখভের কিছু যায় আসে না।

ব্যারাকের ভেতর দিয়ে ফেতিউকভ এল কাঁদতে কাঁদতে। ঘাড়টা ঝুলে পড়েছে, ঠোঁট রক্তাক্ত। এঁটো বাসন চাটতে গিয়ে আবার ও পিটুনি খেয়েছে। কারো দিকে মুখ তুলে না চেয়ে, কান্না চাপবার কোনো চেষ্টা না করে, গোটা ব্রিগেডের পাশ দিয়ে চলে গিয়ে ফেতিউভ নিজের বাঙ্কে উঠে পড়ে তোশকে মুখ লুকোলো।

ওর কথা ভাবলে সত্যি দুঃখ হয়। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ও মরবে। এ জায়গায় ও ঠিক নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না।

এমন সময় ক্যাপ্টেন বুইনভস্কি এসে হাজির হল। খুব খুশী-খুশী ভাব। হাতে এক পাত্র স্পেশাল চা। ব্যারাকে দু-দুটো চা-ভর্তি পিপে—মরি মরি, কী চা? শুধু একটু যা বং কবা, কুসুম কুসুম গরম। বোদা বোদা খেতে। খোশবু বলতে একমাত্র পিপের ধোঁয়ানো কাঠেব ছাতা-পড়া গন্ধ। ওসব চা ছেঁদো লোকদের জন্যে। কিন্তু ৎসেজারের কাছ থেকে ক্যাপ্টেন একমুঠো আসল চা পেয়েছিল—চা যাকে বলে। সেই চা কেৎলিতে ফেলে ক্যাপ্টেন চলে গিয়েছিল কল থেকে গরম জল আনতে।

দেরাজেব ওপর চা রেখে ক্যাপ্টেন খোশমেজাজে বডাই করে বলল,—আর একটু হলেই গবম জলের কলে হাতটা পুড়িযে ফেলেছিলাম আর কি!

শুখভের তলার বাঙ্কে ৎসেজার ভাঁজ খুলে বিছানার ওপর একটা কাগজ পেতে তার ওপর এটা ওটা সাজিয়ে রাখছিল। শুখভ তার তোশকটা নামিয়ে রেখে দিল। যাতে ৎসেজারকে চোখে পড়ে গিযে মনটা না খারাপ হয়। কিন্তু ঠিক সেইসময় ৎসেজার প্রমাণ করে দিল শুখভকে ছাড়া ওদের চলতেই পারে না। দুধারি বাঙ্কের মাঝখানে সটান উঠে দাঁড়িয়ে শুখভেব দিকে মুখ তুলে ৎসেজার চোখ মটকাল,—দেনিসিচ, তোমাব দশরোজীটা একটু দাও তো।

'দশরোজী' বলতে ছুরি। শুখভের নিজের। ভাঁজ-করা পুঁচকে ছুরি। সেটাও দেয়ালেব গায়েই লুকিয়ে রাখা আছে। এক আঙুলের অর্ধেক ছোট ভাঁজ-করা ছুরি। কিন্তু পাঁচ আঙুল মোটা শুয়োরের মাংসও ব্যাটার ছেলে কুচ কুচ করে কেটে যেতে পারে। ছুরিটা শুখভ নিজে হাতে করেছে; নিজের বানানো, শাণও দিয়েছে নিজে।

শুখভ দেয়াল হাতড়ে ছুরি বার করে ৎসেজারের হাতে ছুরিটা তুলে দিল। ৎসেজার কৃতজ্ঞতাসূচকভাবে মাথাটা নেড়ে নিজের বাঙ্কে হাওয়া হয়ে গেল।

ছুরিটা শুখভকে আয় দেবে। কিন্তু যাই বলো, যার ছুরি তার মাথার ওপর সব-সময় সেল-সাজার খাঁড়া ঝুলছে। যে লোক নিতান্ত চশমখোর, সেই শুধু বলতে পারে: ছুরিটা একটু দাও তো, সসেজ কাটব—তাই বলে ভেবো না তুমি ভাগ পাবে।

শুখভের কাছ থেকে ৎসেজার যদি ধার নিয়ে থাকে তো ঠিকই আছে।

রুটি আর লোহার ফলার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার পর শুখভের হাতে আর একটা

মাত্র কাজ বাকি রইল—তামাকের থলির বিধিব্যবস্থা করা। শুখভ একটিপ তামাক নিয়ে (ঠিক যতটুকু ধার নিয়েছিল ততটুকুই) হাত বাড়িয়ে এস্তোনিয়ার লোকটিকে দিল, —এই যে ভাই, অনেক উপকার করেছ তুমি ! ধন্যবাদ !

এস্তোনিয়ার লোকটি মুখ হাসি হাসি করে ঠোঁটদুটো ফাঁক করল। তারপর ওর ধর্মভাইকে ডেকে কী যেন বিড় বিড় করে বলল এবং সেই এক টিপ তামাক দিয়ে একটা সিগারেট বানিয়ে ফেলল—টেনে দেখাই যাক, শুখভের তামাকটা কেমন।

যত ইচ্ছে টেনে দেখতে পারো। তোমাদেরটার চেয়ে মোটেই খারাপ নয়। শুখভ নিজেই একবার টেনে পরখ করে দেখত, কিন্তু ওর ভেতরের অন্তর্যামী ঘড়িটা কেবলি ওকে বলছিল : আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রাতের গনতির ঘণ্টা বেজে যাবে। ঠিক এই সময়টাতে পাহারাঅলা সেপাইরা ব্যারাকের চারধারে টহল দিয়ে বেড়ায়। এখন সিগারেট খেতে গেলে দালানের দিকটাতে চলে যেতে হবে। বাঙ্ক ছেড়ে এখন আর শুখভের উঠতে ইচ্ছে করছে না। ব্যারাকের মধ্যেটা এখনও তেমন গরম নয়। মাথার ওপর চালের গায় গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ। কিন্তু ঠাণ্ডাটা শুখভের এখনও তেমন অসহ্য ঠেকছে না। আরেকটু বেশী রাত হলে তখনই শুখভ হি হি করে কাঁপবে।

এইবার শুখভ তার সাত আউন্সের রেশনটা টুকরো টুকরো করে ভাঙতে লেগে গেল। কিন্তু শোনবার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও নীচে চা খেতে খেতে ৎসেজার আর ক্যাপ্টেন বুইনভস্কির কথাবার্তা তার কানে আসতে লাগল :

—না, ক্যাপ্টেন, না ! তুমি লজ্জা করে খাচ্ছ। এই মাছভাপানোটা খেয়ে দেখ। দু-এক টুকরো সসেজ খাও।

—খাচ্ছি গো, খাচ্ছি।

—আহাহা, রুটিটাতে খানিকটা মাখন লাগিয়ে নাও। এ বাবা, খাস মস্কোর রুটি।

—বলো কি, বলো কি ! আমার তো বিশ্বাসই হয় না দুনিয়ার কোথাও এমন সত্যিকার রুটি তৈরি হয়। বুঝলে, হঠাৎ এই এলাহী ব্যাপার দেখে আমার পুরনো একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি তখন ছিলাম আরখান্‌জেলসক-এ...

ব্যারাকের এ অংশে দুটো লোকের গলায় এমন গোলমাল হচ্ছে যেন মেছোহাট বসেছে। কিন্তু এত হৈচৈয়ের মধ্যেও শুখভের মনে হল যেন ঢং ঢং করে রাতের ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘণ্টার আওয়াজ আর কারো কানে যায়নি। নাকবোঁচা সেপাইটাকে শুখভ ব্যারাকে ঢুকতেও দেখল। লালমুখো বেঁটেখাটো মানুষটা। তার হাতে এমনভাবে একটা কাগজ ধরা রয়েছে এবং তার হাবভাবটাও এমন যে, শুখভ দেখেই বুঝে ফেলল—লোকটা সিগারেট খাওয়ার জন্যে কাউকে ধরতে বা রাতের গনতিতে লোকজনদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে আসেনি। ও এসেছে কাউকে নিতে।

নাকবোঁচা সেপাই কাগজটার দিকে চোখ রেখে বলল,—একশো চার কোন্‌খানে ?

বলা হল : এইখানে। এস্তোনিয়ার মানিকজোড় তাড়াতাড়ি তাদের সিগারেট লুকিয়ে ফেলে হাত দিয়ে ধোঁয়া তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

—ফোরম্যান কোথায় ?

তিউরিন বিছানার ওপর নড়বার তেমন লক্ষণ না দেখিয়ে উত্তর দিল,—এই যে।

—তোমার লোকজনদের লিখে জবাবদিহি করতে বলা হয়েছিল । করেছে ?

তিউরিন অম্লানবদনে বলল,—লিখবে ।

—লেখা তো হয়ে যাওয়া উচিত ছিল ।

—আমার দলের লোকদের পেটে বোমা মারলে ক বেরোয় না ; লেখা অত সহজ নয় । (ৎসেজার আর ক্যাপ্টেনকে ঠোকা হল। বাঃ ভাই, তিউবিন, বেড়ে বলেছ, কথায় কেউ তোমার সঙ্গে পারবে না)—কলম নেই । কালি নেই ।

—রাখা উচিত ।

—রাখতে আর দেয় কই ! নিয়ে চলে যায় ।

—দেখ, ফোরম্যান ! বেশি চ্যাটাং চ্যাটাং করে যদি কথা বলো, তোমাকেও আমি সেলে পুরব । নাকবোঁচা সেপাই তারস্বরে কথাটা বললেও খুব বেশি রেগে যায়নি । —জবাবদিহিগুলো যেন কাল সকালের মধ্যেই পৌঁছোয় । আর একটা কথা, যে-সব বেআইনী কাপড়চোপড় চেকিং ঘবে জমা দিয়েছ তার একটা লিস্টও যেন থাকে । বুঝলে !

—বুঝলাম ।

(শুখভ মনে মনে ভাবল : ক্যাপ্টেনকে নিয়েছে একহাত । কিন্তু ক্যাপ্টেনের কিছুই কানে যায়নি, বসে বসে ও দিব্যি সসেজ সাঁটছে) ।

পাহাবাদার সেপাই জিজ্ঞেস করল,—আর শোনো । তোমাদের মধ্যে শচ-৩১১ কেউ আছে ?

তা-না-না-না করে তিউবিন বলল,—লিস্টিটা দেখে বলতে হবে । আমাব ভারি দায় পডেছে অখাদ্যগুলোর নম্বর মনে করে রাখতে !

তিউরিন চাইছিল একটু সময় নিতে—আজকেব রাতটা, কিংবা অন্তত গনতির সময় পর্যন্ত বুইনভস্কিকে যাতে আড়াল করে বাখা যায় ।

—বুইনভস্কি বলে এখানে কেউ আছে ?

বলতে না বলতে ক্যাপ্টেনের সাড়া পাওয়া গেল,—হ্যাঁ, কী ? এই যে আমি । এতক্ষণ শুখভের বাঙ্কের নীচে বসেছিল বলে ক্যাপ্টেনকে দেখা যায়নি ।

হুঁ, হুঁ, চাঁদ ! এইরকমই হয় । যত চতুর তত ফতুর ।

—ও, তুমি ? হ্যাঁ, তাই তো । শচ-৩১১ । ওঠো, উঠে পডো ।

—কোথায় যাব ?

—সে তুমি ভাল করেই জানো ।

ক্যাপ্টেন শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর সেইসঙ্গে একটু গাঁইগুঁই করল । এমন সুন্দর খোশগল্পের আসর ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে বরফের মত ঠাণ্ডা নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে ! ক্যাপ্টেনের কাছে এর চেয়ে ঢের সহজ ছিল অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে নৌবহর নিয়ে শত্রুর ওপর চড়াও হওয়া ।

ক্যাপ্টেন বুইনভ্স্কি নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল,—কতদিনের মেয়াদ ?

—দশ । চলো, চলো । আর দেরি নয় ।

ঠিক সেইসময় ব্যারাকের ফালতুরা চেঁচিয়ে উঠল,—গন্‌তি হবে, গন্‌তি ! চলে এসো সব !

তার মানে, যে সেপাই গনতি করবে সে ইতিমধ্যেই ব্যারাকে এসে পড়েছে ।

ক্যাপ্টেন বুইনভস্কি চারপাশে একবার তাকাল । ও কি ওর ওভারকোটটা সঙ্গে নেবে ? নিয়ে গেলেও ওরা গা থেকে ওটা খুলে রেখে দেবে । কাজেই হরেদরে সেই একই দাঁড়াবে । সুতরাং বুইনভ্স্কি ঠিক করল যেমন আছে সেইভাবে শুধু কোট পরেই চলে যাবে । ক্যাপ্টেনের ভরসা ছিল ভল্‌কোভোই অত মনে করে রাখবে না ; কিন্তু ভলকোভোই ভোলবার পাত্রই নয় — সকলের সব কথা সে মনে করে রেখে দেয় । ক্যাপ্টেন আগে থেকে তৈরি হয়নি । এমন কি কোটের ভেতর লুকিয়ে খানিকটা তামাক নেওয়া—তাও সে করেনি । এখন আর নিয়েও কোনো লাভ নেই । গা-তল্লাসির সময় সেটা হয়ত সেপাইরাই হাতিয়ে নেবে । তা সত্ত্বেও, ক্যাপ্টেন মাথায় যখন টুপি পরে নিচ্ছিল তখন ৎসেজার তার হাতের মধ্যে গোটা দুই সিগারেট গুঁজে দিল ।

ব্রিগেডের লোকজনদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে 'আচ্ছা চলি ভাই' বলে ক্যাপ্টেন বুইনভস্কি সেপাইয়ের পেছন পেছন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ।

কয়েকজনকে সেইসময় চিৎকার করে বলতে শোনা গেল,—ঘাব্‌ড়িও না, ক্যাপ্টেন, মন শক্ত রেখো । কিন্তু কীই-বা আছে বলবার ? সেল-সাজার ঘরগুলো ১০৪নং ব্রিগেডের লোকজনেরাই বানিয়েছে । ঘরগুলো কী পদের, ওরা ভালরকমই জানে । পাথরের দেয়াল, শানবাঁধানো মেঝে, জানলার বালাই নেই ; চুল্লী একটা আছে বটে, তবে ওটা আছে শুধু দেয়ালের গায়ের বরফগুলো গলিয়ে মেঝেটা জলে ভাসাভাসি করবার জন্যে । শুতে হবে খালি তক্তায় । শীতের কাঁপুনিতে দাঁতে দাঁতে এমন ঠক ঠক করবে যে, তারপরও যদি দাঁতগুলো পড়ে না যায়—তাহলে রোজ আউন্স দশেক করে রুটি গিলতে পাবে, আর সেইসঙ্গে ষষ্ঠ আর নবম দিনে পাবে গরমাগরম সুরুয়া ।

দশ দিন । নির্জন সেই কুঠুরিটাতে গোড়া থেকে শেষ অবধি দশটা দিন যদি সমানে বসে থাকো সারাটা জীবন তোমাকে ভুগতে হবে । যদি যক্ষ্মায় ধরে, তাহলে চিরদিন হাসপাতালেই রয়ে গেলে ।

আর যেসব লোক টানা পনেরো দিন সেলে থেকেছে, তাদের সকলেরই স্থান এখন ঠাণ্ডা কনকনে মাটির তলায় ।

যতক্ষণ ব্যারাকে থাকছ, মনে করো বরাতের জোর । খাও দাও ফূর্তি করো । কোনো ব্যাপারে যেন নাক গলাতেও যেও না ।

ব্যারাকের বড় ফালতু হাঁকল,—চলে এসো সব, বাইরে চলো ! আমি এক, দুই, তিন বলব—যারা তার মধ্যে বাইরে না যাবে, আমি তাদের নাম টুকে নিয়ে সেপাইজীকে দিয়ে দেব ।

ব্যারাকের বড় ফালতু । বেটা মহা হারামী । ব্যারাকে রাত্রে ওরা আমাদেরই সঙ্গে ওকে তালা দিয়ে রাখে, তবু ওর কাজ জেলের কর্তাদের হুকুম তামিল করা—কয়েদীদের কাউকেই ও পরোয়া করে না । বরং উল্টো ওকেই সবাই ডরায় । কোনো কয়েদীকে যখন ও সেপাইদের হাতে ভজিয়ে দেয়, তখন ও নিজে হাতেই তার মুখে চড়চাপড় মারে । মারপিট করতে গিয়ে ওকে ওর হাতের একটা আঙুল খোয়াতে হয়েছিল ; সেই সুযোগেই ও পঙ্গুর দলে ভিড়ে পড়তে পেরেছে । ওর মুখ দেখলে গুণ্ডা-বদমায়েশ বলে মনে হয় । সত্যিই ও গুণ্ডা-বদমায়েশ । ওর মামলাটা ঠিক রাজনৈতিক ছিল না —ওর সাজা হয়েছিল ফৌজদারী মামলায় । অন্যান্য অভিযোগের সঙ্গে ওর বিরুদ্ধে সংবিধানের ৫৮ ধারার ১৪ উপধারা অনুযায়ী একটি রাজনৈতিক অভিযোগও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল । এই হল ওর এই ক্যাম্পে আসার ইতিহাস ।

ওর কাছে এসব জলভাত—ও তোমার নম্বর টুকে নিয়ে পাহারাঅলা সেপাইয়ের হাতে গছিয়ে দেবে আর তারপরই তোমার দু' রোজ সেল-সাজা, সেইসঙ্গে বাইরে কাজ ।

কয়েদীরা সব গয়ংগচ্ছ ভাব নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিল, কিন্তু যেই বড ফালতু গলা বার করেছে অমনি শুরু হয়ে গেল হৈ-হল্লা—বাইরে যাবার জন্যে সবাই ভিড করে এ ওকে ঠেলতে লাগল । যাবা বাঙ্কে মটকার ওপর চড়ে বসেছিল, তারা হনুমানের মত হুপ্ হাপ্ করে লাফিয়ে পড়ে সরু দরজা দিয়ে সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে পডবার চেষ্টা করল ।

শুখভ অনেকক্ষণ ধরে ঠিক করে রেখেছিল আরাম করে এবার একটা সিগারেট ধরাবে । কিন্তু তার আর মওকা পেল না । হাতের চেটোয় পাকানো সিগারেটটা নিয়ে তড়াক করে লাফ মেরে শুখভ নীচেয় নামল । তারপর ফেল্টের বুটের মধ্যে পা গলিয়ে দিয়ে শুখভ রওনা হবে—এমন সময় ৎসেজাবের ওপর ওর কেন যেন খুব মায়া হল । ৎসেজারের কাছ থেকে কিছু বাগাবার মতলবে নয়—সত্যিকার অন্তর থেকেই ৎসেজারের কথা ভেবেই শুখভের দুঃখ হচ্ছিল । ও নিজেকে খুব একটা কেষ্টবিষ্টু ঠাওরায় ; কিন্তু জীবন সম্বন্ধে ওর বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা নেই । পার্সেলের ব্যাপারটাই ধরো না কেন —তুই বাপু পার্সেল পেলি ; পার্সেল পেয়ে গনতির আগে কোথায় চটপট চেকিং-ঘবে রেখে আসবি—তা-নয়, ঐ নিয়ে আদেখলেপনা শুরু করে দিলি । খাওয়ার জন্যে খানিকটা সরিয়ে রেখে দিলেও তো পারতিস । পার্সেল নিয়ে এখন তো ৎসেজারের উভয়সঙ্কট । গনতির জাযগায় যদি থলেসুদ্ধ নিয়ে হাজির হয়, ক্যাম্পের লোকে ওর গায়ে গু দেবে । পাঁচশো লোক একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠবে । আর যদি ব্যারাকে ফেলে রেখে যায়, ছুটে এসে যে প্রথমে ঘরে ঢুকবে সেই সব মেরে দিয়ে বসে থাকবে ।

শুখভের মনে পড়ে গেল উস্‌ৎ-ইঝ্‌মায় ছিল এর চেয়ে আরও এক কাঠি সরেস অবস্থা । কাজ থেকে ফেরবার সময় দেখা যেত গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরা সকলের আগে পাঁই পাঁই করে ব্যারাকে ছুটে যাচ্ছে ; বাদবাকি লোকেরা ব্যারাকে পৌঁছে দেখত দেরাজগুলো সব সাফ ।

শুখভ দেখতে পেল ৎসেজার তার জিনিসপত্তরগুলো হুটপাট করে এখানে সেখানে গুঁজে গুঁজে রাখছে। কিন্তু সব লুকিয়ে রাখবারও এখন সময় নেই। সসেজ আর মাংসের দলাটা ৎসেজার কোটের তলায় কোঁচড়ের মধ্যে পুরে নিল। গুনতির সময় ও-দুটো নিজের কাছে রাখবে। আর কিছু না হোক, অন্তত গোটা দুয়েক জিনিসও তো তাতে বাঁচবে।

ৎসেজারের ওপর করুণা হওয়ায় শুখভ তাকে কতকগুলো বুদ্ধিপরামর্শ দিল, —তুমি এই ছায়া-ছায়া জায়গাটায় বসে থাকো, ৎসেজার মারকোভিচ। ঘর খালি করে সকলে আগে চলে যাক। সেপাই আর ফালতুর দল যখন এসে ঘরের আনাচ-কানাচগুলো ঢুঁড়তে আরম্ভ করবে, তখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। এমন ভাব করবে যেন তোমার খুব অসুখ করেছে। আর আমি করব কি, সকলের আগে বেরিয়ে গিয়ে সকলের আগে ফিরে আসব।

—তাহলে আর..., বলেই শুখভ ছুট দিল।

শুখভ তার পাকানো সিগারেটটা মুঠোর মধ্যে সাবধানে ধরে গুঁতোগুঁতি করে সামনে এগিয়ে গেল। ব্যারাকের দুদিককার লোকেরই ভাগে যে দালানটা পড়ে, সেই দালান আর দরজাগুলোতে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা কেউই বাইরে পা বাড়াচ্ছে না। কয়েদীরা সব জানোয়ারের মত ধড়িবাজ। দুজন দুজন হয়ে দুপাশের দেয়ালে ওরা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মাঝখান দিয়ে খানিকটা রাস্তা ফাঁকা রয়েছে—মেরে কেটে একজন যেতে পারে। তেমন উজবুক যদি কেউ থাকে তো সে এই ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে যাবে—আমাদের কথা যদি বলো, আমরা এই গ্যাঁট হয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এমনিতেই সারাটা দিন আমাদের ঠাণ্ডার মধ্যে কাটাতে হয়, উপরন্তু আরও দশ মিনিট কেন আর আমরা ঠাণ্ডায় জমে যাই ? উঁহু, আমরা অত বোকা নই। আজই না মরলে যাদের চলছে না, তারা মরুকগে যাক—কালকেব দিনটা না দেখে আমবা মরতে চাই না।

অন্য অন্য দিন হলে শুখভও ঐ দেয়ালের গায়েই নিজেকে সেঁটে রাখত। কিন্তু আজ তার অন্যথা হল। লম্বা লম্বা পা ফেলে সকলের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গিয়ে শুখভ বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে ফেলল,—অত কিসের ভয়, বাছা ? সাইবেরিয়াব ঠাণ্ডা কি বাপের জম্মে দেখনি ? যাও, বেরিয়ে পড়ো ! আকাশে নেকড়ের অংশুমালী রয়েছে, যাও—গা-টা একটু তাতিয়ে নাও। এই যে দাদা, একটু আগুন হবে ?

দরজার মুখে এসে সিগারেটে একটা টান মেরে শুখভ বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। শুখভদের দেশে চাঁদকে লোকে ঠাট্টা করে বলে 'নেকড়ের অংশুমালী'।

অনেকখানি ওপরে উঠেছে চাঁদ। আরেকটু উঠলেই চাঁদ সর্বোচ্চবিন্দুতে আরোহণ করবে। শ্বেতশুভ্র আকাশের গায়ে সবুজের ছিটে : উজ্জ্বল তারাগুলো দূরে দূরে ছড়ানো ছিটোনো : ঝলমল ঝলমল কবছে ধবধবে বরফ। ব্যারাকের দেয়ালগুলোও এত সাদা যে, এখন বাতিগুলো থাকা না থাকা সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওপাশের একটা ব্যারাকের বাইবে একরাশ কালো কালো মাথা—কয়েদীরা ঘর ছেড়ে

বাইরে এসে লাইন বেঁধে দাঁড়াচ্ছে । ওধারে আরও একটা দল । ব্যারাকে ব্যারাকে কলগুঞ্জনের চেয়েও ঢের বেশী জোরালো হয়ে উঠেছে পায়ের নীচে কচর মচব করে বরফ ভাঙার শব্দ ।

পাঁচজন লোক সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গিয়ে দবজার দিকে মুখ কবে দাঁড়াল । তাদের পেছন পেছন আরও তিনজন এল । শুখভ দ্বিতীয় সারির তিনজনের পাশে এসে দাঁড়াল । বাড়তি রুটির টুকরোটা সাঁটা হয়েছে, ঠোঁটে সিগারেট রয়েছে, এখন লাইনে এসে দাঁড়ানো যেতে পারে । তামাকটা খাসা । লাৎভিয়ার লোকটি দেখছি ঠকায়নি —খেতে যেমন কড়া, গন্ধও তেমনি ঝাঁঝালো ।

অন্যবা গুটি গুটি কবে এসে পেছনে দাঁড়িয়ে গেল । খানিক পরেই দেখা গেল, শুখভের পেছনে পাঁচজন পাঁচজন করে দুটো তিনটে লাইন দাঁড়িয়ে গেছে । যাবা ব্যারাকেব বাইরে এসে দাঁড়িযেছে তার এবার ব্যারাকের ভেতবে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদেব ওপব ক্ষেপে গেল । বেল্লিকগুলো কেন দালানে ভিড কবে আছে ? বাইবে বেরিয়ে আসছে না কেন ? ও শালাদের জন্যে আমরা যে ঠাণ্ডায় মরছি ।

কযেদীরা কেউই কখনও হাতঘড়ি বা দেয়ালঘড়ি দেখে না । দেখেই বা কী ঘোড়ার ডিম হবে ? কযেদীদের তো শুধু জানার দরকার : ভোরের ঘন্টা কতক্ষণে বাজবে ? ফাইলে দাঁড়াতে আর কত দেরি ? কখন খেতে দেবে ? রাত্তিরে গনতি হবে ক'টায় ?

অথচ তা সত্ত্বেও বলা হয়ে থাকে, রাত্তিরে গনতি কবা হয় ন'টায় । ন'টায কখনই শেষ হয় না । অনেক সময় দুবার করে, কখনও কখনও তিনবার করেও গনতি হয । কয়েদীবা কোনোদিনই দশটাব আগে শুতে যেতে পারে না । ঘন্টা বাজিয়ে ডেকে তোলা হয় ভোর পাঁচটায়, মোলদাভিয়ার লোকটিব কাজ করতে কবতে ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই । কয়েদীরা যেখানেই একটু গরম জায়গা পাবে, সেখানেই তক্ষুণি তক্ষুণি ঘুমে ঢুলে পড়বে । সারা সপ্তাহে এত ঘুম জমে থাকে যে ববিবাব দিন সারা ব্যারাক দিনভর শুধু ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়—অবশ্য সে ববিবারে যদি কাজে বেরোতে না হয় ।

বাছাধনেরা এবার সুড় সুড় কবে বাইরে বেবিযে আসছে । ব্যারাকের বড় ফালতু আর পাহারাঅলা সেপাই হুড়ো দিয়েছে ; গুঁতো খেয়ে বাবান্দার ওপর থেকে সব এখন টপাটপ নামছে । যেমনি সব গাড়োল, তার তেমনি—বেশ হয়েছে । য্যায়সা কি ত্যায়সা ।

যারা সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছে, তাবা দেরি-করে-আসা লোকগুলোকে চেঁচিযে চেঁচিয়ে বলতে লাগল,—বড ওস্তাদ হয়েছ, না ? আমরা আঙুল চুষব আর তোমবা ক্ষীরসর খাবে । তাই না ? আগে আগে তোমবা যদি বেরিয়ে আসতে—গনতির কাজ কখন চুকে যেতে পারত ।

সব কটা ব্যারাক খালি করে লোক বেরিয়ে এসে বাইরে জমায়েত হয়েছে । ব্যারাকে লোক আছে মোট চারশো ; আশী জন করে লোক নিয়ে পাঁচ-পাঁচটি গ্রুপ । পেছনে পেছনে সব দাঁড়িয়ে গেছে । গোড়ার দিকে যারা, তারা সব দাঁড়িয়েছে পাঁচজন পাঁচজন

করে—পরের দিকে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে ।

ব্যারাকের বড় ফাল্‌তু হেঁকে বলল,—পেছনের লোকেরা পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়াও ।

খান্‌কির বাচ্চারা কিছুতেই আলাদা আলাদা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না ।

ৎসেজার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল । কুঁকড়ে-মুকড়ে কাঁপতে কাঁপতে এমনভাবে আসছে যেন ওর অসুখ করেছে । ব্যারাকের এদিকের দুজন ফাল্‌তু, ওদিকের দুজন ফাল্‌তু আর একজন পঙ্গু লোকও বেরিয়ে এল । ওরা পাঁচজন সকলের আগে লাইন করে দাঁড়াল—ফলে, শুখভের লাইনটা হয়ে গেল তৃতীয় । ৎসেজারকে খেদিয়ে একেবারে সকলের শেষে পাঠিয়ে দেওয়া হল ।

পাহারাঅলা সেপাই বারান্দায় বেরিয়ে এল ।

লাইনের শেষদিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দিকে তাকিয়ে সে হেঁকে বলল,—পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়াও । লোকটার গলার জোর আছে ।

ব্যারাকের বড় ফাল্‌তু চেঁচাল,—পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়াও । এর গলা ওর চেয়েও বাজখাঁই ।

শালার বেটা শালারা এখনও ঠিক হয়ে দাঁড়াল না ।

ব্যারাকের বড় ফাল্‌তু বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে পেছনের লোকগুলোর দিকে তেড়ে গেল । বাপ-মা তুলে গাল দিতে দিতে লোকগুলোর পাছায় লাথি মারতে লাগল ।

কিন্তু লোক বুঝে ও লাথি মারছিল । মারছিল তাদেরই, যারা মুখ বুঁজে লাথি হজম করবে ।

এইবার সব লাইন বেঁধে আলাদা আলাদা হয়ে দাঁড়াল । বড় ফাল্‌তু নিজের জায়গায় ফিরে এল । তারপর সেপাইয়ের গলায় গলা মিলিয়ে হাঁকতে লাগল,—রাম ! দুই ! তিন !

পাঁচ গোনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পাঁচজন লাইন ভেঙে দিয়ে চোঁ-চাঁ ব্যারাকের দিকে ছুট মারছিল । ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ওদের সমস্ত কাজকারবার আজকের মত এখানেই চুকে বুকে গেল ।

চুকে অবশ্য গেল, যদি আবার ফিরে গুনতে না হয় । এইসব মাথামোটা লোকগুলো ভাল করে গুনতেও পারে না । যে গরু চরায় সেও এদের চেয়ে ভাল গোনে । লিখতে-পড়তে না জানুক, যখন সে গরু চরায়—গরুটরু হারালে ঠিক বুঝতে পারে । কিন্তু পরের মাথায়-কাঁঠাল-ভাঙা এই লোকগুলো—এদের এতসব তালিম-টালিম দিয়েই বা কী হচ্ছে ?

গতবার শীতের সময় ক্যাম্পে জুতো শুকোবার আলাদা কোনো ব্যবস্থা ছিল না : রাত্তিরে ঘরের মধ্যেই সবাইকে জুতো খুলে রাখতে হত । কাজেই ফিরে গুনবার দরকার হলে দুবার, তিনবার, চারবার করে তাদের ঘরের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হত । শেষে তারা করত কি, ভাল করে জামাকাপড়ও পরত না—কোনোরকমে ভালেঙ্কিটা পায়ে

গলিয়ে নিয়ে গায়ে কম্বল জড়িয়ে সটান বাইরে চলে যেত । এ বছর শুকোবার জায়গা তৈরি হয়েছে ; তাই বলে সব জুতো একসঙ্গে দেওয়া যায় না । প্রত্যেক ব্রিগেডের ভালেঙ্কি শুকোতে দেওয়ার পালা পড়ে দুদিন ছেড়ে একদিন । কাজেই এখন নতুন নিয়ম হয়েছে, দ্বিতীয়বার গুনতে হলে ব্যারাকের ভেতর গুনতে হবে । সেক্ষেত্রে কয়েদীদের সার বেঁধে এ-অংশ থেকে ও-অংশে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ।

শুখভ দৌড়ে ভেতরে চলে গেল । ঘরে যদিও সে ঠিক সকলের আগে ঢোকেনি, তাহলেও যারা গোড়ায় এসেছে তাদের চোখের আড়াল না করে পায়ে পায়ে এসে পৌঁচেছে । দৌড়ে ৎসেজারের বাঙ্কে গিয়ে শুখভ তার বিছানায় বসে পড়ল । তারপর পা থেকে ভালেঙ্কিটা খসিয়ে নিয়ে চুল্লীর কাছের বাঙ্কটাতে চড়ে পডে চুল্লীর ওপর তার ভালেঙ্কিটা চাপিয়ে দিল । কে আগে চুল্লীর ওপর ভালেঙ্কি রাখতে পারে এই নিয়ে রোজই সকলের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়ে । শুখভ আবার ফিরে এসে ৎসেজাবেব বিছানায় বসে পড়ল । বসল বেশ গ্যাঁট হয়ে, হাঁটুদুটো মুড়ে ; একটা চোখে সে ৎসেজারের থলেটার দিকে নজর রাখল, কেউ যাতে বিছানার মাথার দিক থেকে টেনে নিতে না পারে ; আরেকটা চোখে সে নজর রাখল ভিড়ের মধ্যে কেউ যেন তার ভালেঙ্কিজোড়া চুল্লীর ওপর থেকে সরিয়ে না দেয় ।

শুখভকে গলা বার করতে হল,—ওহে, ও মাকালফল । বলি, তোমার দন্তকৌমুদিতে জুতো মারব সেটা কি ভাল হবে ? নিজেরটা সরিয়ে নিয়ে আমারটা যেখানে আছে রেখে দাও বলছি ।

কয়েদীরা স্রোতের মত হুড়হুড় করে ব্যারাকে ঢুকছে ।

২০ নম্বরের ছোকরাগুলো চেঁচিয়ে বলছে,—ভালেঙ্কিগুলো দিয়ে দাও ।

এরপর ওদের ভালেঙ্কিগুলো নিয়ে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে । ব্যারাকে তালাচাবি পড়বে । তারপর ছোকরাগুলো ফিরে আসবে, এসে বলবে—সেপাইজী আমরা ভেতরে যাব ।

সেপাইরা কোতোয়ালী ব্যারাকে এক জায়গায় হয়ে আঁকজোকগুলো নিয়ে হিসেব মেলাতে বসবে : দেখবে কেউ পালিয়েছে কিনা, নাকি লোকজন সব ঠিকঠাকই আছে !

যাকগে, আজ আর ওসব নিয়ে শুখভ মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না । দুপাশারি বাঙ্কের মাঝখান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এল ৎসেজার ।

—ধন্যবাদ, ইভান দেনিসিচ ।

শুখভ তার উত্তরে মাথাটা একটু নেড়ে কাঠবেডালির মত তরতর তরতর করে নিজের বাঙ্কে গিয়ে উঠে বসল ।

এবার ও ছ-আউন্সের টুকরোটা খেয়ে ফেলতে পারে । তারপর দ্বিতীয় আরেকটা সিগারেট । তারপর ঘুম ।

আজকের দিনটা শুখভের এত ভাল গেছে যে ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না এই যা ।

বিছানা করাটা শুখভের কাছে কোনো সমস্যাই নয় । তোশকের ওপর থেকে কালো

কম্বলটা টেনে নাও । তারপর তোশকের ওপর লম্বা হও । (১৯৪১ সালে বাড়ি ছেড়ে আসার পর থেকে শুখভ কখনও আর বিছানায় চাদর পেতে শোয়নি । বরং এখন তো ও ভেবেই পায় না মেয়েদের কেন বিছানার চাদর নিয়ে অত মাথাব্যথা, কাচাকাচির বাড়তি হাঙ্গামার মধ্যে যাওয়াই বা কেন !) । কাঠকুচোঠাসা বালিশে শুখভের মাথা । পা দুটো কোটেব মধ্যে গোঁজা । কম্বলেব ওপর ওভারকোট চড়ানো । হে প্রভু, তোমার অশেষ দয়া—আরও একটা দিন পার করে দিলে ।

প্রভু, তোমারই দয়ায় তাকে আজ নির্জন কুঠুরিতে শুতে হয়নি । এখানে এই ব্যারাকে যো-সো করে সে চালিয়ে নেবে ।

শুখভ জানলার দিকে মাথা করে শুয়েছে । শুখভের ঠিক ওপাশে ওপরেব আরেকটা বাঙ্কে শুয়েছে আলিওশা । ঝোলানো বাতিটা থেকে আলো পাবার জন্যে আলিওশা একটু হেলে রয়েছে । এবেলাও সে বাইবেলই পড়ছে ।

ইলেকট্রিক আলোটা ওদের দুজনের কাছ থেকেই খুব দূরে নয় । সে আলোয় পড়াও যায়, সেলাইও করা যায় ।

শুখভকে জোরে জোরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে শুনল আলিওশা । শুনে তার দিকে ফিরল,—এই তো, ইভান দেনিসোভিচ—তোমার প্রাণ আকুলিবিকুলি করছে ভগবানেব কাছে প্রার্থনা জানাবাব জন্যে । কেন তুমি নিজের মনটাকে বেঁধে রাখছ ?

শুখভ আড়চোখে আলিওশার দিকে তাকাল । পাদ্রী আলিওশার চোখদুটো যেন একজোড়া মোমবাতির মত জ্বল জ্বল করছে । শুখভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুখভ বলল,—কেন জানো, আলিওশা ? ঐ প্রার্থনার দশা হয় ঠিক আমাদের আবেদনপত্রগুলোব মত—হয় ওগুলো যেখানে যাবাব সেখানে পৌঁছোয়ই না, নয় পিঠের ওপর 'নামঞ্জুর' ছাপ নিয়ে ফিরে আসে ।

কোতোয়ালী ব্যারাকের সামনে দরখাস্ত দেবার জন্যে চারটে সীলমোহব-করা বাক্স আছে । মাসে একবার কবে বিশেষ একজন অফিসার এসে বাক্স থেকে আবেদনপত্রগুলো খালাস করে নিয়ে যায় । এতদিন কম কয়েদী ওর মধ্যে আবেদনপত্র ফেলেনি । তারা মাসের পর মাস আশায় আশায় থেকেছে—আর দুটো মাস, আর একটা মাস পরেই তাদের কাছে উত্তর এসে যাবে ।

কিন্তু উত্তর আর আসে না । অথবা আসে : 'আবেদন নামঞ্জুর' ।

—তার কারণ, ইভান দেনিসিচ—তুমি খুব কমই ভগবানের নাম করো ; যেটুকু করো, তাও করো খুব দায়সারাভাবে, নম-নম করে । সেইজন্যেই তোমার প্রার্থনায় ফল হয়নি । নিরন্তর প্রার্থনা করে যেতে হবে । তোমাব মধ্যে যদি সত্যিকাব বিশ্বাস থাকে, সেই বিশ্বাসেব জোরে যদি তুমি পাহাড়কে বলো 'পাহাড় চলো' !—পাহাড় চলবে ।

শুখভ হো হো করে হেসে উঠে আরেকটা সিগারেট পাকাল । তারপর এস্তোনিয়ার লোকটির কাছ থেকে আগুন চেয়ে নিয়ে ধরাল ।

—বাজে কথা ছাড়ো, আলিওশা । পাহাড় কখনও চলে, এ আমি বাপের জন্মে

দেখিনি। দেখ, সত্যি বলতে কি—জন্মে কখনও আমি পাহাড়ই দেখিনি। ককেশাসে তুমি তো পাদ্রীদের দলবল নিয়ে থাকতে। কোনো একটা পাহাড়কেও কি চলতে দেখেছ?

পাদ্রীগুলো সত্যিই খুব অভাগা। ওরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। তাতে কার কী ক্ষতি হয়েছে? তবু ওদের গোটা দলটাকে ধবে পঁচিশ বছর ঠুকে দেওয়া হল। তার কারণ, এখানকার সময়টাই হল এই। সবকিছুরই এক মাপ—পঁচিশ বছর।

আলিওশা ওকে তবু ছাড়বে না—বোঝাবেই,—আমরা তো, দেনিসিচ, সে প্রার্থনা জানাইনি। বলে আলিওশা কাছে সরে এসে শুখভের মুখোমুখী হল।—ঈশ্বর চাইলেন সমস্ত পার্থিব এবং সমস্ত নশ্বর জিনিসের মধ্যে আমরা যেন শুধু রোজকার রুটির জন্যে প্রার্থনা জানাই, আজ আমাদের দাও রোজকার রুটি।

শুখভ প্রশ্ন করল,—তার মানে, দৈনিক রেশন?

কিন্তু আলিওশা হাল ছাড়ল না। কথার চেয়েও সে ঢের বেশী বলছিল চোখ দিয়ে। শুখভের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সে চাপড়াতে লাগল।

—ইভান দেনিসিচ! একটা পার্সেল কিংবা বাড়তি এক বাটি সুরুয়া—এর জন্যে প্রার্থনা জানানো ঠিক নয়। লোকে যে জিনিসকে মূল্যবান মনে করে, ঈশ্বরের চোখে সে জিনিস ঠুনকো। ঈশ্বরের কাছ থেকে তুমি চাইবে আধ্যাত্মিক জিনিস; বলবে, —হে প্রভু, আমার অন্তরেব সমস্ত কুভাব দূর করো।...

—শোনো, আমার কথা শোনো। পোলোমনিয়ায় আমাদের গীর্জায় এক পাদ্রী আছে...

আলিওশা ব্যথায় ভ্রূ কুঞ্চিত করে ব্যগ্রতার সঙ্গে বলল,—তোমাদের পাদ্রীর বিষয়ে আমার সামনে বলো না।

শুখভ কনুইযের ওপর ভর দিয়ে উঠে বলল,—আরে, শোনোই না। গীর্জার অধীনে আমাদের যে গ্রামগুলো, সেখানে ঐ পাদ্রীই হল সবচেয়ে রেস্তঅলা লোক। ওখানে ঘরামির কাজে এমনিতে আমাদের রোজ হল পঁয়ত্রিশ রুবল—কিন্তু পাদ্রীর কাছে আমরা দব হাঁকি একশো রুবল করে। ও তক্ষুনি দিয়ে দেয়; কখনই কোনোরকম ওজর আপত্তি করে না। তিন তিনটে শহরে ওর তিন তিনটে মেয়েমানুষ আছে—তাদের ও খোরপোষ দেয়। আর চতুর্থ একজনের সঙ্গে এখন ঘর করছে। ওর বিশপের কথা কী বলব, তাকে ও ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। সবসময় তেলাচ্ছে। আমাদের শহরে অন্য যত পাদ্রীই আসুক, কাউকে ও তিষ্ঠোতে দেয় না। কেউ ওর কাছ থেকে কোনো জিনিসের এক আধলাও ভাগ পায় না...

—আমাকে পাদ্রীদের কথা শুনিয়ে কী লাভ? সনাতন গীর্জাগুলো ধর্মের পথ থেকে সরে গেছে। সেইজন্যেই সরকার ওদের ধরে না। কারণ, ওদের মধ্যে সেই অটল বিশ্বাস আর নেই।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আলিওশার মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে শুখভ বলল,—আলিওশা।

দেখ, আমি ঈশ্বরবিরোধী নই। আমি মনেপ্রাণেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। আমার শুধু বিশ্বাস নেই স্বর্গ আর নরকে। কেন তোমরা স্বর্গ আর নরকের গল্পগুলো আমাদের দিয়ে গিলিয়ে নিতে চাও—আমরা কি অতই বোকা ? এই জিনিসটাই আমার বরদাস্ত হয় না।

শুখভ চিৎ হয়ে শুয়ে মাথার ওপর দিয়ে বাক্স আর জানলার ফাঁক গলিয়ে সাবধানে ছাই ফেলল—যাতে ক্যাপ্টেনের জিনিসপত্রগুলো পুড়ে না যায়। শুখভ ভাবতে ভাবতে এমন তম্ময় হয়ে গেল যে, আলিওশা বিড়বিড় করে কী বলছিল শুনতে পেল না।

আলোচনাটা চুকিয়ে ফেলার জন্যে শুখভ বলল,—মোদ্দা কথা, যতই তুমি ভগবানের নাম করো—তোমার সাজার মেয়াদ কমছে না। প্রথম থেকে শেষ অবধি তোমাকে ঘট হয়ে বসে থাকতে হবে।

আলিওশা আতঙ্কের সঙ্গে বলে উঠল,—না, না, না। তুমি প্রার্থনা করবে সে ভেবেও নয়। কেন তুমি জেলের বাইরে যেতে চাও ? বাইরে গেলে তোমার বিশ্বাসের শেষ কণাটুকুরও দম বন্ধ হয়ে আসবে। তোমার ভাগ্য ভাল যে, তুমি কয়েদখানায় আছ। এখানে থাকায় তুমি আত্মচিন্তা করার সময় পাচ্ছ। প্রভুপাদ পল কী বলেছিলেন ? বলেছিলেন—এ কী করছ তুমি ? কেঁদে কেঁদে আমার বুক ভেঙে দিতে চাইছ কেন ? আমি তো প্রভু যীশুখৃষ্টের নামের জন্যে শুধু কয়েদ খাটা কেন, প্রাণবলি দিতেও রাজী।

শুখভ কোনো কথা না বলে মাথার ওপর চালটার দিকে তাকাল। বাইরে যাবার ইচ্ছেটা এখন আর তার মধ্যে বেঁচে আছে কিনা সে জানে না। গোড়ায় গোড়ায় তার প্রবল ইচ্ছে হত খালাস পেয়ে বাইরে যাবার। রাতের পর রাত সমানে সে গুনে যেত কতদিন কাবার হল, কতদিন থাকল। গুনতে গুনতে একদিন তার মনের মধ্যে ঘাঁটা পড়ে এল।

সেই সময় তার কাছে এটা পরিষ্কার হল যে, শুখভের মত লোকদের কখনই আর বাড়িতে ফিরে যেতে দেবে না। ওদের ঠেলে পাঠাবে কালাপানিতে। এখানে, না কালাপানিতে—থেকে সুখ কোথায় বেশী শুখভ সেটা জানে না।

একটামাত্র কারণেই শুখভের খালাস পাওয়ার এত ইচ্ছে—শুখভ চায় বাড়ি যেতে।

কিন্তু বাড়িতে ওরা মানুষকে ফিরে যেতে দেয় না।

আলিওশা মিছে কথা বলেনি, ওর গলার স্বর, ওর চোখের চাহনি বলে দিচ্ছে কয়েদখানায় ও সত্যিই সুখে আছে।

শুখভ এইভাবে তাকে খোলসা করে বলল,—দেখ, আলিওশা—কথাটা তোমার ক্ষেত্রে উঠছে না। এর সঙ্গে যে করেই হোক নিজেকে তুমি মানিয়ে নিয়েছ। তোমার যীশুখৃষ্ট চেয়েছেন তুমি জেলখানায় যাও, তাঁর কথা শিরোধার্য করে তুমি জেলখানায় আছ। কিন্তু আমি আছি কিসের জন্যে ? ১৯৪১ সালে যুদ্ধের জন্যে দেশ তৈরি ছিল না। সেইজন্যে ? কিন্তু সে দোষ কি আমার ?

কিল্‌গাস বিছানায় শুয়ে বিড়ির বিড়ির করে বলল,—আজ আর ফিরে গুনবে বলে মনে হচ্ছে না।

উত্তরে শুখভ বলল,—তাইতো হে ! চিমনির গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে লিখে রাখলে হয়—আজ দুবার গনতি নেই । তারপর হাই তুলল,—এ্যাকি, ঘুম-ঘুম পাচ্ছে যে !

গোটা ব্যারাক চুপচাপ শান্ত । হঠাৎ সেই মুহূর্তে ঘবের শান্তিভঙ্গ করে বাইরের দরজায় ঘটাং-ঘট ঘটাং-ঘট করে খিল খোলার আওয়াজ শোনা গেল । যে দুজন ছোকবা ভালেঙ্কি নিয়ে গিয়েছিল শুকোতে দেবার জন্যে, তারা দালানের ওদিক থেকে ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে বলল,—ফিরে গনতি হবে ।

তখন তখনি ওদের পেছন পেছন একজন সেপাই এসে পড়ল,—যাও সব, ওদিকটাতে চলে যাও ।

কিছু কিছু লোক ঘুমিয়ে পড়েছিল । গাঁইগুঁই কবে আড়ামোড়া ভেঙে তারা ভালেঙ্কির ভেতর পা গলিয়ে দিতে লাগল । রাত্তিরে কেউই তুলো-ভরা পাজামাগুলো খুলে রেখে শোয়নি । কম্বলের নীচে ওগুলো পরা না থাকলে ঠাণ্ডায় জমে যেতে হবে ।

শুখভ মুখ খারাপ করে বলে উঠল,—শালাদের ভুষ্যিনাশ কবো । শুখভের খুব একটা রাগ হল না ; তার কারণ, ও তখনও ঘুমিয়ে পড়েনি ।

ৎসেজার হাত বাড়িয়ে শুখভকে দুটো লেড়ো বিস্কুট, দুটো চিনির মিঠাই আর গোল একফালি সসেজ দিল ।

শুখভ বাঙ্কের ধারে ঝুঁকে পড়ে বলল,—বেঁচে থাকো, ৎসেজার মার্কোভিচ ! দেখি, তোমাব থলেটা দাও ! বিছানার মাথার নীচে বেখে দিই । বলা যায় না ! যেতে যেতে কেই ওপরের বাঙ্ক থেকে জিনিস টেনে নিতে পারে না । তাছাড়া চুরি করবার জন্যে কেউ বা আর শুখভের বাঙ্কে হাত দিতে যাবে ?

ৎসেজার তার বাঁধাছাঁদা সাদা থলেটা শুখভের হাতে তুলে দিল । শুখভ সেটা তোশকের নীচে চাপা দিয়ে রেখে দিল । আরও কিছু লোকজনকে ওপাশে ঠেলে না পাঠানো পর্যন্ত শুখভ অপেক্ষা করে থাকল । যাতে তাকে মেঝের ওপব খুব বেশীক্ষণ খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয় । কিন্তু পাহারাঅলা সেপাই তাকে দেখে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল,—এইও, কোণে বসে কেন ? চলে এসো ।

কাজেই শুখভকে মেঝেব ওপর খালি পায়ে আলগোছে লাফিয়ে নেমে পড়তে হল । ওব ভালেঙ্কি আর পায়ের পটিগুলো এত সুন্দরভাবে চুল্লীর ওপর বসানো আছে যে, ওগুলো ওখান থেকে সরিয়ে আনতে ওর আর ইচ্ছে করল না । অন্যদের কত চটি যে শুখভ বানিয়ে দিয়েছে, কিন্তু একজোড়াও নিজের জন্যে রাখেনি । যাই বলো, এসব ঠাণ্ডা তার গা-সওয়া—তাছাড়া বেশীক্ষণ তো থাকতেও হচ্ছে না ।

চটি থেকেই বা কী লাভ ? দিনের বেলায় খানাতল্লাসির সময় ওরা যদি চটি পায়, সে চটি বগলদাবা করে নিয়ে যাবে ।

যেসব ব্রিগেডের ভালেঙ্কিগুলো আজ শুকোতে গেছে, তার মধ্যে যাদের চটি আছে তাদের কথা আলাদা—কিন্তু বাদবাকি সবাইকেই হয় পায়ে পটি বেঁধে, নয় খালি পায়ে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে ।

পাহারাঅলা সেপাই গজর গজর করতে লাগল,—চলে এসো, চলে এসো ।

ব্যারাকের বড় ফালতুও তাতে ফোড়ন দিল,—মার না খেলে কথা কানে যাবে না, না রে মড়াখেকো ?

এদিককার সবাইকে ঠেলে ওদিকে পাঠানো হল । যারা দেরিতে এল তাদের গিয়ে দাঁড়াতে হল দালানে । পেচ্ছাপের টুকরির ঠিক পাশেই পার্টিশানের ধার ঘেঁষে শুখভ দাঁড়িয়েছে । তাব পায়ের নীচে মেঝেটা ভিজে ভিজে । দরজার নীচ দিয়ে ঝিরঝির করে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে ।

ঘরের এদিককার সবাইকে বার করে দেওয়ার পর পাহারাঅলা সেপাই আর ব্যারাকের বড় ফালতু আবেকবার দেখে আসতে গেছে কেউ কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে কিংবা ঘুপচির মধ্যে ঘুমিয়ে আছে কিনা । কারণ, গুনতে গিয়ে যদি কম পড়ে তাহলে চিত্তির । আর গুনতে গিয়ে যদি বেড়ে যায় তাহলেও চিত্তির । কম পড়লে বা বেশী হলে আবার ফিরে গুনতে হবে । ব্যারাকের ফাঁকা দিকটাতে বার বার দুবার ঘুরে আসার পর ওরা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ।

—রাম, দুই, তিন, চার... । এবার যে যার জায়গায় ফিরে যাবার জন্যে জলদি জলদি করে লোক ছাড়া হতে লাগল । শুখভ কায়দা করে সতেরো জনের ঠিক পরেই ছাড়া পেয়ে গেল । তাবপর ছুটে চলে গেল নিজের বাঙ্কে । পা রাখার একটু জায়গা করে নিয়ে হু—শ করে সোজা ওপরে উঠে গেল ।

সব ঠিক হ্যায় । পা দুটো কোটের হাতার ভেতর ; গায়েব ওপর কম্বল ; কম্বলের ওপর ওভারকোট । ব্যস, ঘুমোও । ওরা এবার ওদিককার লোকদের ঠেলে আমাদের এদিকে পাঠাবে । তাতে আমাদের তো ভাবি বয়েই গেল ।

ৎসেজার ফিরে এল । শুখভ তাকে তার থলেটা ফেরত দিল ।

আলিওশা ফিরল । লোকটা একেবারেই করিৎকর্মা নয় । সবসময় পরের উপকার কবে বেড়াবে । নিজের বোজগারের বেলায় টুঁ টুঁ ।

—এই যে, আলিওশা— বলে ডেকে শুখভ ওকে একটা লেড়ো বিস্কুট দিল ।

আলিওশা হাসল ।

—দাও ভাই । কিন্তু তোমার যে কিছু থাকল না !

—আরে, খেয়ে নাও ।

আমাদের কিছু থাকে না । আমরা তাই কিছু না কিছু সবসময় উপায় করি ।

শুখভ ছোট একটুকরো সসেজ গালে ফেলে দিল । চাকম চাকম করে খাচ্ছে শুখভ । চাকম চাকম । মাংসের স্বাদ । মাংসের সত্যিকার রস । চুঁইয়ে চুঁইয়ে পেটের মধ্যে যাচ্ছে ।

ব্যস, সসেজ শেষ ।

শুখভ মনে মনে ঠিক করে নিল : কাল সকালে ফাইলে দাঁড়াবার আগে বাকি খাবারটা শেষ করে ফেলতে হবে ।

ওপাশের কয়েদীরা এদিকে এসে বাঙ্কগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে জটলা করছে —গনতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে ওদের অপেক্ষা করতে হবে। শুখভ ওদের দিকে কোনোরকম কান না দিয়ে ওর পাতলা ময়লাচিট কম্বলে নিজের মাথাটা মুড়ি দিয়ে নিল।

ভরপুর মন নিয়ে শুখভ ঘুমিয়ে পড়ল। আজ ওব দিনটা বড় ভাল গেছে। ওরা ওকে সেল-হাজতে বন্ধ করেনি ; ব্রিগেডকে ঠেলে পাঠায়নি 'সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন নগরে' ; দুপুরে সে বাডতি এক বাটি খিচুড়ি নিয়ে সরে পড়েছিল ; ফোরম্যান দলের কোটা ছাপিয়ে যেতে পেরেছে ; দেয়াল গাঁথার সময়টা খুব আনন্দে কেটেছে ; গা-তল্লাসিব সময় লোহার ফলকটা ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে ; সন্ধেবেলায় ৎসেজারের কাছ থেকে খানিকটা সে রোজগার করেছে ; নিজের জন্যে খানিকটা তামাক কিনেছে। আর অসুখ তাকে সেভাবে পটকে ফেলতে পারেনি। কোনোরকমে আবার ঠিক খাড়া হয়ে উঠেছে।

কোনোরকম কোনো মুখভাব না করেই একটা দিন অতিক্রান্ত হল। প্রায় একটা খুশিখোশালির দিন।

লোকটার মেযাদে আগা থেকে গোড়া ছিল এমনি তিন হাজার ছ' শো তিপ্পান্নটি দিন।

তিনটে দিন বেড়ে গিয়েছিল লীপ-ইয়ার পড়ায।